□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□

[□□□□□□ – Bengali – بنغالي]

□. □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ : □. □□□□□□□□ □.□.□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ : □. □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

2013 - 1434

IslamHouse.com

مختصر إظهار الحق

« باللغة البنغالية »

د. محمد أحمد محمد عبد القادر الملكاوي

ترجمة: د/ خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانكير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

ইসলাম ও খৃস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীর কালজয়ী গ্রন্থ ইযহারুল হক্ক-এর সার-সংক্ষেপ

সংক্ষেপিত ইযহারুল হক্ক

ড. মুহাম্মাদ আহমদ আব্দুল কাদির মালকাবী
অধ্যাপক, কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ

বঙ্গানুবাদ
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূচীপত্র
সংক্ষেপকের পূর্বকথন
ভূমিকা: কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য
প্রথম অধ্যায়: বাইবেল পরিচিতি
প্রথম পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম ও সংখ্যা
১. ১. ১. পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলি
১. ১. ২. নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলি
১. ১. ৩. গ্রন্থগুলির সংখ্যায় হেরফেরের ইতিহাস
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির অপ্রামাণ্যতা
১. ২. ১. তোরাহ বা তাওরাতের অবস্থা
১. ২. ২. যিহোশূয়ের পুস্তকের অবস্থা
১. ২. ৩. ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলির সূত্র পর্যালোচনা
১. ২. ৩. ১. মথিলিখিত সুসমাচার
১. ২. ৩. ২. মার্কলিখিত সুসমাচার
১. ২. ৩. ৩. যোহনলিখিত সুসমাচার
১. ২. ৪. পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলি ঐশী নয়
১. ২. ৫. পবিত্র বাইবেল বিষয়ে মুসলিম বিশ্বাস
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি
১. ৩. ১. বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা
১. ৩. ২. ভুলভ্রান্তি
১. ৩. ৩. বাইবেলের বিকৃতির আলোচনা

১. ৩. ৪. বিকৃতি বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা
১. ৩. ৪. ১. শুধু মুসলিমরাই বিকৃতির কথা
বলে
১. ৩. ৪. ২. বিকৃতি বিষয়ে অমুসলিমগণের সাক্ষ্য
১. ৩. ৪. ৩. বাইবেলের বিকৃতির কারণাদি
১. ৩. ৪. ৪. যীশু খৃস্টের সাক্ষ্য
১. ৩. ৪. ৫. যীশুর বক্তব্য বনাম বাইবেলের প্রামাণ্যতা
১. ৩. ৪. ৬. বাইবেলের বিকৃতি কি অসম্ভব
ছিল
১. ৩. ৪. ৭. বাইবেলের ইতিহাস ও বিকৃতির প্রেক্ষাপট
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নতুন ও পুরাতন নিয়মে রহিত বিধান
১. ৪. ১. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ
১. ৪. ১. ১. নাসখ বা রহিতকরণের অর্থ
১. ৪. ১. ২. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণের ক্ষেত্র
১. ৪. ১. ৩. রহিতকরণ বনাম মত-পাল্টানো
১. ৪. ১. ৪. কাহিনী ও ঐতিহাসিক বিবরণ রহিত হয় না
১. ৪. ১. ৫. যাবূর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা যাবূর রহিত
হয় নি
১. ৪. ২. বাইবেলের পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত বিধানাদি

5

Д. Д. Д. Дддддддд Ддддддддд Дддддддддд Дддддддддд

Д. Д. Д. Д. Дддддддд Ддддддддд Дддддддддд Ддддддддд Ддддддддд

Д. Д. Д. Д. Ддд Ддддддддд Дддддддддд Дддддддд

Дддддддд Дддддд:Дддддддддд Ддддд

Дддддд: Ддддд Дддддддддд Дддддддд Д Ддддд

Ддддд Дддддддд: Дддддддддддддд Дддддддддд Ддддддд Дддддддддд Ддддд

Дддддддд Дддддддд: Ддддд Дддддддд Ддддддд Дддддддддд Ддддд

Ддддд Дддддддд: Ддддд Дддддддддд Дддддддддд Ддддддд

Ддддд Дддддд: Дд-Ддддд Д Дд-Ддддд

Ддддд Дддддддд: Дд-Дддддд Дддддддд

Д. Д. Д. Дд Дддддддд Ддддддддд

Д. Д. Д. Д. Ддддддд Ддддддддд

Д. Д. Д. Д. Дддддддддддддд Дддддддд Ддддд Д Дддддддд

Д. Д. Д. Д. Ддддддддд Ддддд

Д. Д. Д. Д. Ддддддд Ддддд

Д. Д. Д. Д. Дддддддддд Ддддд Ддд

Д. Д. Д. Д. Ддддд-Ддддддддд Ддддд Ддддд

Д. Д. Д. Д. Дддддддд Д Дддддддддддд Дддддддддд

Д. Д. Д. Д. Дддддддд Ддддддддд

৩. ২. ২. ১. ইয়াহূদী ধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা
৩. ২. ২. ২. খৃস্টধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা
৩. ২. ২. ৩. ইসলামী শরীয়তে হাদীস
চতুর্থ অধ্যায়: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াত
প্রথম পরিচ্ছেদ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াতের
প্রমাণ
৪. ১. ১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক চিহ্ন-কার্য
৪. ১. ১. ১. অতীত ও ভবিষ্যতের অজানা সংবাদ
৪. ১. ১. ২. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক কর্মসমূহ
৪. ১. ২. ব্যক্তিত্ব, বিধান ও মানবতার প্রয়োজন
৪. ১. ২. ১. তাঁর মহোত্তম চরিত্র ও আচরণ
৪. ১. ২. ২. তাঁর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
৪. ১. ২. ৩. তাঁর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা
৪. ১. ২. ৪. মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

8

সংক্ষেপকের পূর্বকথন
প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত। আর সালাত ও সালাম উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-অনুসারী ও সহচরগণের উপর।
মহান আল্লাহর তাওফীকে আমি আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ ইবনু খালীলুর রাহমান কিরানবী উসমানী হিন্দী রচিত ‘ইযহারুল হক্ক’ গ্রন্থটি সম্পাদনা করি। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি গ্রন্থকারের নিজের হস্তলিখিত ও তাঁর সামনে পঠিত দুটি সুবর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করি। আমার সম্পাদিত ইযহারুল হক্ক গ্রন্থটি চার খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪১০ হিজরী অব্দে /১৯৮৯ খৃস্টাব্দে। সৌদী সরকারের রিয়াদস্থ ইলমী গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্যালয় তা প্রকাশ করে।
অনেক সহকর্মী আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন যে, আমি যেন ‘‘ইযহারুল হক্ক’’ গ্রন্থটিকে সহজবোধ্য সরল ভাষায় সংক্ষেপ করে এক খণ্ডে প্রকাশ করি; যাতে গ্রন্থটি অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা সহজ হয়। বিশ্বব্যাপী খৃস্টান মিশনারি ও প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অপপ্রচার চালাচ্ছেন তার প্রতিরোধে সংক্ষেপিত গ্রন্থটি কার্যকর ভূমিকা পালন

মধ্যে তাদের গ্রন্থগুলির নাম, বিকৃতি ও রহিত হওয়া বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। আমার উদ্দেশ্য, যেন এ সংক্ষেপিত গ্রন্থটি মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি পাঠকের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনে।
সবশেষে মহান আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করে বলছি, আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ ইবনু খালীলুর রাহমান কীরানবী তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ ‘‘ইযহারুল হক্ক’’ একটি ভূমিকা ও ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। নিম্নে এ গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হলো।

ড. মুহাম্মাদ আহমদ আব্দুল কাদির মালকাবী সহকারী অধ্যাপক
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ ০১/০১/১৪১৫ হি./ ১০/০৬/১৯৯৪ খৃ.

13

ভূমিকা
কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য
(১) প্রটেস্টান্ট

1 পণ্ডিতগণের গ্রন্থ
থেকে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে শুধু তাদের কথা দ্বারা তাদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য, আমাদের বিশ্বাস প্রকাশের জন্য নয়।
(২) প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণ সর্বদা তাদের লিখিত গ্রন্থগুলি বিষয়বস্তু

1 গোড়া থেকেই খৃস্টানগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভ্যাটিকানের পোপের নিয়ন্ত্রিত ‘রোমান ক্যথলিক’ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান যুগেও খৃস্টানদের মধ্যে এই মতই সর্বাধিক প্রচলিত। ষষ্ঠদশ শতকে মার্টিন লুথার: Martin Luther (১৪৮২-১৫২৯ খৃ) পোপের আধিপত্য, অত্যাচার ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা প্রটেস্টান্ট নামে পরিচিত। ধর্মবিশ্বাস প্রায় একই, তবে এরা রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা ধর্মের উপর পোপের কতৃত্ব মানেন না। রাজনৈতিক কারণেই ইংল্যান্ডের রাজারা প্রটেস্টান্ট মত গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের শুরুতে মূলত ইংল্যান্ডের প্রটেস্টান্ট খৃস্টানদের মিশনারীরাই ভারতে কাজ করছিল। এজন্য গ্রন্থকার এদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য তাদের পন্ডিতদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (অনুবাদক। এখানে উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের সকল পাদটীকা অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।)
14

পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে পাল্টে ফেলেন। ফলে আগের সংস্করণ ও পরের সংস্করণের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।
(৩) ‘‘বাইবেল’’-এর মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন কাহিনীকে মিথ্যা বা ভুল বলায় কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলি নবীগণের নামে বানানো জাল ও ভিত্তিহীন গল্প এবং আসমানী কিতাবের বিকৃতির অংশ। এ সকল কাহিনী কোনোটিই আল্লাহর কালাম নয়। আর এ সকল জাল কাহিনীকে মিথ্যা বা ভুল বললে ‘‘আসমানী কিতাবের’’ প্রতি বে-আদবী হয় না। বরং এ সকল আসমানী গ্রন্থে যে সকল বিকৃতি ও মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলি প্রকাশ করা ও সেগুলির নিন্দা করা মুসলিমের আবশ্যকীয় দায়িত্ব।
(৪) খৃস্টান পণ্ডিতগণের রীতি ও অভ্যাস হলো, তারা মুসলিম আলিমগণের লিখনির মধ্যে বিদ্যমান সামান্য দু-একটি দুর্বল বক্তব্য খুঁজে বের করে তাদের গ্রন্থে সেগুলির উল্লেখ করেন এবং সেগুলির প্রতিবাদ করেন। এভাবে তারা পাঠককে বুঝাতে চান যে, মুসলিম পণ্ডিতদের বইগুলি এরূপ দুর্বল কথায় ভরা। আর প্রকৃত বিষয় হলো, মুসলিম আলিমগণের গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত শক্তিশালী বক্তব্যগুলি তারা এড়িয়ে যান এবং সেগুলির কোনোরূপ উল্লেখ তারা করেন না। যদি কখনো এরূপ কোনো বক্তব্য তারা উল্লেখ করেন তবে

15

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে বুঝার এবং তার অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আর বাতিল ও অসত্যের অসারত্ব আমাদের সামনে প্রতিভাত করুন এবং তা পরিহার করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

17

প্রথম অধ্যায় বাইবেল পরিচিতি

নতুন ও পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলির বর্ণনা ও
সেগুলির বিকৃতি ও রহিত হওয়ার প্রমাণ

এই অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম ও পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির সনদ-হীনতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাইবেলের রহিত হওয়ার প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম ও সংখ্যা
খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ) পূর্বে আগত নবীগণের মাধ্যমে সেগুলি তাদের নিকট পৌঁছেছে। দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থগুলির বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ.) -এর পরে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে সেগুলি লিখিত হয়েছে। প্রথমভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে ‘পুরাতন নিয়ম’ এবং দ্বিতীয়ভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে ‘নতুন নিয়ম’ বলে অভিহিত করা হয়। উভয় নিয়মের সমষ্টিকে বলা হয় ‘বাইবেল’। এটি একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ ‘গ্রন্থ’। পুরাতন ও নতুন নিয়ম একত্রে ছাপানো বইটির উপরে লেখা হয়: ‘‘পবিত্র বাইবেল’’।
১. ১. ১. পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলি
প্রটেস্টান্ট খৃস্টানগণের নিকট স্বীকৃত ‘‘প্রটেস্টান্ট বাইবেল’’ বা কিং জেমস ভার্সন অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রথম অংশ বা পুরাতন নিয়মের মধ্যে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible][2]. [illegible] [illegible] [illegible]:

1. [illegible] [illegible] **(Genesis)**
2. [illegible] [illegible] **(Exodus)**
3. [illegible] [illegible] **(Leviticus)**
4. [illegible] [illegible] **(Numbers)**
5. [illegible] [illegible] **(Deuteronomy)**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible]’ **(Torah or Pentateuch)** [illegible] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible]’[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

6. **[illegible] [illegible] (The Book of Joshua)[3]**
7. **[illegible] [illegible] (The Book**

---

[2] [illegible] [illegible] [illegible] **(**[illegible]**-**[illegible] [illegible]**)** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **(Flavius Josephus)** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]**:** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

of Judges)
8. রূতের বিবরণ (The Book of Ruth)
9. শমুয়েলের প্রথম পুস্তক (The First Book of Samuel)
10.শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Samuel)
11.রাজাবলির প্রথম খণ্ড (The First Book of Kings)
12.রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (The Second Book of Kings)
13.বংশাবলির প্রথম খণ্ড (The First Book of The Chronicles)
14.বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (The Second Book of The Chronicles)
15.ইয্রার পুস্তক (The Book of Ezra) 16.নহিমিয়ের পুস্তক (ইয্রার দ্বিতীয় পুস্তক) (The Book of Nehemiah) 17.ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)
18.ইয়োবের

4

বিবরণ (The Book of Job) 19.গীতসংহিতা (যাবূর) (The Book of Psalms)
20.হিতোপদেশ (সুলাইমানের প্রবাদাবলী) (The Proverbs)
21.উপদেশক (Ecclesiastes or, the Preacher)
22.শলোমনের পরমগীত (The Song of
4

(Job) বা ইয়োব আরবীতে আইঊব। এই গ্রন্থটি আইঊব (আর) এর নামে প্রচারিত।

Solomon)
23.যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Isaiah)
24.যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Jeremiah)
25.যিরমিয়ের বিলাপ (The Lamentations of Jeremiah)
26.যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Ezekiel) 27.দানিয়েলের পুস্তক (The Book of Daniel)
28.হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (Hosea) 29.যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (Joel)
30.আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (Amos) 31.ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (Obadiah) 32.যোনা

5 ভাববাদীর পুস্তক (Jonah)
33.মীখা ভাববাদীর পুস্তক (Micah) 34.নহূম ভাববাদীর পুস্তক (Nahum) 35.হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (Habakkuk)
36.সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zephaniah) 37.হগয় ভাববাদীর পুস্তক (Haggai) 38.সখরিয়

6 ভাববাদীর পুস্তক (Zechariah) 39.মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (Malachi)

5 ইউনূস (আ)।
6 আরবীতে যাকারিয়া।

ঈসা-মসীহ আলাইহিস সালাম এর জন্মের প্রায় ২৪০ বৎসর পূর্বে মালাখি নবী হিসেবে

7

ইহুদীদের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন।
শমরীয় (Samaritans) ইয়াহূদীগণ এগুলির মধ্য থেকে শুধু প্রথম সাতটি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ও পালনীয় বলে স্বীকার করে, মূসা আলাইহিস সালাম এর গ্রন্থ বলে কথিত ৫ টি গ্রন্থ, যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua) ও বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges)। শমরীয়দের মধ্যে প্রচলিত ‘তাওরাত’- এর এ ৭টি পুস্তকের বক্তব্য সাধারণ ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত তাওরতের এ ৭টি পুস্তকের বক্তব্য থেকে ভিন্ন। আবার তাওরাতের শমরীয় সংস্করণ ও হিব্রু সংস্করনের সাথে এর গ্রীক সংস্করণের বক্তব্যের অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাওরাতের গ্রীক সংস্করণের মধ্যে উপর্যুক্ত ৩৯টি পুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত ৭টি পুস্তক রয়েছে, যেগুলিকে প্রটেস্টান্টগণ জাল বা সন্দেহজনক

7 অর্থাৎ তাদের মতে। [সম্পাদক]

পুস্তক (Apocrypha) বলে আখ্যায়িত করেন।

8 এ
সাতটি গ্রন্থের নাম:
1. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)
2. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit)
3. যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith)
4. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon)
5. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of

8 এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের প্রধান দল রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের নিকট এই সন্দেহযুক্ত গ্রন্থগুলিও বিশুদ্ধ বলে গৃহীত। এজন্য রোমান ক্যথলিক বাইবেলে (RCV: Roman Catholic Version/ Douay) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ সংখ্যা
৪৬। বাইবেলের প্রাচীন সংস্করণে এসকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। প্রোটেস্ট্যান্টরা ১৭শ শতাব্দীতের এগুলি মুছে দিয়ে তাদের বাইবেল মুদ্রণ করে। এজন্য প্রোটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে (AV: Authorised Version/ KJV: King James Version) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৩৯। রোমান ক্যাথলিকগণ যদিও মনে করেন যে, প্রোটেস্ট্যান্টগণ ‘ইশ্বরের বাণী’ বাদ দিয়েছে, কিন্তু তারা বর্তমানে প্রটেস্টান্ট বাইবেলই প্রচার করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এসকল মুছে ফেলা গ্রন্থগুলির পরোক্ষ উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। দেখুন: (The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp883, 932-935).

Sirach)

6. **(The First Book of Maccabees)**
7. **(The Second Book of Maccabees)**

.

.

.

.

:

1. **(The Gospel**

---

[9] **(The Gospel According To St. Matthew)** **(The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew)** ‘’-
-: ’ ( ) , ‘’, ’’, ’’ ( ) ‘’-
’, ‘’ ‘’ ‘’

According To St. Matthew)
2. মার্ক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Mark)
3. লূক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Luke)
4. যোহন লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. John)
এই চারটি গ্রন্থকে ‘ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়’ বলা হয়। ‘ইঞ্জিল’ শব্দটি এই চারটি গ্রন্থের জন্য শুধু প্রযোজ্য। ইঞ্জিল শব্দটি মূলত গ্রীক ভাষা থেকে আরবীকৃত শব্দ। গ্রীক (eu) অর্থ ভাল (good) এবং (aggelein) অর্থ ঘোষণা (announce), একত্রে (euaggelos) অর্থ সুসংবাদ ঘোষণা (bringing good news)। গ্রীক (euaggelion) শব্দের অর্থ (good news)। এ শব্দটি থেকে আরবী ইঞ্জিল শব্দ এবং ইংরেজী ইভাঞ্জেল (evangel) শব্দটির উৎপত্তি। আর ইঞ্জিল বা ইভাঞ্জেল (evangel) বলতে এ চারটি পুস্তক বুঝানো হয়। তবে অনেক সময় রূপকভাবে নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে একত্রে ‘ইঞ্জিল’ বলা হয়। অর্থাৎ এ চারটি পুস্তক ও নিম্নের ২৩টি পুস্তকের সমষ্টিকে রূপকভাবে ইঞ্জিল বলা হয়:
5. প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ (The Acts of the Apostles)

সুসমাচার কোনটি তা কেউ জানে না। এই বিষয়টি চাপা দেওয়ার জন্যই তারা সঠিক অনুবাদ না করে জালিয়াতি করেছেন। বাকী সুসমাচারগুলিরও একই অবস্থা। আমরা অনুবাদে তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি।

6. রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Letter of Paul to the Romans/The Epistle of Paul The Apostle to the Romans)
7. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)
8. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)
9. গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Galatians)
10. ইফিযীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Ephesians)
11. ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Philippians)
12. কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Colossians)
13. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)
14. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)
27

15. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul The Apostle to the Timothy)
16. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of Paul The Apostle to Timothy)
17. তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul to Titus)
18. ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul to Philemon)
19. ইব্রীয়দের প্রতি পৌলের পত্র (The Letter of Paul to the Hebrews) পত্রটি পৌলের লিখিত বলে কথিত।
20. যাকোবের পত্র (The Letter of James/The General Epistle of James)
21. পিতরের প্রথম পত্র (The First Epistle General of Peter)
22. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter)
23. যোহনের প্রথম পত্র (The First Epistle General of John)
24. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John)
25. যোহনের তৃতীয় পত্র (The Third Epistle of John)
26. যিহূদার পত্র (The General Epistle of Jude)
27. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (The

Revelation of St. John The Divine)

10

এভাবে আমরা দেখছি যে, পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণ বা প্রটেস্টান্ট বাইবেল (AV: Authorised Version/ KJV: King James Version) অনুসারে পবিত্র বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা ৩৯+২৭= ৬৬। আর পুরাতন নিয়মের গ্রীক সংস্করণ বা রোমান ক্যাথলিক বাইবেল (RCV: Roman Catholic Version/Douay) অনুসারে পবিত্র বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা ৪৬+২৭=৭৩।

১. ১. ৩. গ্রন্থগুলির সংখ্যায় হেরফেরের ইতিহাস
৩২৫ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের

11

10 নতুন নিয়মের সন্দেহজনক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দেখুন, (The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition,Vol-2, Biblical Literature, New Testament Apocrypha, p 973).
11 (Constantine the Great) ২৮৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১২ খৃস্টাব্দে রোমের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১২
খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাটগণ খৃস্টানধর্মকে রাষ্ট্র বিরোধী বলে গণ্য করতেন এবং খৃস্টানদের উপর অত্যাচার করতেন। ৩১৩
খৃস্টাব্দে কন্সটান্টাইন ‘মিলান ঘোষণা’ (Edict of Milan) এর মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতদিন খৃস্টধর্ম একটি ‘গোপন’ ধর্ম বলে গণ্য ছিল। এখন খৃস্টানগণ প্রকাশ্যে ধর্মমত প্রকাশ ও পালন করতে শুরু করেন। এখন তাদের মধ্যকার এতদিনের

(রাজত্ব: ৩২৩-৩৩৭ খৃ) সময়ে নিকীয়া (Nicaea) শহরে খৃস্টান বিশপ-যাজকদের প্রথম সাধারণ মহা-সম্মেলন (ecumenical council) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বাইবেলের সন্দেহভাজন গ্রন্থাবলি বা বাইবেল নামে প্রচলিত ‘‘জাল’’ পুস্তকগুলি সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সম্মেলনে উপস্থিত (তিনশতাধিক) বিশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ‘যুডিথের পুস্তক’ (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর নিম্নের ১৪টি গ্রন্থ জাল বা সন্দেহজনক (Apocrypha) বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিকে বাইবেলের পুস্তক বা ঐশী পুস্তক বলে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। এ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি নিম্নরূপ:
1. ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)

বিরোধিতাগুলি প্রকাশ পায়। বিশেষত, একত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের গ্রন্থ বা যীশুর সুসমাচার হিসাবে প্রচারিত বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তখন পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের নির্দেশে ও তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ ৩২৫ সালে নিসিয়া সম্মেলন সমবেত হন। ৩৩৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু পূর্বে সম্রাট কন্সট্যান্টাইন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

2. যাকোবের পত্র (The Letter of Jame)
3. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter)
4. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John)
5. যোহনের তৃতীয় পত্র (The Third Epistle of John)
6. যিহূদার পত্র (The General Epistle of Jude)
7. ইব্রীয়দের প্রতি পত্র (The Letter of Paul to the Hebrews)
8. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon)
9. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit)
10. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)
11. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)
12. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
13. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)
14. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of St. John The Divine) ‘যুডিথের পুস্তক’ (The Book of Judith)- এর ভূমিকায় সেন্ট জীরোম (St. Jerome: ৩৪২-

[illegible][12]

[illegible] **(The Book of Baruch)**

(The Book of Tobias)

(The Book of Judith)

(The Book of Wisdom)

Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)

(The First Book of Maccabees)

(The Second Book of Maccabees)

[illegible] **(The Book of Esther)**-[illegible]

[12] [illegible]

গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তারা বলেন যে, প্রথম ৯ টি অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ শ্লোক ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তারা ৬ প্রকারের যুক্তি পেশ করেন:
1.এই গ্রন্থগুলি মূলত হিব্রু, ক্যালিডিয় ইত্যাদি ভাষায় লেখা ছিল। সেসব ভাষায় লিখিত এ সকল গ্রন্থের মূল উৎসগুলি হারিয়ে গিয়েছে।
2.ইয়াহূদীগণ এ সকল গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে মানেন না।
3.সকল খৃস্টান গ্রন্থগুলি মেনে নেন নি। 4.জীরোম (St. Jerome) বলেছেন যে, ধর্মের বিধিবিধান বর্ণনা ও প্রমাণ করার জন্য এই গ্রন্থগুলি যথেষ্ট নয়।
5.ক্লাউস বলেছেন যে, এ গ্রন্থগুলি সর্বত্র পঠিত হয় না।
6.৩য়-৪র্থ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খৃস্টান বিশপ ও ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) তার Ecclesisatical History গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি, বিশেষ করে মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।
এখানে লক্ষ্য করুন। তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের পূর্ববর্তী প্রজন্মদের অধার্মিকতার স্বীকৃতি প্রদান করছে। তারা

নিজেরাই স্বীকার করছে যে, যে সকল গ্রন্থের মূল উৎস হারিয়ে গিয়েছে এবং শুধু অনুবাদগুলি রয়েছে, যেগুলিকে ইয়াহূদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানেন না, যেগুলির ঐশ্বরিক বা প্রেরণালব্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং এ সকল কারণে যে সকল পুস্তককে প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ জাল বা সন্দেহজনক বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলিকেই আবার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ ঐশী বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে অবশ্য মান্য ও অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। ক্যাথলিকগণ কার্থেজ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থগুলিকে ঐশী ও ঐশ্বরিক হিসেবে মেনে থাকেন; যেগুলির মধ্যে পুরাতন নিয়মের ও নতুন নিয়মের জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি রয়েছে।
যে পুস্তককে পূর্ববর্তীরা জাল বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে পরবর্তীদের সিদ্ধান্তের কীই বা মূল্য থাকতে পারে? বরং এ সকল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলির অশুদ্ধতা ও অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিদের মতামতই সঠিক।

35

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাইবেলের পুস্তকগুলির অপ্রামাণ্যতা
পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি গ্রন্থেরও অবিচ্ছিন্ন সূত্র (chain of authorities) ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত নেই। আর এ সকল পুস্তক ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ ইয়াহূদী- খৃস্টানগণের নেই।
কোনো গ্রন্থকে ওহী (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী, ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার পূর্ব শর্ত হলো:
প্রথমত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, গ্রন্থটি অমুক নবী বা ভাববাদীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, উক্ত নবী যেভাবে গ্রন্থটি রেখে গিয়েছেন হুবহু সেভাবে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতীরেকেই

‘অবিচ্ছিন্ন সূত্রে’

13 গ্রন্থটি আমাদের
নিকট পৌঁছেছে।
শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো গ্রন্থকে কোনো ওহী বা প্রেরণা (Inspiration)-প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে চালানো হলে বা লিখে দিলেই তা সে ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ বলে প্রমাণিত বা স্বীকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো এক বা একাধিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি একটি গ্রন্থকে এরূপ কোনো নবী বা ভাববাদীর লেখা গ্রন্থ বলে দাবি করলেই তা তার লেখা বলে প্রমাণিত হয় না।
এরূপ অনেক গ্রন্থই অনেক নবীর নামে প্রচারিত, যেগুলি ইয়াহূদী খৃস্টানগণও সে সকল নবীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। মূসা আলাইহিস সালাম, ইয্রা, যিশাইয়, যিরমিয়, হবক্কুক, সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীর নামে অনেক পুস্তক পুরাতন নিয়মের অংশ হিসেবে লিখিত ও প্রচলিত হয়েছে যেগুলিকে ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ এ সকল নবীর লেখা পুস্তক বলে স্বীকার করেন না; কারণ এগুলির কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ নেই এবং

13 অর্থাৎ ভাববাদী থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রসিদ্ধ হবেন, যাদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।
37

কোনোভাবে প্রমাণিত হয় নি যে, এগুলি এ সকল নবীর লেখা। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণই এগুলিকে জাল (Pseudepigrapha) বলে গণ্য করেন। নতুন নিয়মের উপর্যুক্ত ২৭টি গ্রন্থ ছাড়াও ৭০টির অধিক গ্রন্থ খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলি যীশু, মেরি, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যদের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। আজকাল সকল খৃস্টান সম্প্রদায় একমত যে, এগুলি সবই বানোয়াট ও জাল (Pseudepigrapha/ Apocrypha)। পাঠক দেখেছেন যে, ‘সন্দেহজনক’ (Apocrypha) গ্রন্থগুলি ক্যাথলিকদের নিকট অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ইয়াহূদী ও প্রটেস্টান্টদের নিকট অবশ্য পরিত্যাজ্য জালগ্রন্থ।
অবস্থা যখন এরূপ তখন কোনো একটি গ্রন্থকে কোনো একজন নবী বা শিষ্যের নামে প্রচার করলেই আমরা গ্রন্থটিকে সেই নবী বা শিষ্যের লেখা বা সংকলিত গ্রন্থ বলে মেনে নিতে পারি না। শুধু এইরূপ দাবির ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করা যায় না।
এজন্য গ্রন্থকার আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ জাঁদরেল পণ্ডিতদের নিকট বারংবার দাবি করেছেন যে, বাইবেলের যে কোনো একটি গ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র পেশ করুন। তারা সূত্র উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাদরিগণের কেউ কেউ একথা
38

[illegible]

[illegible] **(chain of authorities)** [illegible]

[illegible] (Torah or Pentateuch)

[illegible]:

[illegible] **(Josiah, son of Amon)** [illegible]

পাণ্ডুলিপির চিহ্ন দেখেন নি বা এর কোনো কথাও কেউ শুনেন নি। তার সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বৎসর পরে তাওরাতের যে কপিটি পাওয়া গিয়েছিল তা মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না। যোশিয় রাজার রাজত্বের ১৮শ বৎসরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) হিল্কিয় মহাযাজক (Hilki'ah the high priest) দাবি করেন যে, তিনি ‘সদাপ্রভুর গৃহে’, অর্থাৎ যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মোশির তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকখানি (the book of the law) পেয়েছেন। এ সকল বিষয় ২ রাজাবলির ২২ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ৩৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

14

তোরাহ বা ‘ব্যবস্থা পুস্তক’ বলে কথিত এ পাণ্ডুলিপিটির নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। যাজক হিল্কিয়ের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সামগ্রিক বিচারে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এ পুস্তকটি বা ‘তোরাহ’-এর এই পাণ্ডুলিপিটি পুরোটিই হিল্কিয় মহাযাজকের উদ্ভাবনা ও রচনা ছাড়া কিছুই নয়। এই প্রকৃত সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে আমরা যদি ধরে নিই যে, হিল্কিয়ের এ পাণ্ডুলিপিটি সত্যই তাওরাতই ছিল তাহলেও কয়েক বছর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বা ৫৮৬ অব্দে

15 যখন ব্যবিলন সম্রাট নেবুকাদনেজার

14 ২ রাজাবলি ২২/৩-১১; ২ বংশাবলি ৩৪/১৪-১৯।
15 বিস্তারিত দেখুন, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃষ্ঠা ১০-১১, James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 449.

(Nebuchadnezzar) বা বখত নসর যেরুযালেম নগরী ও ইয়াহূদী রাজ্য ধ্বংস করে সকল ইয়াহূদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান তখন এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায়। নেবুকাদনেজারের এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। ইয়াহূদীরা দাবি করেন যে, প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পরে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes)-এর আক্রমনের সময় ইয্রার লেখা এ পাণ্ডুলিপিও বিনষ্ট হয়ে যায়।
চতুর্থ এন্টিয়ক খৃ. পূ. ১৭৫-১৬৩ সালের মধ্যে সিরিয়ার শাসক ছিলেন। তিনি ইয়াহূদী ধর্ম সম্পূর্ণ নির্মূল ও উচ্ছেদ করে ফিলিস্তিনে গ্রীক হেলেনীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অর্থের বিনিময়ে ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের পদ ক্রয় করে নেন। তিনি প্রায় ৮০ হাজার ইয়াহূদী হত্যা করেন, যেরুজালেম ধর্মালয়ের সকল সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং ইয়াহূদীদের বেদিতে শূকর জবাই করেন। তিনি ২০ হাজার সৈন্যকে যেরুজালেম অবরোধ করতে নির্দেশ দেন। শনিবার ইয়াহূদীরা যখন ধর্মালয়ে প্রার্থনার জন্য জমায়েত হয় তখন তার সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমন চালায়, নারী, পুরুষ, শিশু

নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে, সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে অগ্নিসংযোগ করে। পাহাড়ে-গুহায় পলাতক কিছু ইয়াহূদী ছাড়া কেউই এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায় না। (এ গ্রন্থের ---- পৃষ্ঠায় (খ) বিষয়টি দেখুন।)
দ্বিতীয় বিষয়: ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বলেন যে, ইয্রা হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুইজন ভাবাবদীর সহায়তায় ‘বংশাবলির প্রথম খণ্ড’ (The First Book of The Chronicles) ও ‘বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড’ (The Second Book of The Chronicles) গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় মূলত এ তিন ভাববাদীর লেখা। অথচ এ দুই গ্রন্থের সাথে তোরাহ-এর বিবরণের ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, ইয্রা তাওরাতের অসম্পূর্ণ ও আংশিক কাগজপত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন এজন্য পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। একথা তো স্পষ্ট যে, এই তিনজন ভাববাদী তাদের নিকট প্রচলিত ‘তোরাহ’ এর বর্ণনা অনুসরণ করে তাদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদি মোশির (মূসা আ. এর) যে তোরাহ-এর উপর তাঁরা নির্ভর করেছিলেন আজকের প্রচলিত তোরাহ যদি সেই মোশির ‘তোরাহ’ই হতো, তাহলে কোনো মতেই এ তিন ভাববাদীর বর্ণনার সাথে তোরাহ-এর বর্ণনার বৈপরীত্য দেখা দিত না বা তারা কোনোভাবেই তোরাহ-এর বিরোধিতা করতেন না। আর যদি ইয্রার সময়ে মোশির তোরাহ-

এর কোনো অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি কখনোই তোরাহ বাদ দিয়ে ‘অসম্পূর্ণ বংশতালিকা’র উপর নির্ভর করতেন না।
ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ইয্রা ওহী বা ইলহামের (Divine Inspiration) মাধ্যমে তোরাহ নতুন করে লিখেছিলেন। যদি বর্তমান প্রচলিত তোরাহ-ই ইয্রা লিখিত তোরাহ হতো তাহলে কখনোই ইয্রার লিখিত বিবরণের সাথে তোরাহ-এর বিবরণে বৈপরীত্য থাকতো না।
উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমানে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত তোরাহ (পুরাতন নিয়মের প্রথম ৫টি গ্রন্থ) মোশি বা মূসা আলাইহিস সালাম প্রদত্ত তোরাহ নয় এবং তা ইয্রা লিখিত তোরাহ-ও নয়। সত্য কথা হলো, তোরাহ (Torah or Pentateuch) নামে প্রচলিত এই গ্রন্থগুলি তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প, কাহিনী, বর্ণনা ইত্যাদির সংকলন মাত্র। ইয়াহূদী ধর্মগুরুগণ এ সকল প্রচলিত গল্প কাহিনী ইত্যাদি কোনো রকম বাছবিচার ও বাছাই ছাড়াই সংকলন করেছেন এবং ‘‘পুরাতন নিয়ম’’ নামক পুস্তক সংকলনের মধ্যে তা সংকলন করেছেন। তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের বিষয়ে এ মতটি ইউরোপে এবং বিশেষত জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তৃতীয় বিষয়: যদি কেউ যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫শ ও ৪৬শ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনা পুস্তকের ২৮শ ও ২৯শ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, উভয়ের

মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, যিহিষ্কেল ভাববাদী নিজ গ্রন্থে লিখিত ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার যুগে প্রচলিত ‘তোরাহ’-এর উপর নির্ভর করেছিলেন। যদি বর্তমান যুগে প্রচলিত তোরাহ-ই তার যুগের তোরাহ হতো তাহলে কখনোই তিনি ঐশ্বরিক বিধানের বর্ণনায় তোরাহ-এর বিরোধিতা করতেন না।
চতুর্থ বিষয়: প্রচলিত ‘তোরাহ’ বা তাওরাতের একটি স্থান থেকেও বুঝা যায় না যে মোশি (মূসা) নিজে এই গ্রন্থের কথাগুলি লিখেছেন। বরং তোরাহ-এর ভাষা ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে, ‘অন্য কোনো ব্যক্তি এই গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন। এই ‘অন্যব্যক্তি’ ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প-কাহিনী ও বর্ণনাগুলি সংকলন করেছেন। সংকলক যে কথাটিকে ‘ঈশ্বরের কথা’ বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন ‘ঈশ্বর/ সদাপ্রভু বলেন’। আর যে কথাকে মোশির কথা বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন: ‘মোশি বলেন’। সকল ক্ষেত্রে ‘মোশির’ জন্য ‘নাম পুরুষ’ বা ‘তৃতীয় পুরুষ’ ব্যবহার করেছেন। যদি এ সকল গ্রন্থ মোশির নিজের প্রণীত হতো তাহলে তিনি তার নিজের ক্ষেত্রে ‘উত্তম পুরুষ’ ব্যবহার করতেন। কিছু না হলেও অন্তত একটি স্থানে নিজের জন্য ‘উত্তম পুরুষ’ ব্যবহার করতেন। কারণ ‘উত্তম পুরুষ’

ব্যবহার পাঠক বা শ্রোতার অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে।
এভাবে তোরাহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে এ কথাটিই স্পষ্ট যে, এগুলি মোশি কতৃক সংকলিত বা প্রদত্ত নয়; বরং পরবর্তী যুগের কেউ এগুলি সংকলন করেছেন। এর বিপরীতে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই কথাটিই স্বীকৃত সত্য বলে গৃহীত হবে। কেউ যদি এর বিপরীত কোনো দাবি করেন তাহলে তাকে তার দাবি প্রমাণ করতে হবে। পঞ্চম বিষয়: প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য খৃস্টান পণ্ডিত আলেকজান্ডার কীথ নতুন বাইবেলের ভূমিকায় লিখেছেন: ‘‘বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে তিনটি বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে:
(ক) প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত নয়।
(খ) তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি ইয়াহূদীদের কেনানে (সিরিয়ায়) আগমনের পরে বা যেরুজালেমে আগমণের পরে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মোশির সময়ে, যখন ইস্রাঈল সন্তানগণ মরুভূমিতে অবস্থান করছিলেন তখন লেখা হয়নি।
(গ) প্রচলিত তাওরাত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর যুগে, অর্থাৎ খৃ. পূ. ১০ শতাব্দীতে, অথবা এর পরে খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দিকে লিখিত হয়েছে। মূল কথা হলো, প্রচলিত তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি মোশির মৃত্যুর ৫০০ বৎসরেরও বেশি পরে লেখা হয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয়: বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, একই ভাষার শব্দভাণ্ডার ও বাচনভঙ্গিতে যুগের আবর্তনে পরিবর্তন ঘটে। ৪০০ বৎসর আগের ইংরেজির সাথে বর্তমান সময়ের ইংরেজির তুলনা করলেই উভয় ইংরেজির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ধরা পড়বে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিত নর্টন বলেন: ‘‘তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গি এবং পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি, যেগুলি ইস্রাঈল সন্তানদের ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরে লেখা সেগুলির ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গির মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য পার্থক্য নেই। অথচ মোশির যুগ এবং মুক্তি পরবর্তী যুগ এই দুই যুগের মধ্যে ৯০০ বৎসরের ব্যবধান। যেহেতু তোরাহ-এর ভাষা ও পরবর্তী গ্রন্থগুলির ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেহেতু হিব্রু ভাষায় পরিপূর্ণ বুৎপত্তি সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত লিউসডিন মনে করেন যে, এ সকল গ্রন্থ সবই একই যুগে লেখা হয়েছে।
সপ্তম বিষয়: দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ৫, ৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘৫ আর সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি, প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র তুলিবে না।... ৮ আর সেই প্রস্তরের উপরে এই

46

ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।’’
যিহোশূয়ের পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ৩০, ৩৩ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মোশি যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবে যিহোশূয় যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেন এবং সেই বেদির উপরে তাওরাত লিখে রাখেন: ‘‘তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিল।...। আর তথায় প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তিনি মোশির লিখিত ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিলেন।’’

16

উপরের বিবরণ থেকে জানা গেল যে, মোশির উপর অবতীর্ণ বা মোশি লিখিত তাওরাত বা তোরাহ-এর আকৃতি ও পরিমাণ এমন ছিল যে, একটি যজ্ঞবেদির পাথরে তা পুরোপুরি লিখে রাখা যেত। তোরাহ বলতে যদি বর্তমানে প্রচলিত বিশালাকৃতির ৫টি গ্রন্থ বুঝানো হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই তা সম্ভব হতো না।
অষ্টম বিষয়: প্রচলিত তোরাহ-এর মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে। আবার তোরাহ-এর পুস্তকগুলির একটির সাথে আরেকটির বর্ণনার

16 যিহোশূয়ের পুস্তক ৮/৩০-৩২।
47

বৈপরীত্য রয়েছে। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাত নয়। ওহীর মাধ্যমে পাওয়া মোশির (মূসা আ.) কথায় এই ধরনের ভুল থাকতে পারে না।
১. ২. ২. যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua)
উপরের আলোচনা থেকে পাঠক ইস্রায়েলী ধর্মের মূল ভিত্তি তাওরাত (Torah or Pentateuch) -এর অবস্থা জানতে পারলেন। এখন আমরা তাওরাতের পরেই যে গ্রন্থের স্থান সেই ‘যিহোশূয়ের পুস্তক’-এর অবস্থা আলোচনা করব। প্রথমেই যে কথা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, এখন পর্যন্ত ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, গ্রন্থটির লেখক কে এবং কোন্ যুগে তা লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থটির বিষয়ে তাদের পাঁচটি মত রয়েছে:
1. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (মোশির শিষ্য) যিহোশূয়ের লিখিত।
2. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (হারোণের পৌত্র) পীনহস কর্তৃক লিখিত।
3. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (হারোণের পুত্র, পীনহসের পিতা) ইলিয়াসর কর্তৃক প্রণীত।

17

4. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি শমূয়েল কর্তৃক রচিত।
5. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি যিরমিয় কর্তৃক রচিত।

17 পীনহস ও ইলিয়াসরের পরিচয় দেখুন: ১ বংশাবলী ৬/৩-৪।

উল্লেখ্য যে, যিহোশূয় এবং যিরমিয়র মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো কমবেশি প্রায় ৮৫০ বৎসর।

18 তাদের নিজেদের ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থের লেখকের বিষয়ে এ ব্যাপক মতভেদ পূর্ণরূপে প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে তাদের নিকট কোনো সূত্র নেই। প্রত্যেক গবেষক তার নিজের ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকে পারিপার্শ্বিক কিছু নির্দেশনার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেছেন যে, অমুকই বোধহয় এই গ্রন্থের লেখক। এ আন্দাজই তাদের একমাত্র সনদ বা সূত্র।
যিহোশূয়ের পুস্তকের মধ্যে কিছু শ্লোক ও অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলি কখনোই যিহোশূয়ের বক্তব্য বা তাঁর নিজের লেখা হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ পুস্তকের মধ্যে এমন কিছু অনুচ্ছেদ বিদ্যমান যেগুলি দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সমসাময়িক কোনো ব্যক্তির লেখা বলে প্রমাণিত। এ সকল অনুচ্ছেদ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থটি কখনোই যিহোশূয়ের লেখা নয়।

18 যিরমিয় ভাববাদী খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মানুষ। আর মোশির শিষ্য যিহোশূয়ের সময়কাল নিয়ে ইহূদী- খৃস্টান পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোশির মৃত্যুর পরে খৃস্টপূর্ব ১৬শ, ১৫শ বা ১৩শ শতকে তিনি ইহূদীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে ৭, ৮ বা ৯ শতকের ব্যবধান।
49

সুসমাচারটি হারিয়ে যাওয়া মূল হিব্রু সুসমাচারটির অনুবাদ, তবে অনুবাদকের নাম, পরিচয় বা অন্য কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।
প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা প্রাচীন পণ্ডিতগণের বক্তব্য প্রমাণ করে। পুস্তকটির উপস্থাপনা ও বর্ণনা পদ্ধতি থেকে বুঝা যায় যে, পুস্তকটি মথির নিজের রচিত নয়। কারণ মথি যীশুর প্রেরিত ১২ শিষ্যের একজন ছিলেন। খৃস্টের অধিকাংশ অবস্থা ও ঘটনা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নিজে যদি এই সুসমাচারটি লিখতেন তবে পুস্তকটির কোথাও না কোথাও তাঁর উপস্থাপনা থেকে প্রকাশ পেত যে, তিনি তাঁর নিজে দেখা ঘটনাগুলি লিখছেন। এছাড়া তিনি নিজের কথা বলতে অবশ্যই উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতেন। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লেখকগণ এভাবেই লিখেন। এভাবে প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি মথির নিজের লেখা নয়।
মানিকীয (Manichees) সম্প্রদায়ের চতুর্থ শতাব্দীর অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস বলেন, মথির নামে প্রচলিত সুসমাচারটি তাঁর রচিত নয়।
মারসিওনের (Marcion) অনুসারিগণ এবং এবোনাইট (Ebionites) সম্প্রদায়ের মতে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রথম দুটি অধ্যায় জাল

ও সংযোজিত। ইউনিট্যারিয়ান (একত্ববাদী) খৃস্টান সম্প্রদায় এবং পাদ্রী উইলিয়ামসও অধ্যায় দুটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। নর্টন এ দুটি অধ্যায় এবং এ সুসমাচারের অধিকাংশ বক্তব্য অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
১. ২. ৩. ২. মার্কলিখিত সুসমাচার ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত সেন্ট জীরোম লিখেছেন যে, কোনো কোনো প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত মার্কলিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের (১৬ অধ্যায়ের) বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। কোনো কোনো প্রাচীন পণ্ডিত ধর্মগুরু লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের কিছু শ্লোকের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। কতিপয় প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত এই সুসমাচারের প্রথম দুইটি অধ্যায়ের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। মারসিওনীয় সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলে লুকলিখিত সুসমাচারে এই অধ্যায় দুটি নেই। গবেষক পণ্ডিত নর্টন মার্কলিখিত সুসমাচারের বিষয়ে লিখেছেন যে, এ সুসমাচারের ১৬শ অধ্যায়ের ৯ শ্লোক থেকে শেষ (২০ শ্লোক) পর্যন্ত অংশটুকু জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত।

19 তিনি আরো উল্লেখ

19 ১৯৫২ খৃস্টব্দে মুদ্রিত বাইবেলের (RSV) -এ মার্কলিখিত সুসমাচারের এই শেষ বা ১৬তম অধ্যায়টির ১-৮ শ্লোক রাখা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯-২০ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে আবার সেগুলি সংযোজিত করা 55

করেছেন যে, বাইবেল লেখক ও লিপিকারগণ কোনো কথাকে গ্রন্থ থেকে বের করার চেয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই বেশি পারঙ্গম ও অধিক আগ্রহী ছিলেন।
১. ২. ৩. ৩. যোহনলিখিত সুসমাচার
কোনো পূর্ণ সূত্র পরম্পরার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি যে, এই সুসমাচারটি যীশুর শিষ্য যোহন কর্তৃক রচিত। বরং বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করে যে, এ সুসমাচারটি যীশুর শিষ্য যোহনের লেখা নয়:
প্রথম বিষয়: যোহনলিখিত সুসমাচার পাঠ করে মোটেও বুঝা যায় না যে যীশুর শিষ্য যোহন নিজের চোখে দেখে সে সকল বিষয় লিখছেন। বরং বাহ্যত বুঝা যায় যে, পরবর্তী কোনো ব্যক্তি এগুলির বর্ণনা করছেন। উপরন্তু এ সুসমাচারের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অন্য কেউ, যীশু শিষ্য যোহন নন। যোহনলিখিত সুসমাচারের শেষে, ২১ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল বিষয় লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।’’
এখানে আমরা দেখছি যে, সুসমাচারের লেখক শিষ্য যোহনের বিষয়ে বলছেন: ‘সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন’, ‘তাঁহার সাক্ষ্য’, ইত্যাদি। এভাবে তিনি যোহনের

হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, Ahmed Deedat, The Choice, Vol-2 (Is The Bible God's Word?) page 80-97.
56

জন্য নাম পুরুষে সর্বনাম ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে লেখক তার নিজের জন্য উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে বলছেন: ‘আমরা জানি’

20। এথেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, এই সুসমাচারের লেখক যোহন ছাড়া অন্য কেউ। দ্বিতীয় বিষয়: দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকে অনেকেই এই ‘সুসমাচারটিকে’ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এটি যোহনের লিখিত নয়। এ সময়ে আরিনূস (১৩০-২০০খৃ)

21 জীবিত ছিলেন। আরিনূস

20 এর পরের শ্লোকটি (যোহন ২১/২৫) নিম্নরূপ: ‘‘যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছেন। সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।’’ এ দু শ্লোকের মাধ্যমে এ সুসমাচারের ইতি টানা হয়েছে। এখানে এ শ্লোকের ‘আমার’ (I) ও উপরের শ্লোকের ‘আমরা’ (We) এর সাথে সেই শিষ্য... তাহার.. ইত্যাদির তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই শিষ্য বলতে যোহনকে বুঝানো হয়েছে। যোহনের কথার ভিত্তিতে অন্য কেউ এ গসপেল বা সুসমাচারটি রচনা করেছেন এবং সুসমাচারের শেষে বিষয়টি বর্ণনা করে এর ইতি টেনেছেন।
21 (Irenaeus) দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রখ্যাত খৃস্টান। তিনিই সর্বপ্রথম খৃস্টানধর্মকে একটি কেতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। এরপূর্বে খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও ধমগুরুগণ মূলত ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ বা পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিকেই নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থরূপে মেনে চলতেন। যীশুর শিক্ষা মৌখিক প্রচার করা হতো, যদিও কিছু কিছু শিক্ষা, গসপেল, চিঠি ইত্যাদি তাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। তিনিই প্রথম ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনটি গসপেলের (মথি, মার্ক ও লূক) কথা উল্লেখ করেন। সর্বপ্রথম তার কথা থেকেই এই তিনটি গসপেলের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। 57

ছিলেন পোলিকার্পের (St. Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) শিষ্য। আর পোলিকার্প ছিলেন যীশু-শিষ্য যোহনের শিষ্য। যখন মানুষেরা যোহনের নামে প্রচারিত এই সুসমাচারটি অস্বীকার করছিলেন তখন তিনি একটিবারের জন্যও বলেন নি যে, আমি আমার গুরু পোলিকার্পকে বলতে শুনেছি যে, এই সুসমাচারটি তার গুরু যোহনের রচিত।
একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যীশু শিষ্য যোহন যদি কোনো ‘সুসমাচার’ লিখে থাকতেন তাহলে তার শিষ্য পোলিকার্প তা জানতেন এবং আরিনূসকে বলতেন।
আরিনূস মৌখিক বর্ণনা মুখস্থ করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন। তিনি পোলিকার্প থেকে অনেক গুরুত্বহীন বিষয় মুখস্ত ও বর্ণনা করেছেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, আরিনূস তার গুরু পোলিকার্প থেকে বিভিন্ন অতি সাধারণ বিষয় বারংবার শুনবেন এবং উদ্ধৃত করবেন, অথচ সুসমাচার-এর মত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটিবারও শুনবেন না বা শুনলেও তা বলবেন না, এমনকি বিতর্ক ও সংঘাতের মধ্যেও সে বিষয়ে কিছু বলবেন না।

এরপর ২১৬ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট ইসকাদ্রিয়ানূস (Clement of Alexandira) এই তিনটি গসপেলের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন: Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 30-31. তারিখ কানীসাতিল মাসীহ, পৃষ্ঠা ৪৫।

সর্বোপরি আরিনূসই সর্বপ্রথম ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনটি সুসমাচার: মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন। তার বক্তব্য থেকেই সর্বপ্রথম এ তিনটি পুস্তকের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কিন্তু তিনি যোহনের সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন নি। এরপর ২১৬ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট ইসকাদ্রিয়ানূস (Clement of Alexandira) এ তিনটি গসপেলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই প্রথম যোহন লিখিত সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন। যারা বিশ্বাস বা দাবি করেন যে, এ গ্রন্থটি যীশু শিষ্য যোহনের লেখা তারা তাদের মতের পক্ষে একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি, এমনকি আরিনূসের বক্তব্যে তাদের মতের সমর্থন পাওয়া যায় নি। তৃতীয় বিষয়: শুধু মুসলিম পণ্ডিতগণই নয়, প্রাচীনকাল থেকেই অনেক খৃস্টান ও অখৃস্টান পণ্ডিত বলেছেন যে, এ সুসমাচারটি যোহনের লিখিত নয়। কয়েকটি নমুনা দেখুন:
(১) দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস (Celsus)।

22 তিনি সেই সময়েই চিৎকার করে
বলতেন যে, খৃস্টানগণ তাদের ইঞ্জিলগুলি

22 Philosopher Celsus, an influential 2nd-century Platonist of Alexandria and perhaps the first serious critic of Christianity. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007. Article Origen, Contra Celsum (Against Celsus)
59

(৫) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্রোটিস বলেছেন: ‘‘এই সুসমাচারটি ছিল ২০ অধ্যায়। যোহনের মৃত্যুর পরে অফসিস চার্চের পক্ষ থেকে এতে ২১ অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়।’’
(৬) দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ‘এ্যলোগিন’ নামক খৃস্টীয় সম্প্রদায় এই সুসমাচারটি এবং যোহনের নামে প্রচালিত পত্রগুলি মানতেন না এবং এগুলিকে বাইবেলের অংশ মনে করতেন না।
বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হর্ণ-এর বক্তব্য দিয়ে এ আলোচনা শেষ করছি। তিনি তার রচিত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রাচীন চার্চের বা খৃস্টধর্মের ঐতিহাসিকগণের পক্ষ থেকে সুসমাচারগুলির রচনার সময় ও অবস্থা সম্পর্কে সে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলি অনির্ধারিত ও অসম্পূর্ণ। এ সকল মতামত ও বক্তব্য আমাদেরকে কোনো একটি নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয় না। প্রথম যুগের ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বানোয়াট, বাতুল বা দুর্বল বর্ণনাগুলিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। তাদের পরে যারা এসেছেন তারা পূর্ববর্তীদের প্রতি ভক্তির কারণে এসকল বাতুল বিবরণগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ সকল সত্য ও মিথ্যা বিবরণ এক লেখক থেকে অন্য লেখক গ্রহণ করেছেন। এখন বর্তমান যুগে এগুলির মধ্য থেকে সঠিক তথ্য বাছাই করার কোনো সুযোগ আর নেই।

অতঃপর হর্ন উল্লেখ করেছেন যে, সুসমাচারগুলির প্রণয়নের সময়কাল সম্পর্কে নিম্নরূপ মতভেদ উল্লেখ করেছেন:
ক. মথিলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৩৭ অথবা ৩৮ অথবা ৪১ অথবা ৪৩ অথবা ৪৮ অথবা ৬১ অথবা ৬২ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।
খ. মার্কলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৫৬ অথবা তার পরে ৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে রচিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, গ্রন্থটি ৬০ খৃস্টাব্দে অথবা ৬৩ খৃস্টাব্দে রচনা করা হয়েছে।
গ. লূকলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৫৩ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে। ঘ. যোহনলিখিত সুসমাচার। এটি ৬৮ অথবা ৬৯ অথবা ৭০ অথবা ৯৭ অথবা ৯৮ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।
উপরের আলোচনা থেকে পাঠক খৃস্টধর্মের মূল চারটি ‘ইঞ্জিল’ বা সুসমাচারের অবস্থা জানতে পেরেছেন। নতুন নিয়মের অবশিষ্ট পুস্তক বা পত্রগুলির অবস্থার এগুলির চেয়ে মোটেও ভাল নয়।
১. ২. ৪. পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলি ঐশী নয়
উপরের আলোচনা থেকে জ্ঞানী পাঠকের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, খৃস্টানগণের নিকট বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির কোনোটিরই কোনো মূল উৎস বা সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এজন্য

62

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের এ কথা দাবি করার সুযোগ নেই যে, ‘‘পবিত্র বাইবেল’’ নামে প্রচারিত পুস্তকসংকলনের পু্স্তকগুলি আসমানী, ঐশ্বরিক বা ঐশী পুস্তক বা ওহী, ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণার (Divine Inspiration, Revelation) ভিত্তিতে লেখা পুস্তক। যদি কেউ তা দাবি করেন তবে তা ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। উপরের আলোচনার পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:
(১) নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে উল্লিখিত তথ্য ও বিবরণের মধ্যে অগণিত অর্থগত বৈপরীত্য রয়েছে। ইয়াহূদী-খৃস্টান গবেষক, পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ এ সকল বৈপরীত্যের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দুই বা ততোধিক পরস্পর-বিরোধী বিবরণের একটি সত্য ও অন্যটি বা অন্যগুলি মিথ্যা ও জাল। ইচ্ছাকৃত বিকৃতি অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে এই মিথ্যা তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এ সকল বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা সমন্বয়ের জন্য এমন অবাস্তব ও ফালতু কথা বলেছেন যা কোনো স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বিবেক গ্রহণ করতে পারে না। ‘ঐশ্বরিক প্রেরণা’ বা প্রত্যাদেশ (Divine Inspiration/Revelation)-লব্ধ কথায় কখনো এরূপ অর্থগত বৈপরীত্য ও ভুল থাকতে পারে না। ঐশী কথা ভুলের শত যোজন দূরে থাকবে।
63

বাইবেল ভাষ্যকার হর্ন তার বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, বাইবেলের লেখকগণ বা বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের রচয়িতাদের প্রক্যেকের নিজ নিজ প্রকৃতি, অভ্যাস ও জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে লিখার অনুমতি ছিল। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে তারা প্রচলিত জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করতেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, তারা যে সকল বিষয় লিখেছেন বা যে সকল বিধিবিধান প্রদান করেছেন সেগুলি সবই তারা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা প্রেরণার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।
হেনরী ও স্কট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ লিখেছেন যে, এ কথা মোটেও জরুরী নয় যে, একজন ভাববাদী (তার পুস্তকে) যা কিছু লিখেছেন তা সবই ঐশী প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ হবে বা বাইবেলের (canonical text) অংশ হবে। ‘এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা’-য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক খৃস্টান পণ্ডিতই মনে করেন, বাইবেলের পুস্তকাবলির সকল কথা এবং সকল বর্ণনা ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণা (Inspiration)-লব্ধ নয়। যারা বলেন যে, বাইবেলের পুস্তকাবলির মধ্যে উল্লিখিত সকল কথাই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ, তাদের জন্য এ দাবি প্রমাণ করা সহজ হবে না।
আব্রাহাম রীস (Abraham Rees) অনেক গবেষক পণ্ডিতের সমন্বয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণায় (১৮০২-১৮২০ সালে) ৪৫ খণ্ডে একটি
64

বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন, যা রীস এনসাইক্লোপীডিয়া (New Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts and Sciences) নামে পরিচিত। এ বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে:
বাইবেলের এ সকল পুস্তকের রচয়িতাদের কর্মে ও কথায় অনেক ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য রয়েছে। প্রাচীন খৃস্টানগণ প্রেরিতদেরকে ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় ভুলভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত বলে বিশ্বাস করতেন না; কারণ, কখনো কখনো তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে মার্ক, লূক ও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ, যারা যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণের শিষ্য ছিলেন, তাদের রচিত পু্স্তকগুলির বিষয়েও অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ইলহাম দ্বারা লিখিত পুস্তক নয়, এগুলি নিতান্তই মানবিক রচনা। এজন্য প্রটেস্ট্যন্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুগণ মার্ক ও লূকের লেখা ইঞ্জিল ও লূকের লেখা প্রেরিতগণের কার্যবিবরণকে ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণানির্ভর নয় বরং মানবীয় কর্ম বলে গণ্য করেছেন।
(২) প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশারদ ও খৃস্টধর্ম গবেষক খৃস্টান পণ্ডিত মহাত্মা নরটন পণ্ডিত একহার্ন থেকে উদ্ধৃত করেছেন: খৃস্টান ধর্মের প্রথম অবস্থায় যীশুর অবস্থাদি বর্ণনার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত

[illegible][23]

[illegible]

[23] [illegible] **(Logia)** [illegible]**: The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Vol-10, Jesus Christ, p 146.**

তৎকালীন মানুষদের মধ্যে এরূপ সংযোজনের অভ্যাসের বড় প্রমাণ যে, সে যুগের খৃস্টান লেখকগণের রীতি ছিল, তাদের লিখনির মধ্যে কেউ যেন কোনো বিকৃতি না করে সে বিষয়ে তারা কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অভিশাপের ঘোষণা দিতেন। যীশুর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ই ঘটেছে। এ বিকৃতি ও সংযোজন এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, রোমান পণ্ডিত সিলসূস অভিযোগ করেন, তারা তিনবার বা চারবার বা তার বেশি বার তাদের সুসমাচারগুলিকে পরিবর্তন করেছে।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তৎকালীন মানুষদের গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের কোনো আগ্রহ ও মানসিকতা ছিল না। খৃস্টীয় ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষেরা তাদের কাছে সংরক্ষিত ওয়াজ-উপদেশের বাক্যাবলি এবং যীশুর বিভিন্ন ঘটনাবলি নিজেদের জ্ঞানানুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতেন। প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণই এ অভ্যাস চালু করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মেও তা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অভ্যাস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে খৃস্টধর্মের বিরোধীরাও বিষয়টি অবগত ছিলেন। দ্বিতীয় শতকের শেষে ক্লীমেন্স (Clement of Alexandira) উল্লেখ করেছেন যে, কিছু মানুষের কর্মই ছিল সুসমাচারগুলি বিকৃত করা।
একহার্নের বক্ত্যবের উপর মন্তব্য করে নর্টন বলেন: কেউ যেন মনে না করে যে, এ মতটি

69

একহার্নের একার মত। অনেক সমসাময়িক জার্মান গবেষকই একহার্নের সাথে একমত। এ সাতটি স্থান সংযোজিত ও ঐশ্বরিক প্রেরণা- লব্ধ নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।
এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর অলৌকিক চিহ্নসমূহ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা সংযোজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, সত্যকে মিথ্যা থেকে বাছাই করা বর্তমান যুগে খুবই কঠিন।
প্রিয় পাঠক, যে পুস্তকের মধ্যে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে তাকে কি ‘ঐশ্বরিক’ বা ইলহাম-প্রাপ্ত পু্স্তক (Divine Scripture) বলা যায়? ইয়াহূদী- খৃস্টান কারো কি এ অধিকার আছে যে, বাইবেলের সকল পুস্তককে ঐশ্বরিক, ইলহাম-প্রাপ্ত বা আসমানী কিতাব বলে দাবি করবেন? অথবা এ সকল পুস্তকের সকল তথ্য ও বর্ণনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে দাবি করবেন?

24

24 খৃস্টান পন্ডিতগণ অনেক সময় সুসমচারগুলির বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, ১০৪ খৃস্টাব্দে মৃত রোমের বিশপ ক্লীমেন্ট (Clement) ও ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত এন্টিয়কের দ্বিতীয় বিশপ ইগনাটিয়াস (Ignatius)-এর চিঠিপত্রের মধ্যে দু- একটি বাক্য রয়েছে, যে বাক্যগুলি এ সকল সুসমাচারের মধ্যে বিদ্যমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সকল সুসমাচার তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বড় উদ্ভট প্রমাণ! তারা কখনোই এ সকল সুসমাচারের নাম উল্লেখ করেন নি, এগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাও বলেন নি। সর্বপ্রথম এ সকল সুসমাচারের ‘‘নাম’’ শুনা যায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে। আরিনূস (১৩০-২০০খৃ)-এর লিখনিতে সর্বপ্রথম প্রথম তিন সুসমাচারের উল্লেখ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস করি যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল ইঞ্জিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বেই হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের নামে প্রচলিত বই দুইটি মূলত কোনো আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ নয়। বরং এই বই দুইটি

আলেকজেন্দ্রিয়া, এন্টিয়ক ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খৃস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশপ নিযুক্ত হয়েছে। স্বভাবতই প্রত্যেক চার্চে অন্তত কয়েক কপি ‘সুসমাচার’ থাকার কথা ছিল, প্রত্যেক খৃস্টানের নিকট না হলেও হাজার হাজার খৃস্টানের মধ্যে অনেকের কাছেই ধর্মগ্রন্থ থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল বিশপের অনেকের অনেক চিঠি বা বই এখনো সংরক্ষিত আছে। তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতে এ সকল সুসমাচারের কোনো উল্লেখ নেই। ২০০ বৎসর পর্যন্ত কোনো চার্চে কোনো সুসমাচার সংরক্ষিত রাখা বা পঠিত হওয়া তো দূরের কথা এগুলির কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কথা লিখেছেন, সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। কেউই তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর বলে মনে করেন নি। নইলে প্রথম শতকের শেষভাগে মথি, মার্ক, লূক বা যোহন তার সুসমাচার লিখে সকল বিশপের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই বলে যে, ইশ্বরের প্রেরণায় আমি এই সুসামাচর লিখলাম। একে মান্য করতে হবে।... কখনোই তারা তা করেন নি। ৩০০ বৎসর পরে এ সব অগণিত পুস্তকের মধ্য থেকে তৎকালীণ ধর্মগুরুগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কিছু পুস্তক পছন্দ করে তাকে বিশুদ্ধ বা ক্যাননিক্যাল বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

হচ্ছে জীবনী ও ইতিহাসমূলক দুইটি সংকলন, যাতে সত্য ও মিথ্য সকল প্রকার কথা ও কাহিনী সংকলন করা হয়েছে।
আমরা কখনোই বলি না যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাওরাত ও ইঞ্জিল সঠিকরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তারপরে তা বিকৃত করা হয়েছে। আমরা কখনোই তা বলি না। কোনো একজন মুসলিমও এরূপ কথা বলেন না বা বিশ্বাস করেন না।
খ. পৌল ভাক্ত বা ভন্ড ভাববাদী, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়
পৌলের বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস যে, খৃস্টান ধর্মের প্রথম প্রজন্মে খৃস্টধর্মকে বিকৃত ও নষ্ট করতে যে সকল মিথ্যাবাদী ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটেছিল, পৌল ছিলেন তাদের অন্যতম। কাজেই নতুন নিয়মে সংকলিত পৌলের পত্রাবলি ও বক্তব্যসমূহ যদি প্রকৃতপক্ষে তার বলে প্রমাণিত হয় তাহলেও আমাদের নিকট সেগুলির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।
গ. প্রেরিতগণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না
যীশুখৃস্টের প্রেরিত শিষ্যগণের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো যে, তারা যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পরে সততা ও ধার্মিকতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তবে আমরা তাদেরকে ভাববাদী বা নবী বলে বিশ্বাস করি না। আমাদের দৃষ্টিতে তাদের বক্তব্য ও

73

থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ। এগুলির মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ত বা সম্পাদনের মাধ্যমে সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতিও বৈধ নয়।
সূলা বাকারা-৮৭, সূরা হূদ-১১০, সূরা মুমিনূন-৪৯, সূরা ফুরকান-৩৫, সূরা কাসাস-৪৩, সূরা সাজদা-২৩, সূরা ফুসসিলাত-৪৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন: ‘‘এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি।’’ সূরা মায়িদার-৪৬ ও সূরা হাদীদ-২৭ আয়াতে ঈসা আ. (যীশু) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: ‘‘এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি’’। সূরা মরিয়ম-৩০ আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জবানীতে বলা হয়েছে: ‘‘আমাকে তিনি গ্রন্থ প্রদান করেছেন।’’ সূরা বাকারা-২৩৬ এবং সূরা আল-এমরান-৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে: ‘‘এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছে।’’, অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল। কাজেই ‘‘পবিত্র বাইবেল’’ নামে প্রচারিত পুস্তক সংকলনের মধ্যে নতুন ও পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এ সকল ঐতিহাসিক পুস্তকাদি এবং পত্রাবলি কুরআনে উল্লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল নয়। কাজেই এগুলি বিশ্বাস বা মান্য করা জরুরী নয়। এ সকল পুস্তক, পত্রাবলি এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বাস নিম্নরূপ:
এ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি

75

বাইবেলের’’ পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পুস্তক। এগুলির বিষয়েই আল্লাহ সূরা বাকারার ৭৮৯ আয়াতে/ শ্লোকে বলেছেন: ‘‘দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং এরপর বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে; যেন তারা এগুলির দ্বারা সামান্য বিনিময়মূল্য লাভ করতে পারে। কাজেই যা তাদের হাতগুলি লিখেছে তার জন্য তাদের দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ।”
মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে মূসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত তাওরাহ। আর আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত ইঞ্জিল। আর ‘‘পবিত্র বাইবেল’’-এর পুরাতন ও নতুন নিয়ম বা ‘‘তাওরাত শরীফ’’, ‘‘ইঞ্জিল শরীফ’’ বা ‘‘যাবূর শরীফ’’ নামে প্রচলিত পুস্তকগুলি কখনোই সেই তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূর নয়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের মূল তিনটি সংস্করণ রয়েছে বা তিন প্রকারের ‘‘তাওরাত’’ রয়েছে। আর ‘‘ইঞ্জিল’’ বা সুসমাচার রয়েছে চারটি। এগুলির মধ্যে

77

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার কবরস্থ করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়।

79

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাইবেলের বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি পবিত্র বাইবেল নামে প্রচলিত এ গ্রন্থ-সংকলনের পুস্তকগুলি অগণিত বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি

25 ও বিকৃতিতে ভরা। এ
পরিচ্ছেদে আমরা তার সামান্য কিছু নমুনা আলোচনা করব।
১. ৩. ১. বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা
১- বিন্যামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য:

25 বৈপরীত্য বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন পরস্পর-বিরোধিতা। বাইবেলের এক গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের সাথে অন্য কোনো গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা পাওয়া যায়। এমনকি একই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে বা একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ের মধ্যে লিখিত তথ্যও অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। এছাড়া বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, অনুবাদ ইত্যাদির মধ্যেও বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার উদাহরণ হিসাবে ১২৫টি বৈপরীত্য উল্লেখ করেছেন। প্রদত্ত তথ্যের বা বিধানের শুদ্ধতা বা বিশুদ্ধতা এখানে বিচার করা হয় নি। শুধু বাইবেলের একাধিক স্থানে, সংস্করণে বা অনুবাদে প্রদত্ত তথ্যের তুলনা করে পরস্পর-বিরোধিতা ও বৈপরীত্য প্রমাণ করা হয়েছে।
অপরদিকে ভুলভ্রান্তি বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন যে বাইবেলে প্রদত্ত অগণিত তথ্য ইতিহাস, বাস্তবতা বা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূল গন্থে গ্রন্থকার বাইবেলের মধ্যে প্রদত্ত এইরূপ ভুলভ্রান্তির ১১০টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

১ বংশাবলির (বংশাবলি ১ম খণ্ড) ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।’’
পক্ষান্তরে ১ বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।’’
কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।’’
তাহলে বিন্যামিনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিন জন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ৫ জন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটি উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা ১০ জন। নামগুলিও আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলির সাথে প্রথম শ্লোকের সাথে দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দুজনের নামের মিল আছে। আর তিনটি শ্লোকের মিল আছে একমাত্র ‘‘বেলা’’ নামটি উল্লেখের ক্ষেত্রে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় একই পুস্তকের। উভয় পুস্তকের লেখক ইয্রা ভাববাদী। এভাবে একই লেখকের লেখা একই পুস্তকের দুটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হলো। আবার তাওরাতের আদিপুস্তকের

81

বক্তব্যের সাথে ইয্রার দুটি বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রমাণিত হলো।
এ সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইয্রাই ভুল করেছেন। এ ভুলের কারণ হিসেবে তার উল্লেখ করেন যে, ইয্রা পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি এবং যে বংশতালিকা দেখে তিনি বংশাবলীর এই তালিকা লিখেছিলেন সেই মূল বংশতালিকাটি ছিল অসম্পূর্ণ।
২- ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্যের সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য
শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।’’

26

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী

26 দায়ূদের নির্দেশে তার সেনাপতি যোয়াব লোকসংখ্যা গণনা করেন। দায়ূদ ও শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে ‘যিহূদা রাজ্য’ বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরুশালেম। এখানে উভয় অংশের লোকগণনার কথা বলা হয়েছে।
82

লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।’’
তাহলে প্রথম বর্ণনামতে ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮,০০,০০০ এবং যিহূদার ৫,০০,০০০। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা: ১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বর্ণনায় ৩ লক্ষের কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।
বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বস্তুত বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে এবং এবিষয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অবান্তর। বিকৃতি মেনে নেওয়াই উত্তম; কারণ তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং বাইবেলের বর্ণনাকারী ও লিপিকারগণ ইলহাম-প্রাপ্ত বা ঐশী প্রেরণা প্রাপ্ত ছিলেন না।
৩. গাদ দর্শকের সংবাদের বৈপরীত্য শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে, তাবৎ

83

আপনি তিন মাস পর্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন?...’’
অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক নিম্নরূপ: পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসি তাঁহাকে বলিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ কর: হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে পাইয়া বসিলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার...।’’
উভয় বক্তব্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষের সময় বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। প্রথম শ্লোকে ৭ বৎসর ও দ্বিতীয় শ্লোকে ৩ বৎসর! বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেছেন যে, প্রথম শ্লোকের তথ্য ভুল। আদম ক্লার্ক বলেন: নিঃসন্দেহে বংশাবলির বক্তব্যই সঠিক, গ্রীক বাইবেলের ভাষ্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৪- অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য:
রাজাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিলেন।’’
আর বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।’’
84

উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য! দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীত-ভাবে ভুল; কারণ, বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক এবং ২২ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি যদি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন!! আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।
৫- যিহোয়াখীনের রাজত্ব গ্রহণকালীন বয়সের বর্ণনায় বৈপরীত্য:
২ রাজাবলীর ২৪ অধ্যায়ের ৮-৯ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(৮) যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন... (৯) সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন।’’
২ বংশাবলির ৩৬ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই তিনি করিতেন।’’ উভয় তথ্যের মধ্যে দশ বৎসরের বৈপরীত্য। ইয়াহূদী-খৃস্টান ভাষ্যকারগণ স্বীকার

85

করেছেন যে, দ্বিতীয় শ্লোকটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিহোয়াখীন মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর ব্যাবিলনে বন্দিরূপে নীত হন। বন্দিত্বের সময়ে তার সাথে তার স্ত্রীগণও ছিলেন। স্বভাবতই ৮ বা ৯ বৎসরের কোনো মানুষের অনেকগুলি স্ত্রী থাকে না। আর এরূপ ৮ বা ৯ বৎসরের একজন শিশুর ক্ষেত্রে একথাও বলা হয় না যে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা মন্দ ও পাপ তা করেছিল। এজন্য বাইবেল বিশেষজ্ঞ আদম ক্লার্ক বলেন, এ পুস্তকের এ স্থানটি বিকৃত।
৬- দায়ূদ আলাইহিস সালামের যোদ্ধা কর্তৃক নিহতগণের সংখ্যায় বৈপরীত্য:
২ শমূয়েল ২৩ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে দায়ূদের বীর যোদ্ধাগণের বর্ণনায় বলা হয়েছে: ‘‘তিনি আটশতের বিরুদ্ধে তার বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ করিয়াছিলেন (he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time)

27

কিন্তু ১ বংশাবলি ১১ অধ্যায়ের ১১ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘তিনি তিনশতের বিরুদ্ধে তার বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ করিয়াছিলেন (he lifted up his spear

27 কেরির বাংলা বাইবেলে এ পঙক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ: তিনি এককালে নিহত আটশত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন।
86

against three hundred slain by him at one time)।

28

উভয় বক্তব্যের মধ্যে তিন শতের বৈপরীত্য! আদম ক্লার্ক ও ড. কেনিকট (Benjamin Kennicott) উল্লেখ করেছেন যে, এ শ্লোকটিতে তিনটি মারাত্মক বিকৃতি রয়েছে।
৭- নূহের আলাইহিস সালাম নৌকায় উঠানো প্রাণীদের বর্ণনায় বৈপরীত্য: আদিপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯-২০ পঙ্ক্তি নিম্নরূপ: (১৯) আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে; (২০) সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে।’’
এ পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ৮-৯ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘(৮) নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি অশুচি পশুর, এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের (৯) স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করিল।’’
এ পুস্তকেরই ৭ম অধ্যায়ের ২-৩ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘তুমি শুচি (পবিত্র) পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি (অপবিত্র) পশুর

28

কেরির বাংলা বাইবেলের অনুবাদ নিম্নরূপ: ‘‘তিনি তিন শত লোকের উপর আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে এককালে বধ করিয়াছিলেন।’’

স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমন্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে রাখ।’’
এগুলি একই পুস্তকের তিনটি বক্তব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ নূহকে নির্দেশ দেন, সর্বজাতীয় পশু, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া সাথে নিতে এবং নূহ এ নির্দেশ এভাবে পালন করেছিলেন।
কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি তাকে সকল পবিত্র পশু এবং সকল পাখি সাত জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। আর অপবিত্র পশু জোড়া জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। প্রথম দুই বক্তব্যে ‘‘সাত জোড়ার’’ কোনোরূপ উল্লেখ নেই; বরং পবিত্র ও অপবিত্র সকল পশু ও পাখী এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় বক্তব্যে শুধু অপবিত্র পশু এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে এখানে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বড় রকমের বৈপরীত্য বিদ্যমান।
৮- দায়ূদ আলাইহিস সালাম-এর বন্দীদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য
২ শমূয়েলের ৮ অধ্যায়ের ৪ পঙ্ক্তি নিম্নরূপ: ‘‘দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে সতের শত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন।’’
88

একই ঘটনার বর্ণনায় ১ বংশাবলির ১৮ অধ্যায়ের ৪ পঙক্তিতে বলা হয়েছে: ‘‘দায়ূদ তাহার নিকট হইতে এক সহস্র রথ, সাত সহস্র অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন।’’
এখানে একই ঘটনার বর্ণনায় উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় শ্লোকে ১,০০০ রথ এবং ৫,৩০০ পদাতিক সৈন্যের কথা বেশি বলা হয়েছে।
৯- দায়ূদ কর্তৃক নিহত অরামীয় সৈন্যদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য:
২ শমূয়েল ১০ অধ্যায়ের ১৮ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন।’’
পক্ষান্তরে ১ বংশাবলি ১৯ অধ্যায়ের ১৮ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন।’’
এখানে রথারোহীদের বর্ণনায় ৬,৩০০ জনের পার্থক্য। অবশিষ্ট ৪০ হাজার নিহত সৈন্য পদাতিক না অশ্বারোহী সে বিষয়েও বৈপরীত্য রয়েছে।
১০- সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর অশ্বশালার সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য:
১ রাজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল। (And Solomon had forty thousand
89

stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen)’’
২ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা

29 ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল।
(And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen)’’
এখানে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম শ্লোকে দ্বিতীয় শ্লোকের চেয়ে ৩৬,০০০ বেশি অশ্বশালার কথা বলা হয়েছে।
বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক বলেন: সংখ্যাটির উল্লেখের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।
১১- যীশুর বংশাবলি বর্ণনায় বৈপরীত্য:
যদি কেউ মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ পঙক্তিতে প্রদত্ত যীশুখৃস্টের বংশতালিকা বা বংশাবলি-পত্রের সাথে লূকলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ২৩-৩৮ পঙক্তিতে উল্লিখিত যীশু খৃস্টের বংশাবলি-পত্রের তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ ৬টি মারাত্মক বৈপরীত্য দেখতে পাবেন:
1. মথি থেকে জানা যায় যে, মরিয়মের

29

কেরির অনুবাদে প্রথম শ্লোকে অশ্বশালা ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঘর লেখা হয়েছে, যদিও উভয় শ্লোকেই ইংরেজীতে (stalls of horses) বলা হয়েছে।

স্বামী যোশেফ-এর পিতার নাম ‘যাকোব’। আর লূক থেকে জানা যায় যে, যোশেফ-এর পিতা এলি।
2. মথি থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।
3. মথি থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ থেকে ব্যবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূক থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ ও নাথন বাদে যীশুর পুর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা ছিলেন না বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।
4. মথি থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েল-এর পিতার নাম যিকিনিয়। আর লূক থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েলের

30 পিতার নাম নেরি।

30 যীশুর সুদীর্ঘ বংশতালিকার একটি সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই। প্রথমে যোশেফ ও শেষে দায়ূদ এই দুইটি নামে মিল আছে। আর মধ্যস্থানে সরুববাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকাতেই আছে। তবে নামের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মথির বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ১৩তম ঊর্ধ্বপুরুষ। আর লূকের বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ২২তম ঊর্ধ্বপুরুষ। ১ বংশাবলি ৩/১৫-১৯ থেকে জানা যায় যে, দায়ূদের বংশধর রাজা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম, তার পুত্র যিকনিয়। যিকনিয়ের ৭ পুত্রের মধ্যে একপুত্র শল্টীয়েল এবং অন্য পুত্র পদায়। এই পদায়ের পুত্র সরুববাবিল, তার দুই পুত্র মশুল্লম ও হনানিয়, আর এক কন্যা শালোমীৎ। তাহলে শল্টীয়েল সরুববাবিলের চাচা। মথি থেকে জানা যায় যে, রাজা যিকনিয় ও তার ভাইগণ রাজা যোশিয়ের পুত্র। যিকনিয়-এর পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুববাবিল, তার পুত্র অবীহূদ। লূক থেকে

5. মথি থেকে জানা যায় যে, সরুববাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ। আর লূক থেকে জানা যায় যে, সরুববাবিলের পুত্রের নাম রীষা। মজার কথা হলো, ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে সরুববাবিলের সন্তানগণের নাম লেখা আছে, সেখানে অবীহূদ বা রীষা কোনো নামই লেখা নেই। এজন্য প্রকৃত সত্য কথা হলো মথি ও লূক উভয়ের বর্ণনায় ভুল।
6. মথির বিবরণ অনুযায়ী দায়ূদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম। দায়ূদ ও যীশুর মধ্যে ১০০০ বৎসরের ব্যবধান। এতে প্রত্যেক প্রজন্মের সময়কাল মথির বিবরণ অনুসারে ৪০ বৎসর এবং লূকের বর্ণনা অনুসারে ২৫ বৎসর।
তৃতীয় শতাব্দীতে সুসমাচার দুটির প্রসিদ্ধি লাভের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগের খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ এ মারাত্মক বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক বর্ণনার কারণে বিব্রত ও বিমূঢ় হয়েছেন। বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন যা সবই ব্যর্থ চেষ্টা। তারা আশা করেছেন, যুগের আবর্তনে এ বৈপরীত্যের সমাধান প্রকাশিত হবে, কিন্তু

জানা যায় যে, মল্কির পুত্র নেরি, তার পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুববাবিল, তার পুত্র রীষা। এখানে জানা গেল যে, শল্টীয়েলের যোশিয় বা যিহোয়াকীমের বংশধর নন। তিনি নেরির পুত্র, তিনি মল্কির পুত্র....।
92

তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। এ দুই বংশতালিকার বৈপরীত্য অতীতের মত একই ভাবে বর্তমান যুগের পণ্ডিতদেরকে হতবাক করছে। ১২- যীশু কর্তৃক আরোগ্যকৃতদের বর্ণনায় বৈপরীত্য:
মথির সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ২৯-৩৪ শ্লোকে দুই অন্ধ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: ‘‘(২৯) পরে যিরীহো হইতে তাঁহাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। (৩০) আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পাশে বসিয়াছিল। .... (৩৪) তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা দেখিতে পাইল ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।’’ মথির সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের ২৮-৩৪ শ্লোকে দুজন ভুত-গ্রস্ত লোকের গল্প বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে: ‘‘পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দুর্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পরিত না।...’’
দুটি ঘটনাই মার্ক উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনা মার্কের সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪৬-৫২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিরীহো হতে বের হওয়ার পরে যীশু পথে ‘তিময়ের পুত্র বরতিময়’ নামক একজন অন্ধকে দেখতে পান এবং তাকে সুস্থ করেন। অর্থাৎ মার্কের বর্ণনানুসারে যীশু মাত্র

93

একজন অন্ধকে দেখতে পান ও সুস্থ করেন। আর মথির বর্ণনানুসারে তিনি দুজন অন্ধকে দেখেন ও সুস্থ করেন।
দ্বিতীয় ঘটনা মার্কের ৫ অধ্যায়ের ১-২০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মাত্র একজন ভূতগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। তাহলে মথির বর্ণনা অনুসারে যীশু দুজন পাগলকে দেখেন ও সুস্থ করেন। আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে তিনি মাত্র একজন পাগলকে দেখেন ও সুস্থ করেন।
১৩- প্রেরিতদের প্রতি যীশুর আজ্ঞায় লাঠির উল্লেখে বৈপরীত্য:
যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরণ করার সময় যে আজ্ঞা প্রদান করেন তা মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনার মধ্যে কিছু কিছু বৈপরীত্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি প্রেরিতদের সাথে যষ্ঠি বা লাঠি রাখার বিষয়। মথির ১০ অধ্যায়ের ৯-১০ পঙক্তিতে প্রেরিতদেরকে সাথে লাঠি রাখতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন: ‘‘(৯) তোমাদের গেঁজিয়ায় স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিত্তল, (১০) এবং যাত্রার জন্য থলি কি দুইটি আঙ্রাখা কি পাদুকা কি যষ্ঠি, এ সকলের আয়োজন করিও না।’’ লূকের বর্ণনাতেও দেখা যায় যে, যীশু লাঠি সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন। লূকের ৯ অধ্যায়ের ৩ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, পথের জন্য কিছুই লইও না, যষ্ঠিও না...।’’

94

কিন্তু মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রেরিতদেরকে লাঠি সাথে রাখার নির্দেশ দেন। মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮-৯ পঙক্তি নিম্নরূপ: ‘‘(৮) আর আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক এক যষ্ঠি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না।, রুটীও না, ঝুলিও না, গেঁজিয়ায় পয়সাও না; (৯) কিন্তু পায়ে পাদুকা দেও, আর দুইটা আঙরাখা পরিও না।’’
এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর আজ্ঞা বর্ণনায় সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান। প্রথম বক্তব্যদ্বয় অনুসারে যীশু প্রেরিতদেরকে লাঠি নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য অনুসারে তিনি তাদেরকে লাঠি নিতে আদেশ করেন।
১৪- নিজের বিষয়ে যীশুর সাক্ষ্যের সত্যতার বিষয়ে বৈপরীত্য:
যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে যীশু বলেন: ‘‘আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি (নিজের বিষয়ে নিজে) সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।’’
আর এ পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যীশু বলেন: ‘‘যদিও আমি আপনার বিষয়ে আপনি (নিজের বিষয়ে নিজে) সাক্ষ্য দিই তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য।’’
প্রথম বক্তব্য অনুসারে যীশুর নিজের বিষয়ে প্রদত্ত তার নিজের সাক্ষ্য

95

গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে তা গ্রহণযোগ্য।
১৫- বধ্যভূমিতে যীশুর ক্রুশবহনকারীর বর্ণনায় বৈপরীত্য
ক্রুশে চড়ানোর জন্য যীশুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় মথি ২৭/৩২ এর বক্তব্য: ‘‘আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল (তাকে যীশুর ক্রুশটি বহন করতে বাধ্য করল: him they compelled to bear his cross)।’’
লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে ক্রুশ রখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহা বহন করে।’’

31

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন।’’ এখানে একই ঘটনার বর্ণনায় সুসমাচারত্রয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। মথি ও লূকের বর্ণনা অনুসারে যীশুর ক্রুশটি বহন করেন শিমোন নামের এ

31 লূক ২৩/২৬।

কুরীণীয় লোক। আর যোহনের বর্ণনা অনুসারে ক্রুশটি বহন করেন যীশু নিজেই।
১৬- যীশু আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য? মথি ৫/৯ নিম্নরূপ: ‘‘ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয় (Blessed are the peacemakers), কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।’’
লূক ৯/৫৬ নিম্নরূপ: ‘‘কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।’’
মথি ১০/৩৪ নিম্নরূপ: ‘‘মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি।’’ লূক ১২/৪৯ ও ৫১ নিম্নরূপ: ‘‘(৪৯) আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি? ... (৫১) তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ।’’
উপরের বক্তব্যগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম দুটি বক্তব্যে শান্তি, ঐক্য ও মিলন সৃষ্টিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যীশু নিজেও ধ্বংস নয়, বরং রক্ষা করতে আগমন করেন। কিন্তু শেষ দুটি বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি খড়্গ, হানাহানি, ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মুক্তি, শান্তি, মিলন ও রক্ষার জন্য আগমন
97

করেন নি; কাজেই যাদেরকে ধন্য বলা হবে এবং ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।
১. ৩. ২. ভুলভ্রান্তি
পূর্বোক্ত বৈপরীত্য ও অনুরূপ অগণিত বৈপরীত্য ছাড়াও বাইবেলের পুস্তকগুলির মধ্যে রয়েছে অগণিত ভুলভ্রান্তি। বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য হলো, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক, পাণ্ডুলিপি বা সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে বৈপরীত্য জানা যায়। আর ভুল জানা যায় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মানবীয় রীতি, ঐতিহাসিক তথ্য, গণিত বিদ্যা বা অন্য কোনো জ্ঞানের আলোকে বাইবেলের তথ্য বিচার করার মাধ্যমে। গবেষক পণ্ডিতগণ বাইবেলের মধ্যে এরূপ অনেক ভুলভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটি দেখুন:
১- ইস্রায়েল সন্তানদের মিসরে অবস্থানকার সম্পর্কে ভুল তথ্য: যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।’
এ তথ্যটি ভুল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪৩০ বৎসর নয়, বরং ২১৫ বৎসরকাল মিশরে অবস্থান করেছিল। তবে কনান দেশে ও মিসরে উভয় স্থানে ইস্রায়েল সন্তানগণের পূর্বপুরুষ ও তাদের মোট অবস্থানকাল ছিল ৪৩০ বৎসর। কারণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কনান দেশে

98

তাদের পিতৃগণ কনান দেশে ও মিসরে চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিল।’
এখানে গ্রীক তাওরাত বা তাওরাতে গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য নিম্নরূপ: ‘‘কনান দেশে ও মিসরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও তাদের পিতা- পিতামহগণের মোট অবস্থানকাল চারি শত ত্রিশ বৎসর।’’
খৃস্টান গবেষক ও পণ্ডিতগণের নিকট নির্ভরযোগ্য পুস্তক ‘‘মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন’’ (মহামূল্য পবিত্র বাইবেলের ছাত্রগণের পথ নির্দেশক) নামক গ্রন্থে এভাবেই ইস্রায়েল সন্তানগণের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর মিসরে আগমন থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৭০৬ বৎসর। আর ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর পরিত্যাগ ও ফিরাউনের সলিল সমাধি থেকে ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৪৯১ বৎসর। ১৭০৬ থেকে ১৪০৯ বাদ দিলে ২১৫ বৎসর থাকে, এটিই হলো ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর মিসর আগমন থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়।
এখানে অন্য একটি বিষয় এ সময়কাল নিশ্চিত করে। মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ইয়াকূব (ইস্রায়েল আ.)-এর অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইয়াকূবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তার পুত্র অম্রাম (Amram: ইমরান), তার পুত্র মূসা আলাইহিস সালাম। এতে বুঝা যায় যে,

100

মিসরে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থান ২১৫ বৎসরের বেশি হওয়া অসম্ভব। আর ইয়াহূদী- খৃস্টান ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাকার ও গবেষকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইস্রায়েলীয়গণ ২১৫ বৎসর মিসরে অবস্থান করেন। তাদের মিসরে ৪৩০ বৎসর অবস্থানের যে তথ্য বাইবেলের হিব্রু সংস্করণে দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে তারা একমত হয়েছেন। এজন্য আদম ক্লার্ক বলেন, ‘‘সকলেই একমত যে, হিব্রু সংস্করণে যা বলা হয়েছে তার অর্থ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। আর মূসা আলাইহিস সালাম-এর পাঁচ পুস্তক বা তোরাহ-এর বিষয়ে শমরীয় সংস্করণ অন্যান্য সংস্করণ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। আর ইতিহাস শমরীয় তাওরাতের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণ করে।
হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: শমরীয় তোরাহ-এর এই বক্তব্যই সত্য। এর দ্বারা হিব্রু তোরাহ-এর পাঠে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভুত হয়।
এ থেকে জানা গেল যে, হিব্রু বাইবেলে যাত্রাপুস্তকের ১২/৪০-এ যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে স্বীকার করা ছাড়া ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের কোনো উপায় নেই।
২- মিসর পরিত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল:
গণনাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪-৪৭ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে: ‘‘(৪৪) এই সকল লোক মোশি ও হারোণ... কর্তৃক গণিত হইল। (৪৫) স্ব
101

স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য (৪৬) সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। (৪৭) আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না।’’

32

এ শ্লোকগুলি থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিশর ত্যাগ করে তখন তাদের ২০ বৎসরের অধিক বয়সের যুদ্ধেসক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের অধিক (৬,০৩,৫৫০)। লেবীর বংশের সকল নারী, লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।
চার শ্রেণীর মানুষ এই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: ১. লেবীর বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।
তাহলে যদি এই চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিশর ত্যাগকালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ। আর এই তথ্য কেনোমতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ:

32 গণনাপুস্তক ১/৪৫-৪৭।
102

প্রথমত, আদিপুস্তক ৪৬/২৭, যাত্রাপুস্তক ১/৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১০/২২ -এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।
দ্বিতীয়ত, ইস্রা্য়েল-সন্তানগণ মিশরে অবস্থান করেছিলেন সর্বমোট ২১৫ বৎসর। এর বেশি তারা অবস্থান করেন নি।
তৃতীয়ত, যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মিশর ত্যাগের ৮০ বৎসর পূর্ব থেকে তাদের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হত থাকে এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হত।
এ তিনটি বিষয়ের আলোকে যে কোনো সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ নিশ্চিত হবেন যে, মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল সন্তানদের যে সংখ্যা (৬,০৩,৫৫০) উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভুল।
আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টি একেবারে বাদ দিই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিশরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেত যে, প্রতি ২৫ বৎসরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বৎসরে ৭০ থেকে ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার)-ও হতে পারে না। তাহলে সর্বমোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ হওয়া বা লেবীয়গণ বাদে মোট পুরুষ যোদ্ধার সংখ্যা ছয় লক্ষ হওয়া কিভাবে সম্ভব! এর সাথে যদি শেষ ৮০ বছরের পুরুষ সন্তান হত্যার বিষয়

103

যোগ করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়।
প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খলদূন (৮০৮ হি/১৪০৫খৃ) তার ইতিহাসের ভূমিকায় বাইবেলে উল্লেখিত এ সংখ্যা অবাস্তব বলে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ মূসা ও ইস্রায়েল (ইয়াকূব)-এর মধ্যে মাত্র তিনটি স্তর বা চারটি প্রজন্ম। যাত্রাপুস্তক ৬/১৬-২০, গণনাপুস্তক ৩/১৭-১৯ ও ১ বংশাবলী ৬/১৮-এর বর্ণনা অনুসারে: মোশির পিতা অম্রাম (ইমরান), তার পিতা কহাৎ, তার পিতা লেবি, তার পিতা যাকোব। যাকোব ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। আর মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক কখনোই মানতে পারে না যে, মাত্র চার পুরুষে ৭০ জনের বংশধর ২০-২৫ লক্ষ হতে পারে।
নিম্নের বিষয়দুটি এ ভুলকে আরো নিশ্চিত করে:
(১) যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩৮-৪২ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশর পরিত্যাগ করে তখন তাদের সাথে ছিল গৃহপালিত পশুর বিশাল বাহিনী। সকল মানুষ ও পশু একরাতের মধ্যে সমূদ্র পার হয়েছিলেন। তারা প্রতিদিন পথ চলতেন এবং তাদের যাত্রার জন্য মোশির নিজের মুখের সরাসরি নির্দেশই যথেষ্ট ছিল। তারা সমূদ্র অতিক্রম করার পরে সিনাই পর্বতের পার্শে ১২টি ঝর্ণার পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। যদি ইস্রায়েল সন্তানগণের সংখ্যা এ

সময়ে ২০/২৫ লক্ষই হতো তাহলে কখনোই একরাতে তারা সকল মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনী সমূদ্র অতিক্রম করতে পারতেন না, প্রতিদিন পথ চলতে পারতেন না, মূসা আলাইহিস সালাম-এর মুখের কথা শুনেই সকলে যাত্রা শুরু করতে পারতেন না এবং সিনাই প্রান্তরের সীমিত স্থানে মাত্র ১২টি ঝর্ণায় তাদের এত মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনীর স্থান সংকুলান হতো না।
(২) যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাত্র দুজন ধাত্রী ছিল: একজনের নাম শিফ্রা ও অন্যজনের নাম পূয়া। মিশরের রাজা ফরৌণ এ দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা ইব্রীয় (ইস্রায়েলী) মহিলাদের সন্তান প্রসব করানোর সময় তাদের পুত্র সন্তান হলে হত্যা করবে এবং কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখবে। যদি ইস্রায়েলীগণের সংখ্যা এত বেশি হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই মাত্র দুইজন ধাত্রী তাদের সকলের জন্য ধাত্রীকর্ম করতে পারতো না। বরং তাদের মধ্যে শতশত ধাত্রী থাকতো।
উপরের আলোচনা থেকে এথা স্পষ্ট যে, মিশর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা ছিল, ৭০ জন থেকে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ২১৫ বৎসরে যেমন হতে পরে, যাদের মহিলাদের ধাত্রী-কর্ম করার জন্য দুইজন ধাত্রীই যথেষ্ট ছিল, একটি রাতই যাদের

সমূদ্র পারাপারের জন্য যথেষ্ট ছিল, একদিনে মৌখিক আদেশ প্রদান করেই মোশি যাদেরকে নিয়ে সমূদ্র পার হতে পেরেছেন, সিনাই পর্বতের পাদদেশে এবং ইলমের সংকীর্ণ স্থানে সাথের গৃহপালিত পশু সহ যাদের স্থান সংকুলান হয়েছিল। সামান্যতম সন্দেহ ছাড়াই আমরা সুনিশ্চিত যে মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যার বিষয়ে যাত্রাপুস্তকের ১/৪৪-৪৭-এর বর্ণনা ভুল ও অসত্য।
৩- যে ভুলের জন্য দায়ূদ আলাইহিস সালামের নুবুওয়াত বাতিল হয়!
দ্বিতীয় বিববরণ ২৩/২: ‘‘জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’’ এ বক্তব্যটি ভুল। কারণ এটি সত্য হলে দায়ূদ আলাইহিস সালাম সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না; নবী বা ভাববাদী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ দায়ূদের দশম পূর্বপুরুষ পেরস তারা দাদা যিহূদার জারজ সন্তান ছিলেন।

33

যিহূদা তার পুত্রবধু -মৃতপুত্রের স্ত্রী- তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এ ব্যভিচারের ফলে পেরসের জন্ম হয়। আদিপুস্তকের ৩৮/১২-৩০ শ্লোকে তা সুস্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে।
পেরস থেকে শুরু করলে দায়ূদ দশম পুরুষ হন। মথিলিখিত সুসমাচারের ১/১-৬ এবং

33 অর্থাৎ বর্তমান তোরাহ এর ভাষ্যমতে। [সম্পাদক]
106

লূকলিখিত সুসমাচারের ৩/৩১-৩৩-এ বর্ণিত দায়ূদের বংশতালিকা নিম্নরূপ: (১) দায়ূদ বিন (২) যিশয় বিন (৩) ওবেদ বিন (৪) বোয়স বিন
(৫) সল্মোন বিন (৬) নহশোন বিন (৭) অম্মীনাদব বিন (৮) রাম বিন (৯) হিষ্রোন বিন
(১০) পেরস। মথি ১/৩-৬: ‘‘যিহূদার পুত্র পেরস... পেরসের পুত্র হিয্রোন, হিয্রোণের পুত্র রাম, রামের পুত্র অম্মীনাদব, অম্মীনাদবের পুত্র সলমোন, সলমোনের পুত্র বোয়স... বোয়সের পুত্র ওবেদ... ওবেদের পুত্র যিশয়, যিশয়ের পুত্র দায়ূদ।’’ দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক সঠিক হলে দায়ূদ কখনোই নবী হতে পারেন না। অথচ দায়ূদ আলাইহিস সালাম- সদাপ্রভুর সমাজের নেতা ও গৌরব। তারই পরিচয়ে যীশুখৃস্টের পরিচয়।
গীতসংহিতার ৮৯ গীতের ২৬-২৭ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তিনি সদাপ্রভুর প্রথমজাত (firstborn) সন্তান বা জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং সকল রাজার সেরা ও সর্বোচ্চ রাজা। কাজেই দ্বিতীয় বিবরণের এ শ্লোকটি নিঃসন্দেহে ভুল ও অসত্য।
এখানে একটি জালিয়াতির অবস্থা দেখুন। লন্ডনে ১৮২৫ সালে মুদ্রিত রজার্ড ওয়াটস-এর বাইবেলে এবং ১৮২৬ সালে কলকাতায় মুদ্রিত বাইবেলে (উইলিয়াম কেরির বঙ্গানুবাদ বাইবেলে) লূকলিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে যীশুর বংশতালিকায় দায়ূদের অষ্টম পূর্বপুরুষ ‘‘রাম’’ ও নবম পূর্বপুরুষ

‘‘হিয্রোন’’-এর মধ্যে ‘‘অর্নি’’ নামটি সংযোজন করে বলা হয়েছে ‘‘রাম বিন অর্ণি বিন হিয্রোন বিন পেরস’’ (কেরির বাংলা বাইবেলে: ইনি অদমানের পুত্র, ইনি অর্নির পুত্র, ইনি হিয্রোনের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র)।
এ সংযোজনের উদ্দেশ্য দায়ূদকে বাঁচানো, যেন তিনি পেরসের দশম পুরুষ না হয়ে একাদশ পুরুষ হন। কিন্তু বিকৃতিকারীগণ এখানে সংযোজনের সময় মথির লেখা বংশতালিকায় ‘‘অর্নি’’ নামটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে উক্ত দুটি সংস্করণেই মথির বংশতালিকা অনুসারে দায়ূদ পেরসের দশম পুরুষই রয়ে গিয়েছেন। ফলে তাদের সংস্করণেই মথির বক্তব্যের সাথে লূকের বক্তব্যের বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে এবং তাদের জালিয়াতি ধরা পড়ে গিয়েছে। আর সর্বাবস্থায় দায়ূদের জারজ সন্তানের দশম পুরুষ হওয়ার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে।
অনুরূপভাবে ১৮৪৪ সালের সংস্করণে ও ১৮৬৫ সালের সংস্করণেও ‘‘অর্নি’’ নামটি সংযোজন করা হয় নি, মথিতেও না, লূকেও না, বরং উভয় সুসমাচারেই ‘‘রাম বিন হিষ্রোন’’ লেখা হয়েছে।

34

34 ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন (অথোরাইযড ভার্সন)-উভয় স্থানেই ‘‘হিয্রোনের পুত্র রাম’’ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে মথির সুসমাচারে ‘হিয্রোনের পুত্র রাম’ এবং লূকের সুসমাচারে ‘হিয্রোনের পুত্র অর্নি, অর্নির পুত্র রাম’ লেখা হয়েছে।
108

প্রকৃত সত্য কথা হলো, আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ১২-৩০ শ্লোকে পুত্রবধু তামরের সাথে যিহূদার ব্যভিচারের যে ঘৃণ্য কাহিনী লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ জাল ও বানোয়াট কাহিনী। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ২ শ্লোকটি (জারজ সন্তানের দশম পুরুষ পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না) ভুল। কারণ এরূপ বিধান কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে পারে না। মূসা আলাইহিস সালাম কখনো এরূপ কথা লিখতে পারেন না। কারণ একের পাপের ভার অন্যে বহন করবে তা হতে পারে না। এজন্য বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলি বলেন: ‘‘(দশম পরুষ পর্যন্ত সদাপ্রভুর সমাজে {জান্নাতে} প্রবেশ করতে পারবে না) কথাটি সংযোজিত (জাল ও বানোয়াট)।’’
৪- বৈত-শেমস গ্রামের নিহতদের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল
১ শমূয়েল-এর ৬ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘পঞ্চাশ সহস্র জনকে’’

35। এই কথাটি
নির্ভেজাল ভুল ও অসত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন।
শমূয়েল ভাববাদীর ১ম পুস্তকের ৪-৬ অধ্যায়ে ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ম-সিন্দুক বা ঈশ্বরীয় সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হওয়া ও তা পুনরুদ্ধারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সদাপ্রভুর-সিন্দুক ফেরত আনার সময়ে বৈৎ-

35 ‘‘ফলতঃ তিনি লোকেদের মধ্যে সত্তর জনকে এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন।’’
109

[illegible]: ‘‘(**[illegible]**) [illegible]; [illegible] [illegible] … (**[illegible]**) [illegible], [illegible] **(he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men)**[illegible] [illegible]’’

[illegible]

সিন্দকের দিকে বা মধ্যে পঞ্চাশ হাজার সত্তর জন মানুষ একত্রে বা একসাথে দৃষ্টিপাত করবেন বা দেখতে পাবেন।
অতঃপর তিনি বলেন: ‘‘ল্যাটিন অনুবাদে রয়েছে: ‘সত্তর জন নেতা ও ৫০ হাজার সাধারণ মানুষ’, সিরীয় অনুবাদে রয়েছে: ‘পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ’, অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবী অনুবাদে রয়েছে: ‘পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ’। ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) শুধু ‘৭০ জন মানুষ’ লিখেছেন। ইয়াহূদী পণ্ডিত শলোমন গার্গি ও অন্যান্য রাব্বি বিভিন্ন সংখ্যা লিখেছেন। এ সকল পরস্পরবিরোধী তথ্য এবং বাইবেলের পাঠে উল্লিখিত সংখ্যার অবাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত যে, নিঃসন্দেহে এ স্থানে বিকৃতি সাধিত হয়েছে। হয়তবা কিছু কথা বৃদ্ধি করা হয়েছে অথবা কিছু কথা পড়ে গিয়েছে।’’
হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে: মূল হিব্রু বাইবেলে নিহতদের সংখ্যা (৫০,০৭০) বলা হয়েছে উল্টাভাবে (৭০ ও ৫০ হাজার)। এ ছাড়াও একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মানুষের পাপে লিপ্ত হওয়া ও নিহত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। কাজেই এই ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। জোসেফাস নিহতদের সংখ্যা শুধু ‘৭০’ লিখেছেন।
তাহলে দেখুন, কিভাবে এ সকল পণ্ডিত এ ঘটনা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেন, এ বর্ণনাকে
111

মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এখানে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করলেন।
৫- সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বারান্ডার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল
২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর মসজিদ বা আল-মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: শলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা হয়েছে: ‘‘আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।’’
‘‘১২০ হাত উচ্চ’’ কথাটি নিখাদ ভুল। ১
রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরটির উচ্চতা ছিল ত্রিশ হস্ত। তাহলে বারান্ডা কিভাবে ১২০ হাত উচু হবে?
আদম ক্লার্ক তার ভাষ্যগ্রন্থে ২
বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ভুল স্বীকার করেছেন। এজন্য সিরিয় (সুরিয়ানী) ভাষায় ও আরবী ভাষায় অনুবাদে অনুবাদকগণ ১২০ সংখ্যাকে বিকৃত করেছেন। তারা ‘‘এক শত’’ কথাটি ফেলে দিয়ে বলেছেন: ‘‘বিশ হাত উচ্চ’’। ১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে মূল হিব্রু বাইবেলের এ ভুল ‘‘সংশোধন’’ (!) করে লেখা হয়েছে: ‘‘আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।’’

112

৬- অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় ভুল
২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে ৩ ও ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘(৩) অবিয় চারি লক্ষ মনোনিত যুদ্ধবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং যারবিয়াম আট লক্ষ মনোনীত বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন।...
(১৭) আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুত ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল।’’
উপরের শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ভুল। বাইবেল ব্যাখাকারগণ তা স্বীকার করেছেন। সে যুগের ছোট্ট দুটি ‘গোত্র রাজ্য’ যিহূদা ও ইস্রায়েরের জন্য উপরের সংখ্যাগুলি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ কারণে ল্যাটিন অনুবাদের অধিকাংশ কপিতে ‘লক্ষ’-কে হাজারে নামিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম স্থানে ‘চারি লক্ষ’ পাল্টিয়ে ‘চল্লিশ হাজার’, দ্বিতীয় স্থানে ‘আট লক্ষ’ পাল্টিয়ে ‘আশি হাজার’ ও তৃতীয় স্থানে ‘পাঁচ লক্ষ’ পাল্টিয়ে ‘৫০ হাজার’ করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। হর্ন ও আদম ক্লার্ক এ ‘‘সংশোধন’’ (!) সমর্থন করেছেন। আদম ক্লার্ক অনেক স্থানেই বারংবার সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তগুলিতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

৭- ফল ভোজন ও মানুষের আয়ু বিষয়ক ভুল আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে (for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die)।’’
এ কথাটি ভুল। কারণ আদম আলাইহিস সালাম এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন এবং যে দিন এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন, সে দিন তিনি মরেন নি। বরং এর পরেও ৯০০ বৎসরেরও বেশি সময় তিনি জীবিত ছিলেন।
আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করিবে না; কারণ সেও তো মাংসমাত্র; পরন্তু তার সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।’’

36

‘‘মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হবে’’ এই কথাটি ভুল। কারণ পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স

36 এই শ্লোকটির ইংরেজী পাঠ নিম্নরূপ: (And the Lord said, My Spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh; yet his days shall be a hundred and twenty years) এই ইংরেজী পাঠের ভিত্তিতে ও গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠের ভিত্তিতে উপরের বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে। এখানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের ভাষা নিম্নরূপ: ‘‘তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না; তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র। পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।’’

আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১-৩১ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আদম ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনুরূপভাবে শিস (শেথ) ৯১২ বৎসর, ইনোশ ৯০৫ বৎসর, কৈনন ৯১০ বৎসর, মহললেল ৮৯৫ বৎসর, যেরদ ৯৬২, হানোক (ইদরীস আ.) ৩৬৫ বৎসর, মথূশেলহ ৯৬৯ বৎসর, লেমক ৭৭৭ বৎসর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। নোহ (নূহ) ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

37 শেম (সাম)
৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

38 অর্ফক্ষদ ৩৩৮
বৎসর আয়ু লাভ করেন।

39 এভাবে অন্যান্যরা
দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বৎসর আয়ু পাওয়ার ঘটনাও কম ঘটে। এভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর বলে নির্ধারণ করা ভুল।
৮- যীশুর বংশতালিকায় পুরুষ গণনায় ভুল মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘এইরূপে আব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।’’ এখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে এবং যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ। এ কথাটি সুস্পষ্ট ভুল।

37 আদিপুস্তক ৯/২৯।
38 আদিপুস্তক ১১/১০-১১।
39 আদিপুস্তক ৯/১২-১৩।
115

মথির ১/১-১৭-র বংশ তালিকায় যীশু থেকে আবরাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম অংশ: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে দায়ূদ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, দ্বিতীয় অংশ সুলাইমান আলাইহিস সালাম থেকে যিকনিয় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং তৃতীয় অংশ শল্টীয়েল থেকে এবং যীশু পর্যন্ত মাত্র ১৩ পুরুষ রয়েছেন। তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে বোরফেরী এই বিষয়টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু এর কোনো সঠিক সমাধান কেউ দিতে পারেন নি।

40

40 এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মথি লিখেছেন: ‘‘দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।’’ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এ কথাটি মারাত্মক ভুল। ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায় থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই পর্যায়ে ১৮ পুরুষ ছিল, ১৪ পুরুষ নয়। মথির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ: ১. শলোমন, ২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭. উষিয়, ৮. যোথাম, ৯. আহস, ১০. হিষ্কিয়, ১১. মনঃশি, ১২. আমোন, ১৩. যোশিয় ও ১৪. যিকনিয়। অপরদিকে ১ বংশাবলির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ: ১. শলোমন,
২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭ . অহসিয় , ৮ . যোয়াশ , ৯ . অমৎসিয়, ১০. অসরিয় (৭. উষিয়,)
১১. (৮) যোথাম, ১২. (৯) আহস, ১৩. (১০) হিষ্কিয়, ১৪.
(১১) মনঃশি, ১৫. (১২) আমোন, ১৬. (১৩) যোশিয়, ১৭ . যিহোয়াকীম ও ১৮. (১৪) যিকনিয়। এখানে বাইবেলের দুই স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন বা পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র। মথি যোরাম ও উষিয় (অসরিয়) এর মধ্যে তিন পুরুষ ফেলে দিয়েছেন এবং যোশিয় ও যিকনিয়র মাঝে এক পুরুষ ফেলে 116

৯- দায়ূদ কর্তৃক মহাযাজকের রুটি খাওয়ার বর্ণনায় ভুল
মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৩-৪ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(৩) তিনি (যীশু) তাহাদিগকে (ইয়াহূদী ফরীশীগণকে) কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? (৪) তিনি ত ঈশ্বরে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার দর্শন-রুটী ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বিধেয় ছিল না, কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল।’’
মার্কলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২৫-২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(২৫) তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? (২৬) তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়,

দিয়েছেন। তিনি শুধু ফেলে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু এখানে যে আর কেউ ছিল না নিশ্চিত করতে এই পর্যায়ে সর্বমোট ১৪ পুরুষ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যান (১৮০১-১৮৯০) আফসোস করে বলেন, খৃস্টান ধর্মে একথা বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা। কিন্তু এখন একথাও বিশ্বাস করা জরুরী হয়ে গেল যে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখ্যা; কারণ পবিত্র গ্রন্থে কোনো ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই। 117

তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।’’
এখানে ‘ও তাঁহার সঙ্গীরা’, ‘তাঁহার সঙ্গীদের’ এবং ‘‘সঙ্গীদেরকেও দিয়াছিলেন’’ কথাগুলি সবই ভুল। কারণ ‘দর্শন-রুটী’ ভোজন করার সময় দায়ূদ ‘একা’ ছিলেন, তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না।
এছাড়া ‘তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া’ কথাগুলিও ভুল। কারণ এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযাজকের নাম ছিল ‘অহীমেলক’। ‘অবিয়াথর’ এ সময়ে যাজক ছিলেন না। অবিয়াথর ছিলেন অহীমেলকের পুত্র। এ কথাগুলি যে ভুল তা ১ শমূয়েল-এর ২১ অধ্যায়ের ১-৯ শ্লোক ও ২২ অধ্যায়ের ৯-২৩ শ্লোকে মূল ঘটনা পাঠ করলেই জানা যায়। মি. জুয়েল তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ কথাগুলি ভুল। অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তা স্বীকার করেছেন। তাদের মতে এ কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, যা ইচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রমাণ।
১০- ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায় ভুল
মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(৫০) পরে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মা সমর্পন করিলেন।
(৫১) আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, (৫২) এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; (৫৩) এবং
118

তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।’’
মন্দিরের তিরস্করিণী (পর্দা) বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্কের ১৫/৩৮ ও লূকের ২৩/৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি বিষয়গুলি, অর্থাৎ পাথরগুলি ফেটে যাওয়া, কবরগুলি খুলে যাওয়া, মৃত লাশগুলির বেরিয়ে আসা, যেরুশালেমে প্রবেশ করা, তথাকার অধিবাসীদের সাথে মৃতলাশগুলির দেখা- সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেন নি।
এগুলি অত্যন্ত বড় বিষয়। মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এর পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেন নি। তারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে দবি করার কোনো সুযোগ নেই; কারণ মানুষ সব কিছু ভুললেও এরূপ অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো ভুলতে পারে না। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউই এই অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না?
এ কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য

119

সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার পুস্তকে এ কাহিনীটি মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এই কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যিরূশালেমের ধ্বংসের পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্প-কাহিনী ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথিলিখিত সুসমাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক (copier) লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।
পণ্ডিত নর্টনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক ছিলেন ‘রাতের আঁধারে কাঠ-সংগ্রহকারীর মত’ বিবেচনা ও বিচার শক্তিবিহীন। শুখনো ও ভিজের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন। এইরূপ একজনের অনুবাদ ও সম্পাদনার উপরে কি নির্ভর করা যায়? কখনোই না।
১১- শেলহের পিতার নাম বর্ণনায় ভুল:
লূক তার সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন: ‘‘ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র’’

41

এ কথাটি ভুল। কারণ, শেলহ নিজেই অর্ফকষদের পুত্র ছিলেন, তিনি অর্ফকষদের

41 লূক ৩/৩৬।

পৌত্র ছিলেন না। আদিপুস্তক ১০/২৪ নিম্নরূপ: ‘‘আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন।’’ আদিপুস্তক ১/১২-১৩ নিম্নরূপ: ‘‘অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন। শেলহের জন্ম দিলে পর অর্ফক্ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।’’ হিব্রু তাওরাত ও শমরীয় তাওরাত উভয়ই সুস্পষ্টভাবে এ সকল স্থানে উল্লেখ করেছে যে, অর্ফক্ষদ শেলহের পিতা এবং শেলহ অর্ফক্ষদের ঔরষজাত সন্তান। ১ বংশাবলি ১/১৮-তেও এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও অর্ফকষদ ও শেলহের মধ্যে কৈননের নাম উল্লেখ করা হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, লূকের সুসমাচারের উপর্যু&ক্ত কথাটি ভুল। এখানে উল্লেখ্য যে তাওরাতের গ্রীক অনুবাদের (the Septuagint: LXX) শেলহের পিতা হিসেবে ‘‘কৈননের’’ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যত খৃস্টানগণ নিজেদের সুসমাচারের বর্ণনাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য অনুবাদের মধ্যে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন।
১. ৩. ৩. বাইবেলের বিকৃতির আলোচনা
এ অনুচ্ছেদে আমরা শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বাইবেলে মধ্যে যে সকল বিকৃতি সাধন করা হয়েছে তার সামান্য কিছু নমুনা আলোচনা করতে চাই।

121

১- প্লাবন পূর্ব মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বিকৃতি:
আদিপুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ১-৩২ শ্লোকে আদমের আলাইহিস সালাম সৃষ্টি থেকে নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে।

122

কিন্তু বাইবেলের তিন সংস্করণে

42 এ সময়কার
তিন প্রকার লেখা হয়েছে।
শমরীয় সংস্করণ অনুসারে আদম থেকে প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল এক হাজার তিনশত সাত (১৩০৭) বৎসর। হিব্রু সংস্করণে এ সময় এক হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (১৬৫৬) বছর। গ্রীক সংস্করণ

42 ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির তিনটি মূল সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। (১) হিব্রু সংস্করণ বা হিব্রু পাণ্ডুলিপি
(২) গ্রীক সংস্করণ বা গ্রীক পাণ্ডুলিপি ও (৩) শমরীয় (Samaritan) সংস্করণ বা শমরীয় পাণ্ডুলিপি।
ইহূদীগণের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক ভাষা হিব্রু ভাষা। এ ভাষাতেই তাদের সকল ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়। স্বভাবতই পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থই হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। খৃস্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার প্যালেস্টাইন দখল করেন এবং তা গ্রীক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইহূদীগণ গ্রীক রাজ্যের নাগরিকে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে গ্রীক ভাষার কিছু প্রচলন ক্রমান্বয়ে শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খৃস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম নামে পরিচিত ইহূদী ধর্মগ্রন্থগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কথিত আছে যে, মিসরের শাসক ২য় টলেমি: টলেমি ফিলাডেলফাস (Ptolemy Philadelphus)- এর রাজত্বকালে (খৃ. পূ. ২৮৫-২৪৬) তাঁর নিদের্শে নির্দেশে ৭০/৭২ জন পন্ডিত তা ‘আলেকজেন্ড্রীয় গ্রীক ভাষায়’ অনুবাদ করেন। এই গ্রীক অনুবাদটিই the Septuagint (LXX) বা ‘সত্তরের’ অনুবাদ বলে প্রসিদ্ধ। যীশুখৃস্টের সময়ে এ অনুবাদটি প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টানগণ গ্রীক অনুবাদকেই পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধ সংস্করণ বলে দাবি করতেন। গ্রীক অনুবাদ থেকে তারা ল্যাটিন অনুবাদ করেন। 123

অনুসারে এ সময় দুই হাজার দুই শত বাষট্টি (২২৬২) বছর। এভাবে আমরা দেখছি যে, তিনটি সংস্করণের মধ্যে সময়ের বিবরণে বিরাট পার্থক্য ও বিশ্রী বৈপরীত্য রয়েছে। এ বৈপরীত্য ও পার্থক্য সমন্বয় করা সম্ভব নয়। (নিঃসন্দেহে দুটি বা সবগুলি সংস্করণে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।)
তিনটি সংস্করণই একমত যে, আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৩০ বৎসর (আদিপুস্তক ৫/৫) এবং তিন সংস্করণই একমত যে, প্লাবনের সময় নূহ আলাইহিস সালাম-এর বয়স ছিল ৬০০ বৎসর (আদিপুস্তক ৭/৬)।
এতে শমরীয় সংস্করণের বর্ণনা অনুসারে প্লাবনের মাত্র ৩৭৭ বৎসর পূর্বে (১৩০৭-
৯৩০) আদমের মৃত্যু হয়। আর যেহেতু প্লাবনের ৬০০ বৎসর পূর্বে নূহ আলাইহিস সালামের জন্ম, সেহেতু আদমের মৃত্যুর সময় নোহের বয়স

তারা দাবি করেন যে, গ্রীক অনুবাদের অশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য ১৩০ খৃস্টাব্দের দিকে ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি সাধন করে। প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, মূল হিব্রু বাইবেলেই বিশুদ্ধ এবং গ্রীক অনুবাদ অসংখ্য ভুলে ভরা।
সুলাইমান (আ)-এর পরেই ইহূদীগণ বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের এক সম্প্রদায়কে শমরীয় (Samaritans) বলা হয়, যারা প্রাচীন ফিলিস্তিনের শামেরা বা শামারিয়া (Samaria) রাজ্যে বসবাস করত। এদের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের প্রাচীন সংস্করণকে শমরীয় তাওরাত বলা হয়।
124

ছিল ২২৩ বৎসর (৬০০-৩৭৭)। ঐতিহাসিকগণ একমত যে বিষয়টি বাতিল। হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল তা মিথ্যা প্রমাণ করে। আদমের বয়স ও প্লাবনের সময় নূহের বয়সের সমষ্টি (৯৩০+৬০০=) ১৫৩০ বৎসর। হিব্রু বাইবেলের তথ্য অনুযায়ী (১৬৫৬-১৫৩০) আদমের মৃত্যুর ১২৬ বৎসর পরে নোহের জন্ম। আর গ্রীক বাইবেলের তথ্য অনুসারে (২২৬২-১৫৩০) আদমের মৃত্যুর ৭৩২ বৎসর পরে নোহের জন্ম।
প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) খৃস্টানদের নিকটও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য। এই বিশ্রী বৈপরীত্য ও পার্থক্যের কারণে তিনি ‘পুরাতন নিয়মের’ এই তিন সংস্করণের কোনোটির বিবরণই গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নোহের প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল ছিল দুই হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন (২২৫৬) বৎসর।
২- প্লাবন পরবর্তী মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বিকৃতি:
আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১০-২৬ শ্লোকে নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নূহ আলাইহিস সালাম থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের তিন সংস্করণে এ সময়কার তিন প্রকার লেখা হয়েছে।

বলেছেন, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময় হলো তিনশত বাহান্ন (৩৫২) বৎসর।
১ম খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) এ সকল বিবরণের কোনোটিই গ্রহণ করেন নি; বরং তিনি বলেছেন: এই সময়কাল ছিল নয়শত তিরানববই
(৯৯৩) বৎসর। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে জোসেফাসের মতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।
হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তারা চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু (যাজক) সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine, Bishop of Hippo: 354–430)- এর মতামত উল্লেখ করেছেন যে, প্লাবনের আগের ও পরের যুগের মানুষদের বর্ণনার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করেছে। গ্রীক সংস্করণ যাতে অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেজন্য এবং খৃস্টধর্মের বিরোধিতার জন্য তারা এই বিকৃতি করেছে। ১৩০ খৃস্টাব্দে ইয়াহূদীরা এই বিকৃতি সাধন করে। হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, গবেষক হেলস শক্তিশালী প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াহূদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করেছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেনিকটও প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াহূদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করে।

বিবেকবান পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, এ সকল খৃস্টান গবেষক পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাকারগণের শেষ গতি বিকৃতির কথা স্বীকার করা। তারা স্বীকার করছেন যে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কমবেশি করে তাদের ঐতিহাসিক বিবরণগুলি বিকৃত করেছেন।
৩-প্রস্তর স্থাপনের জন্য নির্ধারিত পর্বতের নামে বিকৃতি:
দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ২৭ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম, তোমরা যর্দন পার হইলে পর এবল পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে, ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।’’
এ শ্লোকটি শমরীয় সংস্করণে নিম্নরূপ: ‘‘আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম.... গরিষীম পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে, ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।’’
দ্বিতীয় বিবরণের ২৭/১২-১৩ এবং এ পুস্তকের ১১/২৯ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এবল ও গরিষীম(Mount Ebal & Mount Ger'izim) ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দুটি পাশাপাশি পাহাড়। দ্বিতীয় বিবরণ ১১/২৯ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘আর তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তুমি
128

গরিষীম পর্বতে ঐ আশীর্বাদ, এবং এবল পর্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন করিবে।’’
হিব্রু সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি এবল পাহাড়ে ধর্মধাম বা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। আর শমরীয় সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি গরিষীম পাহাড়ে ধর্মধাম নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে বির্তক খুবই প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে, অন্য সম্প্রদায় এস্থলে তোরাহের বক্তব্য বিকৃত করেছে। প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ হিব্রু সংস্করণের বিশুদ্ধতা দাবি করেছেন এবং কেউ শমরীয় সংস্করণের বিশুদ্ধতা দাবি করেছেন। প্রসিদ্ধ বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক, প্রসিদ্ধ গবেষক কেনিকট (Benjamin Kennicott) ও অন্যান্য পণ্ডিত শমরীয় সংস্করণের বিশুদ্ধতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তারা প্রমাণ করেন যে, শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে ইয়াহূদীরা এখানে তোরাহ-এর বক্তব্য বিকৃত করেছে। আর একথা তো সকলেই জানেন যে, গরিষীম পাহাড়টি অনেক ঝর্ণা, বাগিচা, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এবল একটি শুষ্ক পাহাড়। তাতে এসব কিছুই নেই। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রথম পাহাড়টি দোয়া ও বরকতের জন্য এবং দ্বিতীয় পাহাড়টি অভিশাপ প্রদানের জন্য শোভনীয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এখানে হিব্রু বাইবেলের বিকৃতির কথা স্বীকার করছেন।
৪- রাজ্যের নামে বিকৃতি:
হিব্রু বাইবেলে ২ বংশাবলির ২৮ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘কেননা ইস্রায়েল রাজ আহসের জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে নত করিলেন...।’’
এখানে ‘ইস্রায়েল’ কথাটি নিশ্চিতরূপে বিকৃত ও ভুল; কারণ আহস কখনোই ‘ইস্রায়েল’ রাজ্যের রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ‘যিহূদা’ রাজ্যের রাজা।

43 গ্রীক ও ল্যাটিন
অনুবাদে ‘যিহূদা’ শব্দ রয়েছে। কাজেই বিকৃতিটি ঘটেছে হিব্রু সংস্করণের মধ্যে। ৫- না বনাম হ্যাঁ:

43 সুলাইমান (আ)-এর মৃত্যুর পরে তার পুত্র রুহবিয়ামের রাজত্বকালে (খৃ. পূ ৯২২ অব্দে) ইহূদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তাদের রাজ্য দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে ইস্রাইল রাজ্য (the Kingdom of Israel) বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে ‘যিহূদা রাজ্য’ (the Kingdom of Judea, also Judaea or Judah) বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম। উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্যকে অনেক সময় শামেরা (Samaria) বা ইফ্রমিয় (Ephraimites) বলা হতো। বাইবেলের একটি বড় অংশ এ দুই রাজ্যের মধ্যকার হানাহানি, গণহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ, মুর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির বর্ণনা।

গীতসংহিতার ১০৫ নং গীতের ২৮ শ্লোকে হিব্রু সংস্করণে বলা হয়েছে: ‘‘তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না।’’ এখানে গ্রীক সংস্করণে বলা হয়েছে: ‘‘তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন।’’
হিব্রু বাইবেলে বাক্যটি না-বাচক কিন্তু গ্রীক বাইবেলে বাক্যটি হাঁ-বাচক। দুটি বাক্যের একটি নিঃসন্দেহে বিকৃত ও ভুল। এখানেও খৃস্টান পণ্ডিতগণ দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, এ দুই সংস্করণের মধ্যে বিরাজমান এ পার্থক্যের কারণে অনেক দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বাহ্যত কোনো একটি সংস্করণে ‘না’ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা বাড়ানো হয়েছে। এভাবে তারা এখানে বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু তারা কোন সংস্করণে বিকৃতিটি ঘটেছে তা নির্ধারণ করতে পারলেন না।
৬. প্রচলিত তাওরাত মূসা আলাইহিস সালাম-এর পরে লেখা হয়েছে:
আদিপুস্তক ৩৬/৩১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্বে ইঁহারা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন।’’ এরপর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রথম রাজা তালূত (শৌল)-এর রাজত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত ইদোমের রাজাদের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা

131

হয়েছে।

44 তালূতের পরে ইস্রায়েলীয়দের রাজা
হন দায়ূদ আলাইহিস সালাম। তাঁদের পূর্বে ইস্রায়েলীয়গণ বিচারকগণ কর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হতেন।
এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আদিপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ের ৩১-৩৯ শ্লোকগুলি অবিকল ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৫০ শ্লোক। রাজাবলির মধ্যে এ বিষয়গুলি আলোচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; এ শ্লোকগুলি নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, এগুলির লেখক মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর ৩৫৬ বৎসর পরে তালূত (শৌল)-এর রাজ্যভার গ্রহণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে বণী ইস্রায়েল বা ইস্রায়েল-সন্তানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরের যুগের মানুষ। আর বংশাবলি তালূদের যুগের অনেক পরে লেখা সে বিষয়ে মতভেদ নেই।

44 মোশির মৃত্যুর পরে দীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কোনো রাজা বা রাজত্ব ছিল না। নবী (ভাববাদী) বা বিচারকর্তৃগণ তাদেরকে পরিচালনা করতেন। সর্বশেষ বিচারকর্তা শমূয়েল ভাববাদীর সময়ে ইস্রায়েলীয়গণ তাঁর নিকট একজন রাজা নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তখন কীশের পুত্র শৌল (তালুত) নামক এক ব্যক্তি রাজা মনোনিত হন। আনুমানিক খৃ. পূ. ১০১৫/১০০০ অব্দে অমালিকা সম্প্রদায়ের রাজা জালূত (Golieth)-কে পরাজিত করে তালুত প্রথম ইস্রায়েলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম ইস্রায়েলীয় রাজা বলে গণ্য হন। তাহলে মূসার (আ) লিখিত বলে কথিত ‘‘তাওরাতের’’ পাঁচ পুস্তকের প্রথম পুস্তকে মূসার (আ) মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পরের ঘটনাবলি লেখা হচ্ছে।
132

তবে ‘আদিপুস্তক’-এ কথাগুলির থাকার কোনোরূপ কোনো ব্যাখ্যা নেই। যে পুস্তক তালুতের যুগের সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে মূসা আলাইহিস সালাম-এর লেখা তাওরাতের প্রথম পুস্তক তার মধ্যে এ কথা কিভাবে লেখা হলো?
আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, আমার দৃঢ় ধারণা হলো এ শ্লোকগুলি কখনোই মোশি লিখেন নি। বরং এগুলি সম্ভবত আদিপুস্তকের কোনো পাণ্ডুলিপির টীকায় লেখা ছিল। অনুলিপিকার একে মূল পাঠের অংশ মনে করে মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।
এভাবে এ ব্যাখ্যাকার বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও সংযোজনের কথা স্বীকার করলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলি বিকৃতি যোগ্য ও বিকৃতির উর্ধ্বে নয়। কারণ এ নয়টি শ্লোক তোরাহ-এর অংশ না হওয়া সত্ত্বেও তা তোরাহের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এরপর সকল পাণ্ডুলিপিতে তা প্রচারিত হয়েছে।
৭- ‘‘অদ্য পর্যন্ত’’ সংযোজনের বিকৃতি: দ্বিতীয় বিবরণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবেবাৎ-যায়ীর রাখিল; অদ্য পর্যন্ত (সেই নাম চলিত আছে)।’’

133

যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবেবাৎ-যায়ীর রাখিল।’’ এরপর অনেক শতাব্দী পরে ‘অদ্য পর্যন্ত’ কথাটি পাদটীকায় লেখা হয়, যেন জানা যায় যে যায়ীর যে নাম রেখেছিলেন তা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এরপর এই কথাটি পরবর্তী কপিগুলিতে পাদটীকা থেকে মূল বক্তব্যের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। যদি কারো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে গ্রীক কপিগুলি দেখতে পারেন। তিনি দেখবেন যে, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে কিছু কথা মূল পাঠের মধ্যে সংযোজিত রয়েছে; আর কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে তা পাদটীকায় রয়েছে।
তাঁর এ কথা প্রমাণ করে যে, এ পবিত্র ও ঐশ্বরিক পুস্তকগুলি লিখিত হওয়ার শত শত বৎসর পরেও এগুলিতে সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পুস্তকটি লিখিত হওয়ার অনেক শতাব্দী পরে এ কথাটিকে সংযোজন করা হয়েছে। এত পরে সংযোজিত কথাটিও পবিত্র পুস্তকের অংশে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী সকল কপি ও সংস্করণে প্রচারিত হয়েছে! উপরের শ্লোকটির মতই আরেকটি শ্লোক গণনাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক (কোনো কোনো মুদ্রণে ৪০ শ্লোক) নিম্নরূপ: ‘‘আর মনঃশির সন্তান যায়ীর গিয়া তথাকার গ্রাম সকল হস্তগত করিল, এবং তাহাদের নাম হবেবাৎ-যায়ীর (যায়ীরের গ্রামসমূহ) রাখিল।’’

এখানে আরো একটি ভুল রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ‘মনঃশির সন্তান যায়ীর’। কথাটি ভুল। যায়ীরের পিতার নাম ‘সগূব’। ১ বংশাবলির ২য় অধ্যায়ের ২২ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘সগুবের পুত্র যায়ীর, গিলিয়দ দেশে তাঁহার তেইশটি নগর ছিল।’’

45

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় বিবরণ ও গণনা পুস্তকের মধ্যে পরবর্তী যুগের সংযোজন প্রমাণিত হয়েছে এবং ভুল তথ্য সংযোজনও প্রমাণিত হয়েছে। আর বংশাবলির মধ্যেও পিতার নাম ভুল লেখা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।
‘বাইবেল ডিক্সনারী’ গ্রন্থটি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ভারতে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখকগণ বলেন: মোশির পুস্তকে এমন

45 ১ বংশাবলির ২য় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্য থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, যায়ীর নামক এ ব্যক্তি মোশির পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মানুষ ছিলেন না বরং তিনি মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ ছিলেন। যাকোবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তাঁর পুত্র অম্রান, তাঁর পুত্র মোশি। আর যাকোবের অন্য পুত্র যিহূদা, তাঁর পুত্র পেরস, তাঁর পুত্র হিষ্রোণ, তাঁর পুত্র সগূব, তাঁর পুত্র যায়ীর। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সগূব ছিলেন মোশির সমসাময়িক এবং তাঁর পুত্র যায়ীর মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ। কাজেই একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই বক্তব্যটির পুরোটিই অনেক পরের সংযোজন। সংযোজনকারী যায়ীরের নাম ও তাঁর মালিকানাধীন গ্রামগুলির নামের বিষয়ে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কথাটি লিখেছেন। এজন্য তিনি যায়ীরের পিতার নামও ঠিকমত লিখতে পারেন নি। দেখুন ১ বংশাবলি ২/১-২৩ ও ৬/১-৩।
136

কিছু কথা পাওয়া যায় যা স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, তা মোশির কথা নয়। অনুরূপভাবে কিছু কিছু বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সেগুলি মোশির বাচনভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোন্ ব্যক্তি এই সকল বাক্য ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন তা আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: ‘অদ্যাপি’, ‘অদ্য পর্যন্ত’ (unto this day) জাতীয় বাক্যাংশ পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যতদূর বুঝা যায়, এগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তাঁদের স্বীকৃতি অনুসারে শুধু ‘যিহোশূয়ের পুস্তকের’ মধ্যেই আরো ৮টি স্থানে পরবর্তী যুগে এইরূপ বাক্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যদি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে এইরূপ সংযোজন ও বিকৃতির কথা উল্লেখ করি তাহলে তালিকা অত্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে।
৮- বিভিন্ন পুস্তকে ভূমিকা ও অধ্যায় সংযোজন:
দ্বিতীয় বিবরণের প্রথম অধ্যায়ের ১-৫ শ্লোক পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর কথা নয়। এখানে লেখক মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাম পুরুষ (3rd person) ব্যবহার করে বলেছেন: ‘‘(১) যর্দনের পুর্বপারস্থিত প্রান্তরে.... মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে এই সকল কথা কহিলেন।... (৩) সদাপ্রভু যে যে কথা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিতে মোশিকে আজ্ঞা

দিয়াছিলেন, তদনুসারে মোশি চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।.... (৫) যর্দনের পূর্বপারে মোয়াব দেশে মোশি এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন...।’’
বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে দ্বিতীয় বিবরণের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শুরুতে বলেন: এ অধ্যায়ের শুরুতে প্রথম ৫টি শ্লোক এ পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ। এই শ্লোকগুলি মোশির কথা নয়। তিনি আরো বলেন যে, এ পুস্তকের (দ্বিতীয় বিবরণের) ৩৪ অধ্যায়টিও মোশির কথা নয়। মোশির বক্তব্য পূর্ববর্তী
(৩৩) অধ্যায়ের সমাপ্তির সাথে সাথে শেষ হয়েছে। এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, মোশি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা লাভ করে এই অধ্যায়টিও লিখেছেন। কারণ এ সম্ভাবনা সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা থেকে অনেক দূরে।

46 আদম
ক্লার্ক দাবি করেছেন যে, এ অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল। পক্ষান্তরে অনেক ব্যাখ্যাকার দাবি করেছেন যে, মোশির মৃত্যুর অনেক পরে ‘৭০ গোত্রপতি’

47

46 এই অধ্যায়ে মোশির মৃত্যু, মৃত্যুর পরে ত্রিশ দিন যাবৎ ইহূদীদের শোকপালন, যুগের আবর্তনের মোশির কবর হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।
47 মোশি ৭০ গোত্রপতির একটি ‘কাউন্সিল’ গঠন করেন বিচারকর্তৃগণকে সাহায্য করার জন্য। পরবর্তী কালে সকল যুগে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এইরূপ ‘কাউন্সিল’ ছিল।
138

এই ৩৪ অধ্যায়টি রচনা করেন। তখন এ অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল।

48

কিন্তু তা স্থানান্তরিত হয়ে এ স্থানে চলে এসেছে।

49

এভাবে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, মূসার তাওরাতের এ সকল কথা মূসার কথা নয়। এরপর দাবি করলেন যে, ৭০ গোত্রপতি তা রচনা করেছেন। তাদের এ দাবি একেবারেই প্রমাণবিহীন আন্দায দাবি। এর বড় প্রমাণ

48 আদম ক্লার্ক, জনৈক ইহূদী পন্ডিত ও অন্যান্যদের এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ৫-৬ শ্লোক প্রমাণ করে যে, এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের অনেক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছে। এই শ্লোকদ্বয়ে বলা হয়েছে: ‘‘তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। (but no man knoweth of his sepulchre unto this day.)’’ মোশির মৃত্যুর মাত্র ১৫/১৬ বৎসর পরে যিহোশূয় মৃত্যুবরণ করেন। গণনা পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭ লক্ষাধিক ইস্রায়েল সন্তান মোশির সাথে মিশর থেকে আগমন করেন। একথা কি কল্পনা করা সম্ভব যে, ১৫/১৬ বৎসরের মধ্যে এই ৭ লক্ষ ইস্রায়েল সন্তান তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা, ভাববাদী ও মুক্তিদাতার কবরের স্থানটি ভুলে গেলেন? এমনকি মোশির নিকটতম পরিচারক যিহোশূয়ও কবরটির স্থান পর্যন্ত ভুলে গেলেন?! শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি তাঁর পুস্তকে নির্বিকার চিত্তে কথাটি লিপিবদ্ধ করলেন!!!
49 কত সহজ বিষয়! একটি ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ইচ্ছামত এক পুস্তক থেকে অন্য পুস্তকে ঢুকে পড়ে!! 139

হলো, এ বিষয়ে তাদের নানামুনির নানা মত। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন, মোশির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই শেষ হয়েছে। এ অধ্যায়টি পরবর্তীকালে সংযোজিত। সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয় অথবা শমূয়েল অথবা ইয্রা অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোনো ভাববাদী (নবী)।

50 এ বিষয়ে
নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না। শেষ শ্লোকগুলি সম্ভবত ইস্রায়েল-সন্তানদের ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সংযোজন করা হয়েছে।’’
পাঠক এখানে এ সকল পণ্ডিতের কথাগুলি একটু চিন্তা করুন! তাঁরা বললেন: ‘‘সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয়, অথবা... অথবা... অথবা... অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোনো ভাববদী। সবই ভিত্তিহীন প্রমাণবিহীন কাল্পনিক দাবি মাত্র।

51

50

... অথবা কোনো লিপিকার, অথবা কোনো ধর্মত্যাগী মুর্তিপূজক রাজা, অথবা কোনো শয়তান....। এ কথাগুলি থেকে মনে পড়ে মোল্লা দোপেয়াজীর ও বাদশাহ আকবরের মধ্যকার সংলাপ। বাদশাহ বললেন, এদেশে মোট কাকের সংখ্যা কত? মোল্লা দোপেয়াজী একটি কাল্পনিক সংখ্যা বললেন: এত লক্ষ... এত হাজার এত... । আপনার সন্দেহ হলে গুণে দেখুন। যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে বাইরের কোনো কাক এদেশে বেড়াতে এসেছে। আর যদি কম হয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশের কোনো কাক বাইরে বেড়াতে গিয়েছে। এ সকল পন্ডিতদের ভিত্তিহীন কাল্পনিক সম্ভাবনাগুলির সাথে মোল্লা দোপেয়াজীর কথার কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?
51 সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা যদি কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের কোনোরূপ ওজর বা ব্যাখ্যা 140

এখানে দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করছি, যেন পাঠক অবস্থা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন: ‘‘(১) পরে মোশি মোয়াবের তলভূমি হইতে নবো পর্বতে.. উঠিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলিয়দ... দেখাইলেন
(৪) আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কাহিলেন.... (৫) তখন সদাপ্রভুর দাস মোসি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে

পেশ করতে না পারেন, তবে তাকে বিকৃতি বলে স্বীকার করে ভুলটি ‘অনুলিপিকারের’ ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আর যেখানে এরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো ভুল ধরা পড়ে না সেখানে তাঁরা এই সংযোজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট ভাববাদী বা কোনো একজন ‘ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত’ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এর উল্টো কেন হলো না তা আমরা বুঝি না। কেউ যদি দাবি করেন যে, সবগুলিই লিপিকারদের বা সবগুলিই ভাববাদিগণের কর্ম, তবে তা ভুল প্রমাণ করা হবে কিভাবে? আর ভাববাদিগণের বা ‘ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের’ নির্ভুলতারই বা প্রমাণ কোথায়? যে ইয্রার নাম তাঁরা বারংবার বলেন তিনি আরো দুইজন ভাববাদীর সহযোগিতায় যে ‘বংশাবলি’ পুস্তক রচনা করেছেন তার মধ্যেও অনেক ভুল রয়েছে বলে আমরা দেখেছি। এছাড়া তোরাহ বা পবিত্র পুস্তকগুলি কি ভাববাদিগণ বা যাজকগণ ছাড়া কেউ লিখতেন বা অনুলিপি করতেন? আর কোনো অনুলিপিকার যদি ভুল করেই ফেলে তাহলে পরবর্তী ভাববাদিগণ ও যাজকগণ তা সংশোধন করলেন না কেন? ভাববাদিগণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপুস্তকের মধ্যে এভাবে বিভিন্ন কথা সংযোজন করতে পারলেন, কিন্তু পবিত্র পুস্তকের মধ্যে অনুলিপিকারদের এত সব বিকৃতি সংশোধন করতে পারলেন না?
141

মরিলেন। (৬) আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যাকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। (৭) মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল....। (৮) পরে ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল।... (১০) মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।’’
মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবর্তীর্ণ কিতাবে কি মূসার মৃত্যু, শেষকৃত্য, কবর, অনুসারীদের কান্নাকাটি, তার কবর নিশ্চিহ্ন হওয়া, তাঁর পরে তাঁর মত আর কোনো নবীর আবির্ভাব না হওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত থাকবে?
আমরা মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, মূসার তাওরাত বলে কাথিত ৫ পুস্তকের সর্বশেষ অধ্যায়, দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়টি মূসা আলাইহিস সালাম-এর রচিত নয়। শুধু তাই নয়, আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর নামে প্রচলিত এ পাঁচটি পুস্তক কখনোই তাঁর লেখা নয়। এগুলিকে তার লেখা বা তার প্রদত্ত তাওরাত বলে দাবি করা বৈধ নয়। এগুলির মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বিকৃতি, সংযোজন, ভুলভ্রান্তি আমাদের এ বিশ্বাসের অকাট্য প্রমাণ। কোনো নবীর উপরে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কোনো আসমানী গ্রন্থে এরূপ কোনো

142

ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে না। এরূপ ভুলভ্রান্তিময় একটি গ্রন্থকে কোনো নবীর নামে চালানোর অর্থ উক্ত নবীকে অপবাদ দেওয়া। অনেক ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতও অবিকল মুসলিমদের মতই এ সকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে দাবি করেছেন যে, এ সকল পুস্তকের কোনোটিই মোশির লেখা বা মোশির দেওয়া তাওরাত নয়।
৯- ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইঞ্জিলের বিকৃতি:
যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(৭) কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। (For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.)

52

’’

খৃস্টান পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, উপরের শ্লোকদ্বয়ের এতসব কথার মধ্যে মূল

52 বাংলা বাইবেলে ও ইঞ্জিল শরীফে এই বাক্যগুলি নেই। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলের অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে।
143

বাক্যগুলি ছিল নিম্নরূপ: ‘‘বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।’’

53

এরপর ত্রিত্বে বিশ্বাসিগণ মূল পাঠের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন করেন: ‘‘স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন...।’’ ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ প্রমাণের জন্য একথাগুলিই মূল দলিল। আর এগুলি যে জাল ও অতিরিক্ত সংযোজন সে বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। ত্রিত্ববাদী গোঁড়া খৃস্টান পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন যে, এ বাক্যগুলি অতিরিক্ত সংযোজন এবং এগুলিকে মুছে দেওয়া আবশ্যক। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ হর্নের এই কথাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। আদম ক্লার্কও এই বাক্যগুলিকে সংযোজিত বলে গণ্য করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। ক্রীসবাখ ও শোলয্, হর্ন, আদম ক্লাক, হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ ও আরো অনেকেই এ বাক্যগুলিকে জাল বলে এগুলি বাইবেল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি করেছেন। চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীর ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সেন্ট অগাস্টাইন (St. Augustine)। এখন পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ তাঁর মতের উপরেই

53 বাংলা বাইবেলে এতটুকই উল্লেখ করা হয়েছে।
144

নির্ভর করেন। তিনি যোহনের এ পত্রটির আলোচনায় দশটি পত্র লিখেছেন। এ দশটি পত্রের একটি পত্রেও তিনি এ বাক্যগুলির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ছিলেন ত্রিত্বে বিশ্বাসী। আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়াসের (Arius) অনুসারিগণ যাঁরা ত্রিত্বে বিশ্বাস করতেন না বা একেশ্বরবাদী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অগাস্টাইন বিতর্ক করতেন। তাঁর সময়ে যদি উপরের এই শ্লোকদ্বয় এভাবে যোহনের পত্রের মধ্যে থাকত তবে নিশ্চয় ত্রিত্ববাদ (trinity) প্রমাণ করার জন্য তিনি সেগুলির উদ্ধৃতি দিতেন ও সেগুলিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন।
শুধু তাই নয়, অগাস্টাইন ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য উপরে উল্লিখিত ৮ম শ্লোকটি: ‘‘বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই’’ এই কথাটির অদ্ভুত একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: এখানে জল দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে, রক্ত দ্বারা পুত্রকে বুঝানো হয়েছে এবং আত্মা দ্বারা পবিত্র-আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল ও অবাস্তব ব্যাখ্যা। একথা স্পষ্ট যে, উপরে উল্লিখিত ৭ম শ্লোকটি যদি যোহনের পত্রে সত্যিই থাকত তাহলে তিনি এইরূপ অবাস্তব ও দুর্বল ব্যাখ্যার স্মরণাপন্ন হতেন না। আমার মনে হয়, যখন ত্রিত্ববাদীরা দেখলেন যে, এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত দুর্বল-

(১) ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোনো গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।
(২) প্রথম যুগে পরিপূর্ণ যত্ন ও গবেষণা সহকারে যে সকল বাইবেল মুদ্রণ করা হয়েছে সেগুলিতেও এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।
(৩) একমাত্র ল্যাটিন অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন অনুবাদে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।
(৪) অধিকাংশ প্রাচীন ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতেও এই কথাগুলি নেই।
(৫) কোনো প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিত বা চার্চের ঐতিহাসিক এই কথাগুলিকে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেন নি।
(৭) প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের নেতাগণ ও ধর্মের সংস্কারকগণ এই কথাগুলিকে ফেলে দিয়েছেন অথবা তার উপরে সন্দেহের চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন।
এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানগণ যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই তাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করে বিকৃতি সাধন করতেন। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে বাইবেলের মধ্যে বিকৃতির দরজা ছিল উন্মুক্ত। লিপিকারগণ ও বিভিন্ন দল-উপদলের খৃস্টানগণ অতি সহজেই সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারতেন। মজার কথা হলো মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পরেও এ বিকৃতির ধারা থামে নি।

নিন্দার ভয়ে পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে এ বাক্যগুলি ফেলে দেন।
ত্রিত্ববাদীরের জন্য এই বাক্যগুলি বাদ দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। এজন্য ওটিনবুর্গের বাসিন্দারা ১৫৯৬ ও ১৫৯৯ সালে মুদ্রিত লুথারের এই অনুবাদের মধ্যে এই বাক্যগুলি ঢুকিয়ে দেন। অনুরূপভাবে হামবুর্গবাসিগণ ১৫৯৬ সালে একই কাজ করেন। এরপর ওটিনবুর্গবাসিগণ ফ্রাঙ্কফুর্টবাসিগণের মত মানুষের নিন্দার ভয় পান। ফলে পরবর্তী মুদ্রণের সময় বাক্যগুলি ফেলে দেন। লূথারের অনুসারী ত্রিত্ববাদী প্রটেস্টান্ট খৃস্টানগণের জন্য এই বাক্যটিকে বাদ দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন লূথারের নিজের অন্তিম নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদের মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়। এ যদি হয় আধুনিক যুগের অবস্থা, তাহলে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে, যখন বাইবেলের কপি ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম

54

, তখন তাঁরা কি করেছেন তা সহজেই অনুমেয়।
প্রসিদ্ধ দার্শনিক আইজ্যাক নিউটন ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যোহনের পত্রের উপরের বাক্যগুলি বিকৃত ও সংযোজিত।

54 বাইবেলের পঠন ও পাঠন সাধারণ খৃস্টানদের জন্য মূলত নিষিদ্ধ ছিল। এর পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও ছিল খুবই কম।
149

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক অনেক সংস্করণে উপর্যুক্ত জাল বাক্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলা বাইবেলগুলিতেও এ বাক্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। বা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
১০- যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানানোর জন্য বিকৃতি:
প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৮ম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘ফিলিপ কহিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যীশু খৃস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি (I believe that Jesus Christ is the Son of God)।’’

55

এ বাক্যগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। কোনো একজন ত্রিত্ববাদী ‘যীশু খৃস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি’ এ কথার দ্বারা খৃস্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার জন্য এই বাক্যটি বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছেন। ক্রীসবাখ ও শোলয একমত যে, বাক্যটি পরবর্তী সংযোজন। লক্ষণীয় যে, ইংরেজি রিভাইয্ড স্টান্ডার্ড ভার্সন (Revised Standard Version: RVS)-এ এ শ্লোকটি মূল

55 ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে এই শ্লোকটি মূল পাঠের মধ্যে রয়েছে। বাংলা ‘ইঞ্জিল শরীফে’ এ কথাগুলি একেবারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর বাংলা বাইবেলে কথাগুলি পাদটীকায় লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে: ‘‘কোনো কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়।’’
150

পাঠ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং টীকায় মন্তব্য করা হয়েছে। উইলিয়াম কেরি অনূদিত বাংলা বাইবেলেও এভাবে ৩৭ শ্লোকটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং টীকায় বলা হয়েছে: ‘‘কোনো কোনো প্রাচীন অনুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়’’ ... এ কথা বলে উপরের জাল শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে।
১১-যাকোবের পুত্র রুবেনের ব্যভিচারের কাহিনীতে বিকৃতি:
আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকটি হিব্রু সংস্করণে নিম্নরূপ: ‘‘সেই দেশে ইস্রায়েলের (যাকোবের) অবস্থিতি কালে রূবেন (যাকোবের প্রথম পুত্র) গিয়া আপন পিতার বিল্হা নাম্মী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল (যাকোব) তাহা শুনিতে পাইলেন।’’
এখানে কিছু কথা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধান করা হয়েছে। হেনরি ও স্কটের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: ইয়াহূদীগণ স্বীকার করেন যে, এ শ্লোক থেকে কিছু কথা বাদ পড়ে গিয়েছে। গ্রীক অনুবাদে এ অপূর্ণতা নিম্নরূপে পুরণ করা হয়েছে: ‘‘এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তা অন্যায় হইল।’’
তাহলে ইয়াহূদীরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, কিছু কথা বাদ পড়েছে। হিব্রু তোরাহ থেকে একটি পুর্ণ বাক্য বাদ পড়ে যাওয়া বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাহলে দুই একটি শব্দের বিষয়ে আর কি কথা থাকতে পারে।

151

আর যেহেতু ‘‘ঈশ্বরের গ্রন্থের মধ্যে’’ এরূপ রদবদল তাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক কাজেই কেন তারা এখানে এরূপ বিয়োজন করলেন তা প্রশ্ন করে আর কী লাভ?
১২- ইউসূফ-ভাতৃগণের চুরির ঘটনা বর্ণনায় বিয়োজন:
ইউসূফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়ের ছালার মধ্যে তাঁর বাটি রাখা ও পরে তা বের করা ঘটনার বর্ণনায় আদিপুস্তকের ৪৪ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্বারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এ কর্ম করায় তোমরা দোষ করিয়াছ।’’ এখানে কিছু কথা বিয়োজন করা হয়েছে বা বাদ পড়ে গিয়েছে। বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি বলেন: ‘‘এ শ্লোকের শুরুতে নিম্নের বাক্যটি সংযোজিত করতে হবে: ‘‘তোমরা কেন আমার বাটি চুরি করিলে?’’ গ্রীক অনুবাদ থেকে এই বাক্যটি নিয়ে হিব্রু পাঠে যোগ করতে হবে।’’ ১৩- মূসা আলাইহিস সালাম-এর মাতা ও ভগ্নির নাম-পরিচয় বিকৃতি: যাত্রাপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে রয়েছে: ‘‘অম্রম (Amram) আপন পিসি যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন।’’ নিঃসন্দেহে এখানে বিয়োজন-জনিত বিকৃতি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের নিয়ম সকল সন্তানের নাম উল্লেখ করা। এ শ্লোক থেকে বুঝা যায় যে, অম্রমের মাত্র দুটি পুত্রসন্তানই ছিল; অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের

152

একজন কন্যাসন্তানও ছিল। শমরীয় সংস্করণ থেকে এ বিকৃতি বুঝা যায়। শমরীয় সংস্করণে এবং গ্রীক অনুবাদে রয়েছে: ‘‘আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে, মোশিকে ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিলেন।’’
তাহলে ‘‘ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে’’ কথাগুলি হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। আদম ক্লার্ক শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উপর্যুক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করার পরে বলেন: ‘‘কোনো কোনো শীর্ষস্থানীয় গবেষক পণ্ডিত মনে করেন যে, হিব্রু পাঠেও এই কথাগুলি ছিল।’’
এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইয়াহূদীগণ একান্তই ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাদের তাওরাত থেকে কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়েছেন। শমরীয়দের তাওরাতের বিকৃতি প্রমাণ করতে অথবা খৃস্টানদের গ্রীক অনুবাদের বিকৃতি প্রমাণ করতে তারা এরূপ করেছেন।
এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। এ শ্লোক থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, মূসা আলাইহিস সালামের পিতা আপন ফুফুকে বিবাহ করেছিলেন। মূসার পিতা অম্রম (ইমরান)। অম্রমের পিতা কহাৎ। কহাতের পিতা লেবী। আর মূসার পিতা অম্রম বিবাহ করেন তার পিতা কহাতের ভগ্নি যোকাবেদ বিনত লেবীকে। উপরের শ্লোকে তা সুস্পষ্টত বলা হয়েছে।

56 এ শ্লোকের ইংরেজি,

56 এছাড়া গণনাপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম। অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকাবেদ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে 153

আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা বিভিন্ন ভাষার অনুবাদেও স্পষ্টত তা উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর শরীয়ত বা ব্যবস্থা মতে ফুফুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। লেবীয় পুস্তকের ১৮/১২ ও ২০/১৯ শ্লোকে তা বলা হয়েছে। এজন্য খৃস্টানগণ এ পরিচয় গোপন করতে বিকৃতির আশ্রয় নেন। ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম উর্বান (Urban)

57

-এর সময়ে অত্যন্ত
যত্ন সহকারে বাইবেলের যে আরবী সংস্করণটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হয় এবং ১৬২৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় সে সংস্করণে এ শ্লোকটি নিম্নরূপ লেখা হয়েছে: ‘‘অম্রম আপন পিসির কন্যা যোকেবদকে বিবাহ করিলেন।’’
এখানে ‘‘পিসি’’ বা ‘‘ফুফু’’ শব্দটিকে বিকৃত করে ‘‘পিসির কন্যা’’ (ফুফাতো বোন) বানানো হয়েছে। পরবর্তী বিভিন্ন আরবী সংস্করণে এরূপ পিসির বদলে পিসির কন্যা লেখা হয়েছে।

লেবির ঔরসে তাহার জন্ম।’’ এখানেও অতি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যোকেবদ লেবীর ঔরসজাত কন্যা। আর কহাৎ লেবির পুত্র। কাজেই তিনি অম্রামের আপন ফুফু।
57 ১৫৬৮ সালে ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ সালে পোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৬৪৩/১৬৪৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সময়ে ইউরোপব্যাপী ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের রাজাগণ প্রটেস্টান্টদের সাহায্যে বড় বড় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দেখুন, মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ১৭২-১৭৫।
154

এভাবে তারা নিজেদের মনমর্জি মত কিছু রদবদল বা পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো কোনো সংস্করণ বিকৃত করেছেন।
১৪- গীতসংহিতায় বিয়োজন বা সংযোজন করে বিকৃতি:
গীতসংহিতার ১৪ গীতের ৩য় শ্লোকের পরে- ৩ ও ৪ শ্লোকের মাঝখানে- ল্যাটিন, ইথিওপিয়, আরবী অনুবাদে এবং গ্রীক অনুবাদের ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নের বাক্যগুলি রয়েছে: ‘‘তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ; তাহারা জিহবাতে ছলনা করিতেছে; তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নে কালসর্পেব বিষ থাকে; তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ; তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত। তাহাদের পথে পথে ধ্বংস ও বিনাশ; এবং শান্তির পথ তাহারা জানে নাই; ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।’’
এ বাক্যগুলি হিব্রু বাইবেলে নেই। কিন্তু এ কথাগুলি রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৩/১৩-১৮ শ্লোকে রয়েছে। পৌল পুরাতন নিয়মের বক্তব্য হিসেবে এ কথাগুলিকে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে দুটি বিষয়ের একটি অবশ্যই ঘটেছে। হয়তবা ইয়াহূদীরা মূল হিব্রু বাইবেল থেকে এ শ্লোকগুলি ফেলে দিয়েছেন। নতুবা খৃস্টানগণ তাঁদের মহাপুরুষ পৌলের বক্তব্যকে প্রমাণিত করার জন্য তাঁদের অনুবাদের মধ্যে এই কথাগুলি সংযোজন করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে বিয়োজনের

155

মাধ্যমে বিকৃতি প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে সংযোজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। সর্বাবস্থায় এখানে দু প্রকারের জালিয়াতির এক প্রকার মানতেই হবে।
১৫- লূকলিখিত সুসমাচারে বিয়োজন-জনিত বিকৃতি
যীশু খৃস্ট তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আগমন সম্পর্কে ও সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে কিছু উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। লূকের বর্ণনায় কিছু কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। লূকলিখিত সুসমাচারের ২১/৩২-৩৪ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না।
(৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয় পড়ে।’’ হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: ‘‘লূকলিখিত সুসমচারের ২১ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকের মাঝখানে একটি পূর্ণ শ্লোক পড়ে গিয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক অথবা মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোক থেকে কথাটি নিয়ে লূকের

156

সুসমাচরের উপর্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ের মাঝে সংযোজন করতে হবে।’’
এরপর টীকায় বলেন: ‘‘এখানে যে বড় রকমের বিয়োজন ও বিকৃতি ঘটেছে সে বিষয়টি সকল গবেষক ও ব্যাখ্যাকার এড়িয়ে গিয়েছেন। সর্বপ্রথম হেলস-ই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।’’
এ ঘটনা বর্ণনায় মথির বিবরণ (মথি ২৪/৩৪-
৩৬) নিম্নরূপ: ‘‘(৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইব না। (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।’’
একই ঘটনা বর্ণনায় মার্ক বলেন (মার্ক ১৩/৩০-৩২): ‘‘(৩০) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত এ সমস্ত সিদ্ধ না হইবে, সে পর্যন্ত এ কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩১) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।
(৩২) কিন্তু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।’’
তাহলে হর্ন-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী লূকের সুসমাচার থেকে একটি পূর্ণ শ্লোক বাদ পড়ে গিয়েছে, যে শ্লোকটি পুনঃসংযোজন

157

অত্যাবশ্যক। আর সে শ্লোকটি হলো: ‘‘কিন্তু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।’’

58

১৬- ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিদ্বেষপ্রসূত বিকৃতি:
মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।’’
‘‘যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন’’- এই কথাগুলি মথির সুসমাচারের অন্যতম ভুল। কারণ ভাববাদিগণের নামে প্রচলিত ও পরিচিত পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই এ কথাটি নেই। এখানে দুটি বিষয়ের

58 বাহ্যত ইচ্ছাকৃতভাবেই এ শ্লোকটি লূকের সুসমাচার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এ শ্লোকটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, যীশুখৃস্ট ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ ছিলেন না। আর এজন্যই একইরূপ জালিয়াতি করা হয়েছে মথির বর্ণনার ক্ষেত্রে। ‘‘পুত্রও জানেন না’’ কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়েছে; যেন যীশুর ঈশ্বরত্ব দাবি করার কোনো বাধা না থাকে। কিং জেমস ভার্সন বা অথরাইজড ভার্সন (KJV/AV)-এ এ শ্লোকটি নিম্নরূপ: (But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only)। এখানে ‘‘পুত্রও না (neither the Son)’’ কথাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে কথাটি সংযোজন করা হয়েচে।
158

একটি স্বীকার করতেই হবে। হয় খৃস্টানগণ ইয়াহূদীদের প্রতি বিরোধিতা ও বিদ্বেষের কারণে এ বাক্যগুলি তাদের সুসমাচারের মধ্যে সংযোজন করেছেন ইয়াহূদীদের বিকৃতি প্রমাণ করতে। তাহলে তা সংযোজনজনিত বিকৃতি বলে গণ্য হবে। অথবা ইয়াহূদীগণ তাদের ভাববাদিগণের পুস্তক থেকে এ কথাগুলি মুছে দিয়েছেন খৃস্টানদেরকে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে। এক্ষেত্রে তা বিয়োজন জনিত বিকৃতি বলে গণ্য হবে।
এখানে প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ‘‘ক্রীযস্টম (John Chrysostom: 347–407) ও অন্যান্য খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে, মথির উদ্ধৃত এ কথাটি যে সকল পুস্তকে বিদ্যমান ছিল সে সকল পুস্তক সব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাববাদিগণের অনেক পুস্তক হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ, ইয়াহূদীগণ তাঁদের অবহেলার কারণে- বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে- অনেক পুস্তক হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছে। তাঁরা যখন দেখলেন যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ এ সকল পুস্তকের কথা দিয়ে খৃস্টধর্মের বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করছেন, তখন তাঁরা যীশুর পক্ষের প্রমাণ বিনষ্ট করতে এ কাজ করেন। এ থেকে জানা যায় যে, মথি যে সকল পুস্তক থেকে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন ইয়াহূদীরা সে পুস্তকগুলি বিনষ্ট করে ফেলেছে।

‘‘এজন্য ট্রিফোনের (Tryphon) সাথে বিতর্কের সময় জাস্টিন (Justin)

59 বলেন:
‘ইয়াহূদীরা পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক পুস্তক বাদ দিয়েছে, যেন প্রকাশ পায় যে, নতুন নিয়মের কথাবার্তা পুরাতন নিয়মের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’
খৃস্টান গবেষকগণের এ সকল বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এরূপ বিকৃতি সেযুগে খুবই সহজ ছিল। শুধু ধর্মীয় শত্রুতা ও মতপার্থক্যের কারণে কিভাবে ইয়াহূদীরা এ সকল ধর্মগ্রন্থ ছিড়ে, পুড়িয়ে বা নষ্ট করে ফেলল এবং পুস্তকগুলিকে বিনষ্ট করার ফলে কিভাবে সেগুলি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল! বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁদের প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা অন্য একটি ধর্মের বিরোধিতার জন্য ঈশ্বরের বাণী ও ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ কিছু পুস্তক একেবারে গুম করে দিলেন! এত বড় বিকৃতি কি আর হতে পারে?
ইয়াহূদীরা যদি খৃস্টধর্মের অসারতা প্রমাণের জন্য নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃতি করতে বা গুম করে দিতে পারে এবং খৃস্টানরা যদি ইয়াহূদীদের বিরোধিতার জন্য নিজেদের

59 দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও দার্শনিক। ইহূদী ট্রিফোন খৃস্টান ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। জাস্টিন তাকে পত্র লিখেন। দেখুন: Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, p 135, 150-155.

দাবি করেন নি। সাধারণ মুসলিম, বিশেষত খৃস্টান পণ্ডিতদের বইপুস্তক যারা পাঠ করেন নি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা এ সব কথা বলেন। প্রকৃত সত্য কথা হলো, অ-খৃস্টান পণ্ডিতগণ, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানগণ এবং ধার্মিক খৃস্টানগণ সকলেই প্রাচীন যুগ থেকে বাইবেলের বিকৃতির কথা বলে আসছেন। নিম্নে আমরা তাদের কিছু মতামত উল্লেখ করছি:
১. ৩. ৪. ২. বিকৃতি বিষয়ে অমুসলিমগণের সাক্ষ্য
প্রথমত: অ-খৃস্টানগণের মতামত
(১) ২য় শতাব্দীর রোমান পণ্ডিত সেলসাসের মত
দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস (Celsus Epicurean)। তিনি খৃস্টধর্মের প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান খৃস্টান-পণ্ডিত একহর্ন এ পৌত্তলিক পণ্ডিতের পুস্তক থেকে তাঁর নিম্নের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন: ‘‘খৃস্টানগণ তাদের সুসমাচারগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।’’
সম্মানিত পাঠক, তাহলে লক্ষ্য করুন, এই পৌত্তলিক পণ্ডিত জানাচ্ছেন যে, তাঁর যুগেই খৃস্টানগণ চার বারেরও বেশি বিকৃত করেছেন তাঁদের সুসমাচারগুলিকে।

162

(২) আধুনিক পণ্ডিত পার্কারের মত:
ঊনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ আমেরিকান সংস্কারক ও পাদরী থিয়োডোর পার্কার (Theodore Parker: ১৮৬০)। চার্চ নিয়ন্ত্রিত খৃস্টানদের দৃষ্টিতে তিনি ধর্মদ্রোহী (Heretic)। তিনি বলেন: ‘‘বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ভুল ও বিকৃতি- যাকে খৃস্টান পণ্ডিতগণ ভুল, পাঠের বিভিন্নতা (erratum, Various readings/Variety of reading) ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন- এরূপ ভুলের সংখ্যা মিলের হিসাব অনুযায়ী ত্রিশ হাজার।
(৩) প্রায় একশত জাল ইঞ্জিল
একজন চার্চবিরোধী খৃস্টান পণ্ডিত বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক ও পত্রাবলি ছাড়াও প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুখৃস্ট, তাঁর মাতা মেরি বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ বা তাদের অনুসারিগণের নামে প্রচারিত পুস্তক ও পত্রের নাম উল্লেখ করে তালিকা তৈরি করেন। তাতে তিনি এরূপ ৭৪টি জাল ইঞ্জিল বা পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।
এরপর তিনি বলেন, এভাবে আমরা ‘সুসমাচার’, ‘প্রকাশিত বাক্য’ ও পত্রাবলির এক সুবিশাল ভান্ডার দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ খৃস্টান মনে করেন যে, এ সকল পুস্তকের অধিকাংশই সত্যিকারেই উল্লিখিত লেখকদের রচনা। তাহলে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায় যে পুস্তক বা পত্রগুলিকে মেনে

নিয়েছেন সেগুলিই যে সত্যিকারের ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ পুস্তক তা আমরা কিভাবে জানব? এছাড়া আমার জানি যে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এ সকল ‘স্বীকৃত’ পুস্তকও বিকৃতি, পরিবর্তন ও সংযোজনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এতে সমস্যা আরো ঘনীভুত হয়। দ্বিতীয়ত: অ-গোঁড়া (heretic) খৃস্টানগণের মতামত
(১). প্রথম শতাব্দী থেকে এবোনাইট খৃস্টানগণের মত
প্রথম যুগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্প্রদায় এবোনাইট সম্প্রদায় (Ebionites)। তাঁর পৌলের সমসাময়িক ছিলেন এবং পৌলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে, পৌল ধর্মত্যাগী।

60 এই সম্প্রদায়ের
খৃস্টানগণ মথির সুসমাচারটি বিশ্বাস

60 এবোনাইট খৃস্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। তাঁরা যীশুকে অন্য দশজন মানুষের মতই একজন মানুষ ও ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে যীশুর নির্দেশ অনুসারে খৃস্টানদের জন্যও ‘মোশির ব্যবস্থা’ বা মূসার শরীয়ত পালন করা আবশ্যকীয়। পৌলই সর্বপ্রথম মোশির ব্যবস্থা রহিত করে দেন। তিনি দাবি করেন যে, শুধু বিশ্বাসেই মুক্তি; কাজেই ব্যবস্থা বা শরীয়ত পালন করা উচিত নয়। যে শরীয়ত বা ব্যবস্থা পালন করবে সে যীশুর প্রেম বা দয়া লাভ করতে পারবে না... ইত্যাদি। এজন্য এবোনাইট খৃস্টানগণ পৌলকে ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কর্মহীন ভক্তির মূল্য বেশী। এজন্য শেষ পর্যন্ত পৌলীয় ধর্মই প্রসার লাভ করে।

করতেন। কিন্তু তাঁদের নিকট সংরক্ষিত মথিলিখিত সুসমাচারটির সাথে বর্তমানে পৌলের অনুসারী খৃস্টানগণের নিকট প্রচলিত ‘মথিলিখিত সুসমাচারের’ অনেক স্থানেই মিল নেই। প্রচলিত ‘মথি’-র প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় তাঁদের ‘মথি’র মধ্যে ছিল না। এবোনাইটদের মতে এ দু অধ্যায় ও অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক কথা জাল ও বানোয়াট। তারা যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করত না; বরং তাঁকে মানুষ ও রাসূল বলে বিশ্বাস করত। (২). দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মারসিওনীয় খৃস্টানগণের মত
দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মবাদী (Gnostic) খৃস্টান সম্প্রদায় ‘মারসিওনীয় সম্প্রদায়

61

’। তাঁরা পুরাতন
নিয়মের কোনো পুস্তকই মানতেন না। তাঁরা বলতেন যে, এগুলি কোনোটিই ঐশ্বরিক প্রেরণা- লব্ধ পুস্তক নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা নতুন নিয়মের সকল পুস্তক অস্বীকার করতেন। কেবল লূকলিখিত সুসমাচার এবং পৌলের পত্রাবলি থেকে ১০টি পত্র তাঁরা ঐশ্বরিক বলে মানতেন। আর তাঁদের স্বীকৃত এ সুসমাচার ও পত্রাবলিও বর্তমানে প্রচলিত সুসমাচার ও পত্রাবলি থেকে ভিন্ন। লূকের সুসমাচারের প্রথম দুটি অধ্যায়কে তারা জাল বলে গণ্য করত। এছাড়াও এ সুসমাচারের আরো অনেক বিষয় তারা অস্বীকার করত। লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এরূপ

61 আধ্যাত্মবাদি গুরু মারসিওনের (Marcion) অনুসারী।

১৪টি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। বেল উল্লেখ করেছেন যে, এ খৃস্টান সম্প্রদায় দুটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত: একজন মঙ্গলের ঈশ্বর ও অন্যজন অমঙ্গলের ঈশ্বর। তারা বিশ্বাস করত যে, তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক অমঙ্গলের ঈশ্বরের প্রদত্ত; কারণ তা নতুন নিয়মের বিপরীত।
(৩) তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে মানিকীয সম্প্রদায়ের মত
তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক মানী (Manes/Mani) ও তাঁর অনুসারী মানিকীয সম্প্রদায় (Manichees/Manichaen/ Manichean) নিজেদেরকে খৃস্টের অনুসারী ও খৃস্টান বলে দাবি করতেন। এ সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ। তিনি ইঞ্জিলগুলির বিকৃতির বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত সেন্ট অগাস্টাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, ফাস্টিস বলেন: আপনাদের পিতা ও পিতামহগণ ষড়যন্ত্র করে নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে যে সকল বিষয় সংযোজন করেছেন আমি সেগুলির নিন্দা করি ও প্রত্যাখ্যান করি। এরূপ জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁরা নতুন নিয়মের সুন্দর অবস্থাকে দুষিত ও ত্রুটিময় করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করেছেন। আর এ কথা তো সুনিশ্চিত যে, খৃস্ট বা তাঁর

যে, শয়তান মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছিল এবং ইয়াহূদী নবীগণকে প্রবঞ্চনা করেছিল। তারা ইয়াহূদী নবীগণকে চোর ও দস্যু বলে আখ্যায়িত করত।

62

উপরের দুইটি অনুচ্ছেদ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, অ-খৃস্টানগণ এবং এবং খৃস্টানগণের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়, যাদেরকে গোঁড়া খৃস্টানগণ অ-ধার্মিক বা বিভ্রান্ত বলে মনে করেন তাঁরা সেই প্রথম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চরবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি ঘটেছে।
তৃতীয়ত: প্রসিদ্ধ গোঁড়া খৃস্টানগণের মতামত
তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বাইবেলের বিকৃতির বিষয়ে মূলধারার গোঁড়া খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বাইবেল ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। বস্তুত বাইবেলের বিকৃতির বিষয়ে প্রায় সকল খৃস্টান গবেষকই একমত। কিন্তু খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ এগুলি গোপন করার চেষ্টা করেন। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে:

62 যোহনলিখিতি সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে যীশু বলেন: ‘‘যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের রব শুনে নাই।’’ খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তাঁরা এভাবে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণকে ‘চোর ও দস্যু’ বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত বলে বিশ্বাস করত।

(ক) আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন: ‘‘প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রীতি হলো, অনেকেই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস রচনা করেন। প্রভু যীশুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল (অনেকেই তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন।) কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বর্ণনা ছিল অসত্য। অনেক বিষয় যা কখনোই ঘটেনি সেগুলি নিশ্চিত ঘটেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক ঘটনা ও অবস্থার বর্ণনায় তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন। এ কথা সুপ্রমাণিত ও সুনিশ্চিত যে, প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। সত্তরেরও বেশি এরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফ্যাবারিসিয়াস এসকল মিথ্যা সুসমাচার একত্রে সংকলন করে তিন খণ্ডে মুদ্রণ করেছেন।
(খ) পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক মোশির রচিত বলে বর্তমানে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও আরো ছয়টি পুস্তক তাঁর রচিত বলে প্রচারিত ও পরিচিত ছিল। পুস্তকগুলির নাম নিম্নরূপ:
1. মোশির নিকট প্রকাশিত বাক্য।
2. ক্ষুদ্র আদিপুস্তক (Genesis Apocryphon)।
3. উর্ধ্বারোহণ পুস্তক (The Assumption of Moses)।

4. রহস্য পুস্তক।
5. প্রতিজ্ঞা বা নিয়ম পুস্তক (Testament)।
6. স্বীকৃতি পুস্তক।
হর্ন বলেন: ‘‘ধারণা করা হয় যে, খৃস্টধর্মের শুরুর দিকে, অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এ সকল জাল পুস্তকগুলি রচনা করা হয়েছে।’’
(গ) ঐতিহাসিক মোশিম বলেন: প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হলো: ‘সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয় উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।’ খৃস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাঁদের থেকে প্রথমে মিসরের ইয়াহূদীরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এরপর এ ঘৃণিত মহামারী খৃস্টানগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। মহান ধর্মগুরুদের নামে জালিয়াতি করে প্রচারিত বিপুল সংখ্যক পুস্তক থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।’’
তাহলে আমরা জানতে পারছি যে, খৃস্টের পূর্বেই ইয়াহূদীদের নিকট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ধর্মীয়ভাবে প্রসংশনীয় কর্মে পরিণত হয়। এরপর দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীতে খৃস্টানদের নিকটেও এভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রশংসনীয় ধর্মীয় কাজে পরিণত হয়। অতএব জালিয়াতি, বিকৃতি ও

মিথ্যার কোনো সীমারেখা কোথাও ছিল না। তাঁরা যা করার সবই করেছেন।

63

(ঘ) লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: ‘‘(৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) রোমান সম্রাট আনাসতেসিয়াস (Anastasius I:491-518)-এর যুগে, অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের রচিত হওয়ার কারণে পবিত্র সুসমাচারগুলিকে অশুদ্ধ বলে সম্রাটের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন এগুলিকে পুনরায় সংশোধন করা হয়।’’ সুসমাচারগুলি যদি প্রকৃতই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ হতো এবং উক্ত সম্রাটের যুগে বিদ্যমান প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সুত্রে প্রমাণিত হতো যে

63 এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল (Paul) এ মতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। তিনি সগৌরবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের গৌরবার্থে ও সত্যের বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা বলেন এবং এরূপ মিথ্যা বলাতে কোনো পাপ হয় না। বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?’’ (রোমান ৩/৭)। এ নীতির ভিত্তিতেই ‘সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য’ বা ‘ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য’ পল নিজে মিথ্যাচারের মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে বিকৃত করেছেন। এ নীতির অনুসরণেই বাইবেল বিকৃত করাকে ভাল কাজ বলে গণ্য করতেন পূর্ববর্তী খৃস্টান পন্ডিতগণ।
171

শমরীয়দের নিকট সংরক্ষিত তাওরাত ভুল বলে প্রমাণিত হয়।
(চ) হার্সলি তাঁর বাইবেল-ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, ‘বাইবেলের পাঠ বিকৃত হয়েছে’ এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির বৈপরীত্য থেকেও এ কথা স্পষ্টত জানা যায়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যে সকল অত্যন্ত আপত্তিকর ও খারাপ কথা বিদ্যমান সেগুলি থেকে বিকৃতির এ বিষয়টি সুদৃঢ় বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নেবুকাদনেজারের ঘটনার পরে, বরং তার সামান্য কিছু আগে থেকেই মানুষদের নিকট হিব্রু বাইবেলের যে উদ্ধৃতি ও অংশগুলি ছিল তা ছিল বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে।
(ছ) ওয়াটসন বলেন, অনেক যুগ আগেই ওরিগন এ সকল বৈপরীত্যের বিষয়ে অভিযোগ- আপত্তি প্রকাশ করতেন। তাঁর মতে এ সকল বৈপরীত্যের বিভিন্ন কারণ ছিল। যেমন লেখকদের অবহেল ও অমনোযোগ, তাঁদের অসততা ও অসদেচ্ছা, তাদের বেপরোয়া ভাব ইত্যাদি। জিরোম (Jerome) বলেন, আমি যখন নতুন নিয়মের অনুবাদ করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি আমার নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি মিলিয়ে দেখলাম। এতে আমি ভয়ানক বৈপরীত্য দেখতে পেলাম। আদম ক্লার্ক বলেন, ‘‘জিরোমের (Jerome) যুগের (৫ম শতকের) পূর্ব থেকেই বাইবেলের অনেক ল্যাটিন অনুবাদ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন অনুবাদক এগুলি লিখেছিলেন। কোনো কোনো অনুবাদ ছিল
173

বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে। এগুলির একস্থানের বক্তব্য অন্য স্থানের বিপরীত ছিল। জিরোম এ সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন।’’ (জ) খৃস্টান সন্যাসী (monk) ফিলিপস কোয়াডনলস ‘খায়ালাত’ (খেয়ালগুলি) নামে একটি বই লিখেন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে বইটি (রোমে) মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকে তিনি বলেন: ‘‘পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির বিকৃতির সংখ্যা খুবই বেশি। ইয়াহূদীদের বিকৃতি প্রমাণ করার জন্যই আমরা খৃস্টানগণ এ সকল পুস্তকের সংরক্ষণ করেছি, আমরা তাঁদের জালিয়াতির স্বীকৃতি প্রদান করি না।’’
(ঝ) প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস (James)

64

-এর নিকট এ মর্মে দরখাস্ত পেশ করা
হয় যে, ‘‘আমাদের প্রার্থনা গ্রন্থের মধ্যে যাবূরের যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা রয়েছে সেগুলির সাথে হিব্রু যাবুরের অনেক পার্থক্য। সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের

64 ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যন্ট রাজা। তাঁর মাতা মেরি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাণী। তাঁর মাতা সিংহাসন ত্যাগ করলে তিনি স্কটল্যান্ডের রাজা হন। এরপর তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হন। তাঁর মাতা ক্যাথলিক ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর মাতাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। তাঁরই সময়ে প্রটেস্টান্ট ধর্মমতের ভিত্তিতে বাইবেলের ‘সংশোধিত’ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা Authorised Version ((AV) বা King James Version (KJV) নামে পরিচিত। জেমস ১৬০৩ থেকে ১৬২৫ সালে মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন।
174

মাধ্যমে কমবেশি ২০০ স্থানে এই পার্থক্য করা হয়েছে।’’
(ঞ) ইংরেজ ঐতিহাসিক মি. টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলেন: ‘‘ইংরেজি অনুবাদকগণ বাইবেলের মূল বক্তব্য নষ্ট করেছেন, সত্য গোপন করেছেন, অজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির সহজ সরল অর্থকে বক্র করেছেন। তাঁদের কাছে আলোর চেয়ে অন্ধকার এবং সত্যের চেয়ে মিথ্যাই বেশি প্রিয়।’’
(ট) নতুন অনুবাদ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মি. প্রোটন বলেন: ইংল্যন্ডে বর্তমানে প্রচলিত অনুবাদটি ভুলভ্রান্তিতে ভরা। তিনি পাদরীদেরকে বলেন: ‘‘আপনাদের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদটিতে পুরাতন নিয়মের বক্তব্য ৮৪৮ স্থানে বিকৃত করা হয়েছে। এ বিকৃতিগুলিই ছিল অনেক মানুষের বাইবেল অস্বীকারের কারণ।
বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য, ভুল, ও বিকৃতির আলোচনায় আমরা আরো অনেক প্রসিদ্ধ গোঁড়া খৃস্টান পণ্ডিতের এ বিষয়ক আরো অনেক মতামত দেখেছি। বস্তুত বাইবেলের বিকৃতির বিষয়টি সকল গবেষকই স্বীকার করেন। অনেকে গোঁড়ামি করে সাধারণ মূলনীতি হিসেবে বিকৃতির কথা অস্বীকার করলেও বাস্তবে যখন বাইবেলের এ সকল বৈপরীত্য ও ভুল তথ্যের সম্মুখিন হন তখন বিকৃতির বিষয়টি মেনে নেন।

175

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুসলমানগণ ছাড়াও খৃস্টান ও অখৃস্টান সকলেই বাইবেলের বিকৃতির কথা বলেছেন। এখন আমরা খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিকৃতির যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন তা পর্যালোচনা করব।
১. ৩. ৪. ৩. বাইবেলে বিকৃতির কারণাদি
হর্ন তাঁর বাইবেল ব্যাখ্যাগ্রন্থে Various readings বা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পাঠের বিভিন্নতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন:
প্রথম কারণ: ‘‘লিপিকারের

65 অসতর্কতা ও
ভুল’’
বিভিন্ন ভাবে তা ঘটতে পারে।
প্রথমত, লিপিকারকে যিনি বলেছিলেন তিনি এভাবেই বলেছিলেন, অথবা লিপিকার তাঁর কথা ঠিকমত বুঝতে পারেন নি, ফলে ভুল লিখেছেন। দ্বিতীয়ত, হিব্রু ও গ্রীক বর্ণগুলি অনেকটা একইরূপ ছিল। এজন্য লিপিকার একটির স্থানে আরেকটি লিখেছেন।
তৃতীয়ত, লিপিকার হয়ত ভেবেছেন যে, বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন জ্ঞাপক আংশিক বর্ণ ব্যবহারে ভুল হয়েছে, অথবা তিনি মূল বক্তব্য বুঝতে পারেন নি, ফলে তিনি সংশোধন

65 যে কোনো ব্যক্তির জন্য বাইবেল বা পবিত্র পুস্তক লেখার কোনো সুযোগ ছিল না। শুধুম বিশেষভাবে ধর্মশিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মগুরু পন্ডিতগণই এগুলি লিখতেন। তাঁদেরকে ‘লিপিকারগণ’ বা ‘scribes’ হিব্রুতে ‘সোফেরিম (soferim) বলা হতো।
176

করার উদ্দেশ্যে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।
চতুর্থত, লেখক লিখতে যেয়ে ভুলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছেন। যখন বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন তখন আর লিখিত কথাগুলি মুছতে রাজি হন নি বরং যা লেখা হয়ে গিয়েছিল তা ঠিক সেভাবেই রেখে দিয়ে যে স্থান থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল সেই স্থান থেকে লিখতে শুরু করেছেন।
পঞ্চমত, লেখক লিখতে লিখতে কিছু কথা বাদ দিয়ে ফেলেন। এরপর অন্য কিছু লেখার পরে পূর্ববর্তী স্থানে বাদ দেওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। তখন তিনি পরবর্তী যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তার পরে বাদ পড়া কথাগুলি লিখেন। এতে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে চলে যায়।
ষষ্ঠত, লেখকের দৃষ্টি এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরে যায়, ফলে কিছু কথা বাদ পড়ে যায়। সপ্তমত, লেখক সংক্ষেপিত শব্দগুলির অর্থ বুঝতে ভুল করেন, ফলে তিনি তাঁর নিজের বুঝ অনুসারে তা পুরোপুরি লিখেন। এভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হন।
অষ্টমত, লেখক বা লিপিকারের অজ্ঞতা ও অবহেলা ছিল পাঠের বিভিন্নতা (Various readings) সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ। তাঁরা টীকার বক্তব্য বা ব্যাখ্যাকে মূল পুস্তকের অংশ মনে করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন।
দ্বিতীয় কারণ: ‘‘মূল কপির অসম্পূর্ণতা’’
177

যে কপি থেকে লিপিকার অনুলিপি করেছেন সেই কপির অসম্পূর্ণতার ফলে বিভিন্নভাবে ‘পাঠের বিভিন্নতা’ ঘটতে পারে বলে বুঝা যায়: প্রথমত, অক্ষরের বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন মুছে যাওয়া।
দ্বিতীয়ত, এক পৃষ্ঠার বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন পৃষ্ঠার উল্টো পিঠে ফুটে উঠেছে এবং উল্টো পৃষ্ঠার অক্ষরের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এই চিহ্নগুলিকে এ পৃষ্ঠার অংশ মনে করা হয়েছে। লিপিকার একে এ পৃষ্ঠার চিহ্ন মনে করে তার বুঝ মত তা লিখেছেন। তৃতীয়ত, পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদটি কোনোরূপ চিহ্ন ছাড়াই টীকায় লেখা ছিল। লেখক বুঝতে পারেন নি যে, অনুচ্ছেদটি কোথায় লিখতে হবে। এতে তিনি ভুল করেছেন।
তৃতীয় কারণ: ‘‘কাল্পনিক সংশোধন ও পরিমার্জন’’
বিভিন্নভাবে এরূপ আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক সংশোধন ঘটেছে:
প্রথমত, একটি বিশুদ্ধ ও সঠিক বক্তব্যকে লিপিকার অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন অথবা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গমে ভুল করেছেন। অথবা তিনি মনে করেছেন যে, বাক্যটি ভুল, অথচ বাক্যটি মূলত ভুল নয়। এজন্য এই লিপিকারের সংশোধনই মূলত ভুলের সৃষ্টি করে।
দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো গবেষক পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেন নি। তারা ভুল সংশোধনকেই যথেষ্ঠ মনে করেন নি। বরং তাঁরা মূল

178

পাণ্ডুলিপির দুর্বল বাক্য মুছে ফেলে দিয়ে সেখানে সবল ও বিশুদ্ধ বাক্য লিখেছেন। অতিরিক্ত কথাগুলি ফেলে দিয়েছেন। একাধিক সমার্থক শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে না পারলে অতিরিক্ত শব্দগুলি ফেলে দিয়েছেন।
তৃতীয়ত, পরস্পর সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এক স্থানের বক্তব্যের সাথে অন্য স্থানের বক্তব্যের যেন অমিল না থাকে এজন্য তাঁরা বক্তব্যের কাটছাট করে উভয়ের মধ্যে অর্থগত সমন্বয় সাধন করতেন। পাঠের বিভিন্নতা ঘটার এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। নতুন নিয়মের পুস্তকাবলিতে এইরূপ কার্য বেশি সাধিত হয়েছে। এজন্য পৌলের পত্রাবলির মধ্যে পরবর্তী সংযোজন বেশি ঘটেছে। গ্রীক অনুবাদের সাথে পৌলের বক্তব্যের অর্থগত সমন্বয় সৃষ্টির জন্য তাঁরা এইরূপ করেছেন। চতুর্থত, কোনো কোনো গবেষক পণ্ডিত নতুন নিয়মকে ল্যাটিন অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।
চতুর্থ কারণ: ‘‘ইচ্ছাকৃত বিকৃতি’’
পণ্ডিত হর্ন বলেন, নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের বিকৃতি করেছেন, ফলে পাঠের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ সকল ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকারীদের অনেকেই ছিলেন বিভ্রান্ত (heretic) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ ছিলেন মূলধারার

179

মেলানোর জন্য পরিবর্তন করেছেন, প্রমাণিত হলো যে, বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গণ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করেছেন, প্রমাণিত হলো যে, ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ বিভিন্ন মত সমর্থন বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করতেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতিকে সমর্থন করা হতো.... এ সব কিছু প্রমাণিত হওয়ার পরে বিকৃতির আর কোনো সুক্ষ্ম পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কি বাকি থাকল?
এখন একথা দাবি করা কি অন্যায় ও অযৌক্তিক হবে যে, ক্রুশের পূজারী খৃস্টানগণ যারা ক্রুশের উপাসনা এবং এর মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে মোটেও রাজি ছিলেন না, তাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পরে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের স্বপক্ষে যেতে পারে এরূপ আরো কিছু কথা বিকৃত করেছেন? এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতি সমর্থন করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যেমনভাবে বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের বিকৃতিকে সমর্থন করা হয়েছে বরং বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির চেয়ে ইসলামের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক বেশি। কাজেই এই বিকৃতির সমর্থনও অনেক বেশি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।
১. ৩. ৪. ৪. যীশু খৃস্টের সাক্ষ্য

181

বিকৃতি অপ্রমাণিত করতে ও বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে পাদরিগণের দ্বিতীয় বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এই যে, স্বয়ং যীশু খৃস্ট পুরাতন নিয়মের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

66 সেগুলি যদি বিকৃত হতো তবে
নিশ্চয় তিনি তা বলতেন বরং সেক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল ইয়াহূদীদের সামনে বিকৃতি প্রমাণ করে তাদেরকে তা স্বীকারে বাধ্য করা।
নিম্নের বিষয়গুলি এই বিভ্রান্তির অপনোদন করবে:
১. ৩. ৪. ৫. যীশুর বক্তব্য বনাম বাইবেলের প্রামাণ্যতা
(ক) যীশুর সাক্ষ্য মোটেও প্রমাণিত নয় প্রথম পর্যায়ে আমরা বলব যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের কোনো পুস্তকের লেখকের যুগ থেকে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত হওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। এগুলির মধ্যে এমন

66 যীশু বলেন: ‘‘কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।’’ (মথি ৫/১৮) এতে বুঝা যায় যে, পুরাতন নিয়ম মহাপ্রলয় পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এছাড়া যীশু বারংবার পুরাতন নিয়মের ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বক্তব্য দ্বারা তাঁর নিজের মতামত সমর্থন করেছেন। প্রেরিতগণও এভাবে বারংবার পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।
182

(Ebionites) **(Marcion)** **(Manichees/ Manichaen/ Manichean)**

খৃস্টধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বিষয়কে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এ বিকৃতি পরবর্তী যুগে সমর্থন করা হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে। এবোনাইট, মারসিওনীয় ও মানিকীয সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক বা অধিকাংশ পুস্তক অস্বীকার করত। এজন্য হয়ত তাদেরকে ঘায়েল করতে এ সকল শ্লোক বা বক্তব্য যীশুর নামে জালিয়াতি করে লেখা হয়েছে। যেরূপভাবে তাঁরা আরিয়ান সম্প্রদায় (Arians)

67 ও ইউটিকিয়ান (Eutychian) সম্প্রদায়ের

68 বিরোধিতার জন্য বাইবেলের
মধ্যে বিকৃতি সাধন করেন এবং তাঁদের বিকৃতি পরবর্তীকালে সমর্থন করা হয়।
(খ) যীশুর সাক্ষ্য প্রচলিত পুস্তকগুলির জন্য প্রমাণিত নয়
দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, যীশু পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য

67 ৩য়-৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়ূসে (Arius) অনুসারিগণ, যারা যীশু খৃস্টকে ইশ্বরের সত্তার অংশ নয়, বরং তার সৃষ্ট ‘পুত্র’ বলে বিশ্বাস করতেন। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খৃস্টান বলে পরিচিত।
68 ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর খৃস্টান সাধু ইউটিশাস (Eutyches 375-454)-এর অনুসারিগণ। এরা ‘একসত্তাবাদী’ (Monophysites)। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের মধ্যে একটিমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর মধ্যে কোনো মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। বিস্তারিত দেখুন Encyclopaedia Britannica, artciles: Eutychian; Eutyches; Monophysite.
184

দিয়েছেন মর্মে যে সকল কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হোক বা প্রকৃত পক্ষে যীশুর কথাই হোক, কোনো অবস্থাতেই তাঁর এই বক্তব্য দ্বারা পুরাতন নিয়মের প্রচলিত সকল পুস্তকের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ এসকল কথার মধ্যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করা নেই। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে, যীশু যে পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন সে পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৩৯টি পুস্তক ছিল? (প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা এ পুস্তকগুলি মানেন), না সেই পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৪৬টি পুস্তক ছিল? (ক্যাথলিকগণ এ পুস্তকগুলিকে মানেন।)
ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) অত্যন্ত গোঁড়া ইয়াহূদী ছিলেন এবং খৃস্টানগণও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মান্য করেন। তিনি তাঁর ইতিহাসে শুধু নিম্নের কথাটুকু স্বীকার করেছেন: ‘‘আমাদের নিকট পরস্পর বিরোধী হাজার হাজার পুস্তক নেই বরং আমাদের নিকট মাত্র ২২টি পুস্তক রয়েছে। এগুলির মধ্যে পাঁচটি পুস্তক মোশির।’’ জোসেফাস তোরাহ ছাড়া পুরাতন নিয়মের মধ্যে আরও ১৭টি পুস্তক আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বর্তমানে প্রচলিত ‘বাইবেলের’ মধ্যে প্রটেস্টান্টদের মতে তোরাহ ছাড়াও ৩৪টি পুস্তক ও ক্যাথলিকদের মতে ৪১টি পুস্তক রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, জোসেফাস

185

পুস্তকগুলির সংখ্যা বলেছেন, কিন্তু নাম উল্লেখ করেন নি।

69 কাজেই প্রচলিত ৩৪ বা
৪১টি পুস্তকের মধ্যে কোন্ কোন্ পুস্তক ১৭টি পুস্তকের পরে অতিরিক্ত সংযুক্ত তাও জানার উপায় নেই। একথা বলার কোনো উপায় নেই

69 এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মগুরু অরিগন (Origen)-ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে ২২টি পুস্তক বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পুস্তকগুলির নামও উল্লেখ করেছেন। নামের বর্ণনায় তিনি প্রচলিত কিছু পুস্তককে একত্রিত করে উল্লেখ করেছেন: তাঁর বর্ণনামতে মোশির পাঁচটি পুস্তক ছাড়া অবশিষ্ট ১৭টি পুস্তক নিম্নরূপ: (১) যিহোশূয়ের পুস্তক, (২) বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ও রূতের বিবরণ একত্রে,
(৩) শমুয়েলের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক একত্রে, (৪) রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৫) বংশাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৬) ইয্রার প্রথম ও দ্বিতীয় (নহিমিয়ের) পুস্তক একত্রে, (৭) গীতসংহিতা, (৮) হিতোপদেশ, (৯) উপদেশক,
(১০) পরমগীত, (১১) যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক, (১২) যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক, যিরমিয়ের বিলাপ ও যিরমিয়ের পত্র একত্রে, (১৩) দানিয়েলের পুস্তক,
(১৪) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক, (১৫) ইয়োবের বিবরণ, (১৬) ইস্টেরের বিবরণ ও (১৭) মাকাবিজের পুস্তক। ১ম খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ইহূদী ধর্মগুরু ও ৩য় শতকের প্রসিদ্ধত খৃস্টান ধর্মগুরু উভয়ের বিবরণ অনুসারে নিম্নের পুস্তকগুলি জাল, বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত এবং কোনো অবস্থাতেই পুরাতন নিয়মের অংশ নয়।: (১)হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (Hosea), (২) যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (Joel), (৩) আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (Amos), (৪) ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (Obadiah), (৫) যোনা ভাববাদীর 186

যে, অমুক ১৭টি পুস্তক জোসেফাস উল্লিখিত বিশুদ্ধ পুস্তক।
ইতোপূর্বে পাঠক দেখেছেন যে, পণ্ডিত ক্রীযস্টম (John Chrysostom: 347-407) ও অন্যান্য ক্যাথলিক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, ইয়াহূদীগণ তাঁদের অবহেলার কারণে- বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে- অনেক ঐশ্বরিক পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থ হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তারা পুড়িয়ে ফেলেছে। হয়ত জোসেফাস উল্লিখিত এই ১৭টি পুস্তকের মধ্য থেকে কিছু পুস্তকও এই হারানো, ছেড়া ও পুড়িয়ে ফেলা পুস্তকের মধ্যে চলে গিয়েছে। খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে ২০টিরও

পুস্তক (Jonah), (৬) মীখা ভাববাদীর পুস্তক (Micah), (৭) নহূম ভাববাদীর পুস্তক (Nahum), (৮) হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (Habakkuk), (৯) সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zephaniah), (১০) হগয় ভাববাদীর পুস্তক (Haggai), (১১) সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zechariah), (১২) মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (Malachi)। এই ১২টি পুস্তককে প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই পুরাতন নিয়মের পুস্তক বলে বিশ্বাস করেন। এছাড়া ক্যাথলিকদের অতিরিক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে ম্যাকাবিজ ছাড়া বাকি ৫টি পুস্তকও জাল বলে জানা যায়। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, যিরমিয়ের পত্র (Epistle of Jeremiah) নামে একটি পুস্তকের কথা ওরিগন উল্লেখ করেছেন, যা বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে নেই। দেখুন, Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.

অধিক ধর্মগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক পণ্ডিত টমাস এঙ্গেলস বলেন: ‘‘পণ্ডিতগণ একমত যে, বাইবেলের মধ্য থেকে বিনষ্টকৃত বা হারিয়ে যাওয়া পবিত্র পুস্তকাদির সংখ্যা ২০ এর কম নয়।’’ জোসেফাসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মোশির পুস্তকের সংখ্যা পাঁচটি। কিন্তু তিনি এ পাঁচটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি না যে, এ পাঁচটি পুস্তক বলতে বর্তমানে প্রচলিত ৫টি পুস্তক বুঝিয়েছেন, না অন্য কোনো পুস্তক বুঝিয়েছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি এই পাঁচটি পুস্তকের কথা বলেন নি। কারণ তিনি বর্তমানে মোশির নামে প্রচলিত তোরাহ-এর পাঁচটি পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যের বিপরীত অনেক কথা বলেছেন। ইতোপূর্বে বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির আলোচনায় পাঠক তা দেখেছেন।
(গ) যীশু অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন, বিশুদ্ধতার নয়
তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, আমরা যদি অনুমানের উপর ধরে নিই যে, বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকগুলিই যীশুখৃস্টের যুগে প্রচলিত ছিল এবং তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ এ পুস্তকগুলিই মেনে নিয়েছেন এবং এগুলির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তবুও তাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রচলিত পুস্তকগুলির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না, শুধু অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

খৃস্টানদের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতার জের হিসেবে ইয়াহূদীগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে বিকৃত করে। কাজেই যীশু যদি সাক্ষ্য দিয়েও থাকেন তাতে তার পরের যুগে পুরাতন নিয়মগুলির বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয় না।
১. ৩. ৪. ৬. বাইবেলের বিকৃতি কি অসম্ভব ছিল?
বাইবেলের বিকৃতি অসম্ভব প্রমাণ করতে খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, বাইবেলের অগণিত কপি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কাজেই কারো জন্যই এতে কোনো বিৃকতি সাধন সম্ভব ছিল না।
এ দাবিটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট। ইয়াহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করছেন যে, বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। কাজেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব ছিল না বলে দাবি করা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। তদুপরি এখানে আমরা বাইবেলে বিকৃতির ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করব, যেন, পাঠক বুঝতে পারেন যে, বাইবেলের বিকৃতি কিভাবে এত সহজ হয়েছিল।
১. ৩. ৪. ৭. বাইবেলের ইতিহাস ও বিকৃতির প্রেক্ষাপট
(ক) মূসা আলাইহিস সালাম থেকে নেবুকাদনেজার পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম
মূসা আলাইহিস সালাম-এর সময়কাল সম্পর্কে বাইবেল ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে

191

কিছু মতভেদ রয়েছে। মোটামুটি বলা চলে যে, খৃস্টপূর্ব ১৩৫০ সালের দিকে মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃ. পূর্ব ১২৩০/৩১ সালের দিকে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকাল থেকে খৃস্টপূর্ব ৫৮৭/৫৮৬ সালে নেবুকাদনেজারের হাতে ইয়াহূদী রাষ্ট্রের ধ্বংস পর্যন্ত প্রায় সড়ে ছয় শত বৎসরে ইয়াহূদী জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা বাইবেলের বিকৃতির পেক্ষাপট অনুধাবন করতে পারব।
মূসা আলাইহিস সালাম তোরাহ লিখে সেই পাণ্ডুলিপিটি ইস্রায়েল সন্তানগণের যাজক ও গোত্রপতিগণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন সেই পাণ্ডুলিপিটিকে সংরক্ষণ করেন এবং ‘সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের’ মধ্যে তা রেখে দেন। তিনি তাঁদেরকে প্রতি সাত বৎসর পর পর সকল ইস্রায়েলের সামনে তা পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: ‘‘সাত সাত বৎসরের পরে, মোচন বৎসরের কালে, কুটীরোৎসব পর্বে, যখন সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তুমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণগোচরে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে।’’

70

ইস্রায়েল সন্তানগণের প্রথম প্রজন্ম মোশির এই নির্দেশ মেনে চলেন। এই প্রজন্মের গত হওয়ার পরে ইস্রায়েল সন্তানদের অবস্থা

70 দ্বিতীয় বিবরণ ৩১/১০-১১।
192

পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে পাপাচারিতা, অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো তাঁরা ধর্মত্যাগ করতেন। আবার কখনো পুনরায় ধর্ম মানতে শুরু করতেন। দায়ূদ-এর রাজত্বের শুরু পর্যন্ত (প্রায় তিনশত বৎসর যাবৎ) তাঁদের অবস্থা এইরূপ ছিল।
দায়ূদের রাজত্বকালে ইস্রায়েল সন্তানগণের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। দায়ূদের রাজত্বকালে ও শলোমনের রাজত্বের প্রথমাংশে ইস্রায়েল সন্তানগণ ধর্মদ্রোহ পরিত্যাগ করে ধর্মীয় অনুশাসনাদি পালন করে চলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীগুলির ধর্মদ্রোহিতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার মধ্যে মোশির প্রদত্ত ‘সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকে রক্ষিত’ তোরাহটি হারিয়ে যায়। কখন তা হারিয়ে যায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এতটুকুই জানা যায় যে, শলোমানের রাজত্বের পূর্বেই তা হারিয়ে যায়। কারণ শলোমনের রাজত্বকালে যখন তিনি ‘সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক’-টি উন্মোচন করেন তখন তার মধ্যে তোরাহের কোনো অস্তিত্ব পান নি। সিন্দুকটির মধ্যে শুধু দুইটি ‘তোরাহ-বহির্ভূত’ প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিল। ১ রাজাবলির ৮ম অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: ‘‘সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন; সেই সময়ে, মিসর হইতে

193

ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন।’’
বাইবেলের বিবরণ অনুসারে শলোমনের রাজত্বের শেষভাগ থেকে ইস্রায়েলীয়গণের মধ্যে জঘন্য বিপর্যয় নেমে আসে। স্বয়ং শলোমন তাঁর শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করেন (নাঊযু বিল্লাহ!)। তিনি তাঁর স্ত্রীগণের পরামর্শে মুর্তিপূজা শুরু করেন মুর্তিপূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি যখন ধর্মত্যাগী (মুর্তাদ) ও পৌত্তলিকে পরিণত হলেন (নাঊযু বিল্লাহ!!) তখন তোরাহ-এর প্রতি তাঁর আর কোনো আগ্রহ থাকে না।
তাঁর মৃত্যুর পরে আরো কঠিনতর বিপর্যয় শুরু হয়। খৃস্টপূর্ব ৯৩১ সালের দিকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ অভ্যন্তরীন কোন্দল ও দলাদলির ফলে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। ইয়াহূদীগণের একটি রাজ্য দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইস্রায়েল-সন্তানগণের ১২ গোত্রের মধ্যে ১০টি গোত্র এক পক্ষে এবং বাকি দুইটি বংশ এক পক্ষে থাকেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের (Jeroboam I) নেতৃত্বে বিদ্রোহী ১০টি গোত্র প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশে পৃথক রাজ্য ঘোষণা করেন। তাঁদের রাজ্যের নাম হয় ‘ইস্রায়েল’ (the kingdom of Israel)। ইস্রায়েল রাজ্যকে অনেক সময় শামেরা (Samaria) বা ইফ্রমিয় (Ephraimites) বলা হতো। এর রাজধানী ছিল
194

নাবলুস। অবশিষ্ট দুইটি গোত্র: যিহূদা ও বিন্যামিন বংশের রাজা হন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম (Rehoboam)। এই রাজ্যের নাম হয় জুডিয়া বা জুডাই রাজ্য (the Kingdom of Judea, also Judaea or Judah)। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম।
উভয় রাজ্যেই ধর্মদ্রোহিতা, মুর্তিপুজা ও অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের ইস্রায়েল বা শমরীয় রাজ্যের রাজা যারবিয়াম রাজ্যভার গ্রহণ করার পরপরই মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে ইস্রায়েলীয়দের ১০টি গোত্রের মানুষেরা মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁরা মুর্তিপুজা শুরু করেন। এদের মধ্যে যাঁরা তোরাহ-এর অনুসারী ছিলেন তাঁরা নিজেদের রাজ্য পরিত্যাগ করে যুডাহ (যিহূদা) রাজ্যে হিজরত করেন।
এভাবে এ রাজ্য বা ইস্রায়েল সন্তানদের মূল অংশ এ সময় থেকে মূসার আলাইহিস সালাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান এবং কুফর, মুর্তিপুজা ও অনাচারের মধ্যে অতিবাহিত করেন। পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসর এ রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল। সন-তারিখের বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণের মতে ইস্রায়েল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল খৃ. পু. ৯২২ সাল থেকে ৭২২/৭২১ সাল পর্যন্ত কমবেশি ২০০ বৎসর। এ সময়ে ১৯ জন রাজা এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে ধ্বংস করেন। অশুরীয়দের (the Neo-Assyrian Empire) আক্রমণে তারা পরাজিত হয়। খৃস্টপূর্ব ৭২৪

সালে অ্যসিরিয়ান (অশূরীয়) সম্রাট চতুর্থ শালমানেসার বা শল্মনেষর (Shalmaneser iv) ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমন করেন। তার মৃত্যুর পর তার সেনাপতি দ্বিতীয় সার্গন (Sargon II: ruled 722-705 bc) উপাধি ধারণ করে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে আসিরিয়্যানগণ ইস্রায়েলীয়দেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী অশুরীয়গণ পরাজিত ইস্রায়েলীয়গণকে বন্দি করে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত করে। এ এলাকায় অল্পসংখ্যক ইস্রায়েলীয় অবশিষ্ট থাকে।
আশুরীয়গণ ইস্রায়েলীয়দেরকে এ সকল অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করার পরে সেখানে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পৌত্তলিকগণকে এনে বসতি স্থাপন করায়। সেখানে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক ইস্রায়েলীয় এ সকল পৌত্তলিকদের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। তাঁরা পৌত্তলিকগণের পুত্র কন্যাদেরকে বিবাহ করেন এবং তাদের সাথে একত্র পরিবার গঠন করেন। এ সকল ‘ইস্রায়েলীয়’ ইয়াহূদীদেরকে ‘শমরীয়’ (Samaritans) বলা হয়।

71

71 ইহূদীরা এদেরকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করত। যীশুখৃস্ট যখন তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন তখন বিশেষ করে শমরীয়দের কাছে না যাওয়ার ও তাদেরক তাঁর ধর্মে দীক্ষা না দেওয়ার নির্দেশ দেন। মথি বলেন: ‘‘These twelve Jesus sent forth, and commanded

[illegible]

[illegible][72] [illegible]

---

them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel: [illegible] (-[illegible]) [illegible]; [illegible]- [illegible] (/-)

[72] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]+[illegible]=[illegible]. [illegible]/[illegible] [illegible]

জন রাজা যিহূদা রাজ্যে রাজত্ব করেন। এ সকল রাজার মধ্যে বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ রাজার সংখ্যা ছিল কম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন ধর্মত্যাগী ও মুর্তিপুজক। প্রথম রাজা রহবিয়ামের যুগ থেকেই মুর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রতিটি বৃক্ষের নিচে মুর্তি স্থাপন করা হয় এবং পূজা করা হয়। রহবিয়ামের রাজত্বকালেই যুডিয়া রাজ্যের উপর গযব নেমে আসে। তার সময়েই খৃস্ট পূর্ব ৯২৫ অব্দে মিশরের ফিরাউন ১ম শেশাঙ্ক বা শীশক (Shashanq I) যুডাহ রাজ্য আক্রমন করে যিরূশালেম নগর ও ধর্মধাম লুন্ঠন করেন। তিনি ধর্মধামের সকল আসবাবপত্র ও রাজ প্রাসাদের সকল মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।।

73

কিছুদিন পরে যিহূদা রাজ্যের তৃতীয় রাজা আসার (Asa) রাজত্বকালে ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মত্যাগী ও মুর্তিপূজক রাজা বাশা (Baasha) যিরূশালেম আক্রমন করে ধর্মধাম ও রাজ প্রাসাদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করেন।

74

যিহূদা বা যুডিয়া রাজ্যের ষষ্ঠ রাজা অহসিয় (Ahaziah)-এর সময়ে বাল-প্রতিমার পূজা ও তার উদ্দেশ্যে পশু-উৎসর্গ করার জন্য যিরূশালেমের অলিতে গলিতে ও সকল স্থানে বেদি স্থাপন করা হয়। শলোমনের

73 ১ রাজাবলি১৪/২৫-২৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৬।
74 ১ রাজাবালি ১৫/১৬-২২।

মন্দির বা ধর্মধামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
যিহূদা বা যুডিয়া রাজ্যে ধর্মদ্রোহ, মুর্তিপুজা ও অনাচারের ব্যাপকতম প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে রাজা মনঃশি (Manasseh)-এর শাসনামলে (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯ অব্দ)। এ সময়ে এই রাজ্যে প্রায় সকল অধিবাসীই মোশির ধর্ম পরিত্যাগ করে মুর্তিপূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। শলোমনের ধর্মধাম বা সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যেই মুর্তিপূজা ও প্রতিমার জন্য পশু-উৎসর্গ করার নিমিত্ত বেদি নির্মাণ করা হয়। রাজা মনঃশি যে প্রতিমার পূজা করতেন তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেই প্রতিমা স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র আমোন (Amon)-এর শাসনামলেও (খৃ. পূ. ৬৩৯-৬৩৮ অব্দ) ধর্মত্যাগ ও পৌত্তলিকতার অবস্থা একইরূপ থাকে।
আমোনের মৃত্যুর পরে খৃ.পূ. ৬৩৮ সালে তাঁর পুত্র যোশিয় (Josiah) আট বৎসর বয়সে যিহূদা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার থেকে বিশুদ্ধভাবে তাওবা করেন। তিনি ও তাঁর রাজ্যের কর্ণধারগণ ধর্মদ্রোহিতা, পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে সমূলে বিনাশ করে মোশির ব্যবস্থা বা শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। মহাযাজক হিল্কিয় (Hilki'ah the high priest) ছিলেন তার দীক্ষাগুরু। তিনি সুলাইমানের ধর্মধাম বা মসজিদ সংস্কার ও চালু করার জন্য জনগণ
199

থেকে কর সংগ্রহ করতে ধর্মীয় লিপিকার শাফনকে (Shaphan the scribe)-কে দায়িত্ব দেনে। এ সকল সংস্কার কাজের জন্য ‘‘তাওরাত’’- এর প্রয়োজনীয়তা তারা বিশেষ করে অনুভব করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বের ১৭শ বৎসর পর্যন্ত বা খৃস্টপূর্ব ৬২১ সাল পর্যন্ত কেউ মোশির তোরাহ-এর কোনো পাণ্ডুলিপির চিহ্ন দেখেন নি বা এর কোনো কথাও কেউ শুনেন নি।
যোশিয় রাজার রাজত্বের ১৮শ বৎসরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) রাজা যোশিয়ের গুরু মহাযাজক হিল্কিয় (Hilki'ah) দাবি করেন যে, তিনি ‘সদাপ্রভুর গৃহে’, অর্থাৎ যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে রৌপ্যের হিসাব করতে যেয়ে মোশির তোরাহ বা সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তকখানি (the book of the law) পেয়েছেন। তিনি পুস্তকটি শাফন লেখককে (Shaphan the scribe) প্রদান করেন। শাফন লেখক রাজা যোশিয়কে পুস্তকটি পাঠ করে শোনান। রাজা এই পুস্তকটির বাক্যাদি শুনে এত বেশি বিমোহিত ও উদ্বেলিত হন যে তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলেন। ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতার কথা স্মরণ করে তিনি এভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ২ রাজাবলির ২২ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ৩৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

75

75 ২ রাজাবলি ২২/১-১১; ২ বংশাবলি ৩৪/১-১৯।

মোশির ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং রাজ্যে অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটান। মিশরের সম্রাট ফরৌণ-নখো বা নেকু (Neku) যিহোয়াহসকে বন্দি করে নিয়ে যান এবং তার ভ্রাতা ইলিয়াকীমকে যিহোয়াকীম (Jehoiakim/Joakim) নাম প্রদান পূর্বক সিংহাসনে বসান। যিহোয়াকীমও তার ভাইয়ের মত ধর্মদ্রোহী ও পৌত্তলিক ছিলেন। যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পরে (খৃ. পূ. ৫৯৮/৫৯৭ অব্দে) তার পুত্র যিহোয়াখীন (Jehoiachin/Joachin) রাজত্ব লাভ করেন। তিনিও তাঁর পিতা ও চাচার মতই ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিক ছিলেন। এ সময়ে ব্যাবিলনের সম্রাট বখত নসর বা নেবুকাদনেজার (Nebuchadrezzar II) জুডাহ বা যিহূদা রাজ্য দখল করেন। তিনি যিরূশালেম শহর, রাজ প্রাসাদ, ও ‘সদাপ্রভুর গৃহ’ বা ধর্মধামের সমস্ত ধন-সম্পদ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। তিনি রাজা যিহোয়াখীনকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা সিদকিয়কে (Zedekiah) রাজত্ব প্রদান করেন। নেবুকাদনেজার বিপুল সংখ্যক ইয়াহূদীকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।

76

76 বাইবেলের ভাষায়: তিনি যিরূশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান লোক ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দি এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্মকারকে লইয়া গেলেন; দেশের দীন দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। ২ রাজাবলি ২৪/১৪
203

কাফির পৌত্তলিক রাজা সিদকিয় (Zedekiah) প্রায় ১১ বৎসর নেবুকাদনেজারের অধীনে লাঞ্ছিত অবস্থায় যিহূদা রাজ্যের রাজত্ব করেন। এরপর তিনি বিদ্রোহ করেন। খৃ. পূ. ৫৮৭/৫৮৬ সালে নেবুকাদনেজার দ্বিতীয়বার যিরূশালেম আক্রমন ও দখল করেন। তিনি রাজা সিদকিয়কে বন্দি করে তাঁরই সামনে তাঁর পুত্রগণকে জবাই করেন। এরপর তিনি সিদকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ব্যাবিলন প্রেরণ করেন। নেবুকাদনেজার-এর বাহিনী এবার যিরূশালেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তারা যিরূশালেমের ধর্মধাম বা ‘সদাপ্রভুর গৃহ’, রাজ-প্রাসাদসমূহ, যিরূশালেমের সকল বাড়িঘর ও অট্টালিকায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মিভুত করে, যিরূশালেম নগরীর চারিদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয় এবং যিহূদা (Judah) রাজ্যে অবস্থানকারী অবশিষ্ট ইস্রায়েল সন্তানকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। এভাবে তিনি যিহূদা রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।

77

আমরা দেখেছি যে, ইয়াহূদীদের ১২ গোত্রের দশ গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য খৃস্টপূর্ব ৭২২ সালে রাজা দ্বিতীয় সার্গন (Sargon II) কর্তৃক চিরতরে বিনষ্ট হয়। এর মাত্র ১৩৫ বৎসর পরে খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে ইয়াহূদীদের অবশিষ্ট দুই গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণের যুডাই

77 ২ রাজাবলি ২৪ অধ্যায়ে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
204

রাজ্যও নেবুকাদনেজার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। বিশেষত যিরুশালেম ও ধর্মধাম (মসজিদে আকসা) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। স্বভাবতই এ ঘটনায় তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সকল পুস্তক যেগুলি এই ঘটনার পূর্বে লিখিত হয়েছিল সবই চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণও একথা একবাক্যে স্বীকার করেন।

78

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাজা যোশিয়ের (রাজত্বকাল খৃস্টপূর্ব ৬৩৮-৬০৮) পূর্বেই তাওরাত-এর ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তার সময়ের পূর্বেই তোরাহ-এর প্রচলন ও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তোরাহ-এর কোনো প্রকারের অস্তিত্বের কথাই জানা যায় না। যোশিয়ের সময়ে যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষত একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির দ্বারা ধারাবাহিক বহুল প্রচলন প্রমাণিত হয় না। তোরাহ-এর এ ‘পূনর্জন্ম’ও ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ১৩ বৎসরের (খৃ. পূ ৬২০-৬০৮ সাল) বেশি তা ব্যবহৃত হয় নি। এরপর আর তার কোনো খবর জানা যায় না। বাহ্যত বুঝা যায় যে, যোশিয়ের পুত্র-

78 তোরাহ বা ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ গণ পুস্তক ছিল না। একমাত্র ধর্মগুরুগণ ছাড়া কেউ তা পাঠ করত না।
ধর্মধাম ছাড়া অন্যত্র তার কোনো কপিও থাকত না।
কোনো ধর্মগুরু বা অন্য কেউ কখনো তা মুখস্ত করত না। ফলে বিনষ্ট হওয়ার পরে পুনরায় হুবহু তা লিখে ফেলার কোনো সুযোগ ছিল না।
205

নেবুকাদনেজারের এ ঘটনা (খৃ. পূ. ৫৮৭/৫৮৬) থেকে প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় ৬০০ বৎসরের ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধারণা ও দাবি অনুযায়ী নেবুকাদনেজারের এ ঘটনার প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা (Ezra) পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। এ পুনর্জন্ম ও পুনর্লিখনের প্রায় তিন শতাব্দী পরে আবার একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ও ধ্বংস গ্রাস করে হিব্রু জাতিকে। বাইবেলের ‘সন্দেহজনক পুস্তক’ (Apocrypha) মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees) ও খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus)-এর পুস্তকে এ সকল ঘটনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
এ ঘটনার সার-সংক্ষেপ হলো, খৃ. পূ. ১৬১ সালের দিকে

79 সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ
এন্টিয়ক (Antiochus IV Epiphanes c. 215-164 BC) যিরুশালেম অধিকার করেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম চিরতরে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির কপি-পাণ্ডুলিপি যেখানে যা পান তা সবই ছিড়ে টুকরো করার পরে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোনো ব্যক্তির নিকট পুরাতন নিয়মের

79 অনেকে ঘটনাটি খৃ. পূ. ১৬৮-১৬৪ সালে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।
207

কোনো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কোনো ব্যক্তি মোশির ব্যবস্থার (শরীয়তের) কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করতে হবে। প্রতি মাসে অনুসন্ধান করা হতো। কারো নিকট পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কেউ মোশির ব্যবস্থার কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর সেই পাণ্ডুলিপি বা কপিটি বিনষ্ট করা হতো। সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত এই নিধন ও বিনাশের কর্ম অব্যাহত থাকে।
এ ঘটনায় অগণিত ইয়াহূদী নিহত হন এবং ইয্রার লেখা তোরাহ বা পুরাতন নিয়ম এবং এর সকল কপি বিনষ্ট হয়।

80

ক্যাথলিক পণ্ডিত জন মিলনার লিখেন: পণ্ডিতগণ একমত যে, তোরাহ-এর মূল কপি এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকাবলির কপিগুলি নেবুকাদনেজারের সেনাবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর ইয্রার মাধ্যমে এ সকল পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রকাশ পায়। এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes)-এর ঘটনায় (খৃস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দের দিকে)

80 তাওরাত কখনই সকলের পাঠ বই ছিল না। শুর্ধ ধর্মধামে তা রক্ষিত থাকত ও বিশেষ অনুষ্ঠানে তার কিছু অংশ পাঠ করা হতো। এজন্য সে যুগে পূর্ণ তাওরাতের বা পুরাতন নিয়মের বেশি কপি ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। সাধারণ ইহূদীরা হয়ত প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় কপি করে রাখত। পূর্ণাজ্ঞ কপির সাথে এ সকল আংশিক অনুলিপিও এ সময় বিনষ্ট হয়ে যায়।
208

সেগুলিও আবার নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।
এর পর আবার ইয়াহূদীরা গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যুডাই রাজ্যে বসবাস করতে থাকেন। তবে তাদের অবাধ্যতা ও অনাচারের ফলে বারংবার তারা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্যে পড়েন। এভাবে তারা আরো অনেক কঠিন বিপদ ও রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন, ইয্রা লিখিত তোরাহ-এর বিকৃত বা অবিকৃতি যা কিছু পাণ্ডুলিপি তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল এ সকল ঘটনায় সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। এসকল হত্যাযজ্ঞের অন্যতম হলো রোমান যুবরাজ টিটাস (Titus) এর ঘটনা। রোমান সম্রা্ট ভেসপাসিয়ান (Vespasian) তাঁর পুত্র (পরবর্তী সম্রাট) টিটাসকে ইয়াহূদীদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং ‘সদাপ্রভুর গৃহ’ বা ধর্মধাম সম্পূর্ণ গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ঘটে খৃস্টের উর্ধ্বারোহণের ৩৭ বৎসর পরে (৭০ খৃস্টাব্দে)। জোসেফাসের ইতিহাসে ও অন্যান্য ইতিহাসে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ঘটনায় হত্যা, ক্রুশ, অগ্নিসংযোগ ও অনাহারে যিরূশালেম ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলের ১১ লক্ষ ইয়াহূদী মৃত্যুবরণ করে। ৯৭ হাজার ইয়াহূদীকে বন্দি করে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য এলাকাতেও অনেক ইয়াহূদী এই ঘটনার সময়ে নিহত হন বা

মৃত্যু বরণ করেন। এ কথা নিশ্চিত যে, এন্টিয়কের ঘটনার পরেও যদি পুরাতন নিয়মের কোনো কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে এ সকল ঘটনায় তাও হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। (এ গ্রন্থের ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় ‘প্রথম বিষয়’ দেখুন।)
(গ) হিব্রু তাওরাত বনাম গ্রীক অনুবাদ আমরা আগেই বলেছি যে, ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ও জাগতিক ভাষা হিব্রু ভাষা। এ ভাষাতেই পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক রচিত। খৃস্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার যুডাই রাজ্য দখল করেন এবং তা গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। ইয়াহূদীদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রীক ভাষার কিছু প্রচলন ক্রমান্বয়ে শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খৃস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে এ অনুবাদই মূল গ্রন্থের স্থান দখল করে।
প্রাচীন খৃস্টানগণ পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। বরং তাঁরা হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা গ্রীক অনুবাদটিকেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন। বিশেষত দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোনো খৃস্টান হিব্রু বাইবেলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নি। উপরন্তু ১ম খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সকল ইয়াহূদী উপাসনালয়েও গ্রীক অনুবাদই ব্যবহৃত হতো। এ

কারণে হিব্রু বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ সামান্য সংখ্যক পাণ্ডুলিপিও শুধু ইয়াহূদীদের নিকটেই ছিল। ইয়াহূদীরা ৭ম ও ৮ম খৃস্টীয় শতকে লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে দেন। কারণ তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে এগুলির অনেক অমিল ও বৈপরীত্য ছিল। এজন্য এ সময়ে লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি আধুনিক যুগের বাইবেল-গবেষকগণের নিকট পৌঁছায় নি। এ সকল পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করার পরে তাঁদের পছন্দনীয় পাণ্ডুলিপিগুলিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বিকৃতির বিশেষ সুযোগ তাদের সামনে উপস্থিত হয়।
(ঘ) প্রথম তিন শতাব্দীতে খৃস্টানগণ ও নতুন নিয়ম
প্রথম প্রজন্মগুলিতে খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। ফলে তাঁদের মধ্যে বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিকৃতি-ইচ্ছুকদের জন্য সেগুলির মধ্যে বিকৃতি করার সুযোগ ছিল অনেক। খৃস্টধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টানগণ কঠিন বিপদাপদ ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তাঁরা দশটি রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন হন:
প্রথমবার: রোমান সম্রাট নিরো (Nero)-এর সময়ে ৬৪ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে খৃস্টের প্রেরিত শিষ্য পিতর ও তাঁর স্ত্রী নিহত

হন।

81 এ সময়ে রাজধানী রোমে ও অন্যান্য সকল প্রদেশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ৬৮ খৃস্টাব্দে নিরোর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। খৃস্টধর্মের স্বীকৃতিই খৃস্টানগণের জন্য কঠিন অপরাধ বলে গণ্য ছিল।
দ্বিতীয়বার: রোমান সম্রাট ডোমিশিয়ান (Domitian)-এর রাজত্বকালে ৮১ সালে এ হত্যাযজ্ঞের শুরু।

82 এ সম্রাটও নিরোর
ন্যায় খৃস্টধর্মের শত্রু ছিলেন। তিনি খৃস্টানদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে সর্বত্র খৃস্টানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা শুরু হয়। এমনকি পৃথিবী থেকে সর্বশেষ খৃস্টানকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। এ সময়ে প্রেরিত যোহনকে নির্বাসিত করা হয় এবং ফ্লাবিয়াস ক্লিমেন্টকে হত্যা করা হয়। ৯৬ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।
তৃতীয়বার: রোমান সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর রাজত্বকালে। ১০১ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ১০৮ সালে তা ভয়ঙ্করতম রূপ গ্রহণ করে। এমনকি দায়ূদ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তিকে পর্যন্ত হত্যা করার নির্দেশ দেন তিনি। তার নির্দেশে

81 আধুনিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তক সাধু পৌলও এ সময়ে নিহত হন।
82 ডোমিশিয়ান ছিলেন সম্রাট টিটোর ভাই, যিনি ৭০ খৃস্টাব্দে যিরুশালেম ও যুডিয়ায় ইহূদীদের মধ্যে গণ হত্যাযজ্ঞ চালান।

সৈনিকের এরূপ সকলকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে থাকে। প্রহার করে, ক্রুশে বিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে ও বিভিন্নভাবে অনেক খৃস্টান পাদরী, বিশপ ও ধর্মগুরুকে হত্যা করা হয়। ১১৭ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।
চতুর্থবার: রোমান সম্রাট মারকাস এন্টোনিয়াস (Marcus Aurelius Antoninus)-এর রাজত্বকালে। তিনি ১৬১ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্রাট দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পৌত্তলিক রোমান ধর্মের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন। ১৬১ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বাত্মক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন। ১০ বৎসরেরও বেশি সময় তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র একভাবে খৃস্টানদেরকে হত্যা করা হয়। তিনি খৃস্টান পাদরি ও বিশপদেরকে মূর্তিপূজা ও মন্দিরের পুরোহিত হতে বলতেন। যারা অস্বীকার করত তাদেরকে লোহার চেয়ারে বসিয়ে নিচে আগুন জ্বালানো হতো। এরপর লোহার আংটা দিয়ে তার প্রজ্বলিত দেহের মাংস ছিন্নভিন্ন করা হতো।
পঞ্চমবার: রোমান সম্রাট সিভেরাস (Septimius Severus)-এর শাসনামলে (১৯৩-২১১খৃ.)। ২০২ খৃস্টাব্দ থেকে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সময়ে মিসরে, ফ্রান্সে ও কার্থেজে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা ছিল এত ভয়ানক যে, তখনকার খৃস্টানগণ মনে

করেন যে, খৃস্টারি (দাজ্জাল) বা পাপ পুরুষ (Antichrist, Man of Sin)-এর যুগ এসে গেছে বা কিয়ামত সন্নিকটে।
ষষ্ঠবার: রোমান সম্রাট ম্যাক্সিমিনের (Maximin) এর সময়ে। ২৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি রাজত্ব গ্রহণ করেন। ২৩৭ খৃস্টাব্দে এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। তিনি ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের গণহারে হত্যার নির্দেশ দেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণকে হত্যা করলে সাধারণ মানুষেরা অতি সহজেই তাঁর আনুগত্য করবে। এরপর তিনি নির্বিচারে সকল খৃস্টানকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে গণহত্যা চলতে থাকে। অনেক সময় একটি গর্তে ৫০/৬০টি দেহ ফেলা হতো। এরপর তিনি রোমের সকল বাসিন্দাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় ২৩৮ সালে তারই এক সৈনিক তাকে হত্যা করে।
সপ্তমবার: রোমান সম্রাট ডেসিয়াস (Decius)-এর সময়ে। ২৫৩ খৃস্টাব্দে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল খৃস্টানকে হত্যা করে তিনি খৃস্টধর্মকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময়ে কিছু খৃস্টান ধর্মত্যাগ করেন। মিসর, আফ্রিকা, ইটালি, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনর ছিল তাঁর এই পাইকারী নিধনযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু।

214

অষ্টমবার: রোমান সম্রাট ভ্যলেরিয়ান (Valerian/ Valerianus)-এর সময়ে ২৫৭ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সকল বিশপ ও ধর্মযাজককে হত্যা করতে হবে। সকল সম্মানীয় খৃস্টানকে লাঞ্ছিত করতে হবে এবং তাঁদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এরপরও তাঁরা খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ না করলে তাঁদেরকে হত্যা করতে হবে। সম্মানীয় মহিলাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর যারা খৃস্টান ছিল তাদের মধ্যে যারা রোমান দেবতা জুপিটারের পূজা করতে অস্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করা হতো বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো বা হিংস্র পশুর খাদ্য হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যান্যদের বন্দি করে ক্রীতদাস বানিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা হতো।
নবমবার: রোমান সম্রাট আরেলিয়ান (Aurelian /Aurelianus)-এর সময়ে। ২৭৪ খৃস্টাব্দে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। সম্রাট এ মর্মে ফরমান জারি করেন। তবে এবারের নিধনযজ্ঞ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ বৎসরখানেক পরে সম্রাট নিজেই নিহত হন। দশমবার: রোমান সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান (Diocletian/ Diocleti-anus)-এর শাসনামলে। তিনি ২৮৪ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। ২৮৬ সাল থেকে তিনি খৃস্টানদের নিপীড়ন শুরু
215

এ সম্রাট মিসরের শাসককে নির্দেশ দেন মিসরের কপ্টিক খৃস্টানদেরকে রোমান প্রতিমা পূজা করতে বাধ্য করতে। যারা এ আদেশ মানবে না তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) কপ্টিক খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এজন্য তার যুগকে ‘‘শহীদদের যুগ’’ বলা হয়। তিনি প্রতিদিন ৩০ থেকে ৮০ জন খৃস্টান হত্যা করতেন। তার হত্যাযজ্ঞ ১০ বৎসর স্থায়ী হয় এবং পুরো রোমান রাজ্যের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এ হত্যাযজ্ঞ পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির চেয়ে অধিক হিংস্র ও অধিক সময় স্থায়ী হয়। খৃস্টানগণ ঘটনাগুলির যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন তা যদি আংশিকও সত্য হয় তবে কখনোই কল্পনা করা যায় না যে, এ সময়ে খৃস্টানদের মধ্যে বাইবেলের অনেক কপি বিদ্যমান বা প্রচলিত ছিল। একথাও চিন্তা করা যায় না যে, তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে, বিশুদ্ধ রাখতে ও এ বিষয়ে গবেষণা পর্যালোচনা করতে পেরেছেন। বরং এ সময় ছিল বিকৃতিকারীদের জন্য বাইবেল বিকৃত করার সুবর্ণ সুযোগ। তারা ইচ্ছামত বিকৃতি ও জালিয়াতি করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল। পাঠক জেনেছেন যে, খৃস্টীয় প্রথম শতকে খৃস্টানদের মধ্যে বিভ্রান্ত দল উপদলের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তারা সকলেই বাইবেল বিকৃত করতেন।

83

83 এখানে আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:
217

উপরের বিষয়গুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট থেকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলির অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা বা বিশুদ্ধতার প্রমাণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি পুস্তকেরও লেখক থেকে

(১) প্রথম কয়েক শতাব্দীর খৃস্টানগণ, বিশেষত যীশুর যুগ ও তার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ কখনোই ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের কথা চিন্তা করেন নি। উপরন্তু তারা ধর্মগ্রন্থ বা সুসমাচার লিখে রাখা বা সংরক্ষণ করার বিরোধিতা করতেন এবং একে পাগলামি বলে মনে করতেন। কারণ, তাঁরা সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, অচিরেই- তাদের জীবদ্দশাতেই-কিয়ামত বা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচার সংঘটিত হবে। জীবিতরা রূপান্তরিত হবে এবং মৃতরা উত্থিত হবে। যীশু স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং খৃস্টানদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত যীশু ও প্রেরিতদের বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্য থেকেই তারা তা বিশ্বাস করতেন। যীশুর এ সকল বাণী ও বক্তব্য বিভিন্ন সুসমাচার ও পত্রে এখনো বিদ্যমান। এ অর্থে অনেক বক্তব্য নতুন নিয়মের পত্রাবলিতে বিদ্যমান।
থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘১৫ কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমেই সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে তাহারা প্রথমে উঠিবে। ১৭ পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার 218

কেনো অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা তাঁদের নিকট সংরক্ষিত নেই। ইয়াহূদীগণের নিকটেও নেই এবং খৃস্টানগণের নিকটেও নেই। ইযহারুল হক্কের প্রণেতা আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তাঁর সাথে প্রকাশ্য বিতর্কের সময় (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) পাদ্রী মি. ফানডার ও মি.

নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।’’ করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘৫১ দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; ৫২ এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইবে; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।’’
এভাবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তারা মরবেন না, বরং তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত শুরু হবে এবং তারা শুধু রূপান্তরিত হয়ে স্বর্গে যাবে।
যীশু যোহনের বিষয়ে পিতরকে বলেন: ‘‘আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি?’’ (যোহন ২১/২২) এ কথা থেকে শিষ্যরা বুঝেন যে, যীশুর পুনরাগমণের পূর্বে যোহন মরবেন না। আর ঘটনাক্রমে যোহন দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। (অথবা যোহনের দীর্ঘায়ুর কারণেই এ কথাটি যীশুর নামে জালিয়াতি করে প্রচার করা হয়েছিল।) যীশুর পরেও তিনি প্রায় শতবৎসর বেঁচে ছিলেন। ফলে তাঁদের বিশ্বাস আরো জোরালো হয়। প্রতিদিনই তাঁরা কিয়ামতের অপেক্ষা করতেন।
এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা সুসমাচার বা ধর্মপু্স্তক লিখতে নিষেধ করতেন। প্রকাশিত বাক্যের ২২ অধ্যায়ে যীশুর কথাগুলি নিম্নরূপ: ‘‘৭ আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।... ১০ তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; 219

ফ্রেঞ্চ-এর নিকট এরূপ সূত্র দাবি করেন। তাঁরা একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১৩ বৎসর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার

কেননা সময় সন্নিকট।... ২০ আমি শীঘ্র আসিতেছি।’’
(২) উপরের বিশ্বাসের সাথে দ্বিতীয় একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিল, তা হলো, যীশু মূসার শরীয়ত পূর্ণ করতে এসেছিলেন। কাজেই পুরাতন নিয়মকেই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করতেন এবং পাঠ করতেন, যীশুর সুসমাচার বা শিক্ষা সংকলন বা সংরক্ষরণের কোনোরূপ নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টাই তাঁরা করেন নি। দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে যীশুর শিক্ষা, সুসমাচার, প্রেরিতদের পত্র ইত্যাদি নামে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কিছু মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু এগুলির কোনো গুরুত্ব দেয় নি খৃস্টান চার্চ। সাধু আরিয়ানুস (Saint Irenaeus/Irenaeus) ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মকে একটি কেতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ প্রদানের চেষ্টা শুরু করেন। দেখুন: Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 30-
31. তারিখ কানীসাতিল মাসীহ, পৃষ্ঠা ৪৫।
(৩) খৃস্টধর্মের প্রথম ২০০ বৎসরের ইতিহাসে গসপেল বা সুসমাচারের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। কোথাও পাওয়া যায় না যে, কোনো মন্ডলীতে বা চার্চে ‘‘গসপেল’’ পাঠ করা হতো, সংরক্ষণ করা হতো বা এগুলির প্রচার বা শিক্ষার কোনোরূপ চেষ্টা করা হতো। এত অত্যাচারের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মগুরুদের চিঠিপত্র যত্ন সহকারে বিভিন্ন চার্চে সংরক্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও ‘‘গসপেল’’ বা সুসমাচারের সংরক্ষণের সামান্যতম উল্লেখ নেই।
220

ফলে এ গ্রন্থগুলির সূত্র পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।
এভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধারণা ও অনুমান ছাড়া কোনো প্রকার সূত্র (chain of authorities) ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের কাছে নেই। তাদের নিকট অতিপ্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপি নেই। যে সকল পাণ্ডুলিপি তারা ‘‘প্রাচীন’’ বলে দাবি করেন সেগুলি খৃস্টীয় ৪র্থ/৫ম শতকের বা তার পরের বলে তারাই দাবি করেন। আর এসকল প্রাচীন বলে কথিত পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকৃতপক্ষে কবে, কখন বা কোথায় লেখা হয়েছে তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।
মুসলিম লেখকগণ সাধারণত তাঁদের লেখা বই-পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির শেষে লিখেন যে, অমুক সালের অমুক তারিখে পুস্তকটির রচনা বা অনুলিপি করা শেষ হলো। অনুলিপির ক্ষেত্রে অনুলিপিকারের নামও তাঁরা লিখেন। এধরনের কোনো কথা বাইবেলীয় পাণ্ডুলিপির কোথাও লেখা নেই। কে এই অনুলিপি করেছেন, কবে, কখন বা কোথায় তা করেছেন কিছুই তাতে উল্লেখ করা হয় নি। খৃস্টান পণ্ডিতগণ কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক শতকে বা অমুক শতকে তা লেখা হয়েছিল। এই প্রকারের ধারণা ও অনুমান বিতর্কের ক্ষেত্রে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। খৃস্টান প্রচারকগণ বিভ্রান্তিমূলকভাবে প্রচার করেন যে, কুরআনে যেহেতু ইয়াহূদী-
221

[illegible] ‘‘[illegible]’’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘‘[illegible] [illegible]’’ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বাইবেল বিকৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, বাইবেল বিকৃত। কারণ এ সকল পাণ্ডুলিপির একটির সাথে আরেকটির ব্যাপক অমিল ও বৈপরীত্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে জাল ও ভিত্তিহীন পুস্তকাদি রয়েছে বলে তারাই স্বীকার করেন। এ সকল ‘‘প্রাচীন’’ পান্ডলিপি প্রমাণ করে, তাদের পূর্বসূরীরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে কিভাবে বিকৃত করতেন এবং এগুলির মধ্যে জাল ও বানোয়াট পুস্তকাদি ঢুকাতেন।
উপরের আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাইবেলের উভয় নিয়মের পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও সর্বপ্রকারের বিকৃতি বিদ্যমান। আর এসকল পুস্তকের কোনো সূত্র বা উৎস তাদের নিকট সংরক্ষিত নেই। তাঁরা যা কিছু বলেন সবই আন্দায-অনুমান মাত্র। আর আন্দায-অনুমান দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:
নতুন ও পুরাতন নিয়মে রহিত বিধান
মুসলিমদের সাথে ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিতর্কের অন্যতম বিষয় রহিতকরণ বিষয়। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ তার কোনো বিধান ইচ্ছা করলে রহিত করতে পারেন। এ পরিচ্ছেদে বিষয়টি আলোচনা করা হবে। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ অত্যন্ত আপত্তিসহকারে এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর কোনো বিধান কোনোভাবে রহিত হতে পারে না। এ পরিচ্ছেদে পুরাতন ও নতুন নিয়মের আলোকে আল্লাহর বিধানের রহিত হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হবে।
১. ৪. ১. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ
১. ৪. ১. ১. নাসখ বা রহিতকরণের অর্থ
‘না’ (نسخ (শব্দের সাধারণ অর্থ রহিত করা, সরিয়ে দেওয়া, বাতিল করা, স্থগিত করা, লোপ করা, পরিবর্তন করা (abrogate, abolish, invalidate, repeal, withdraw, annulment)।
আরবী ভাষায় নাসখ শব্দটি মূলত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:
১. বাতিল করা বা অপসারিত করা। বলা হয়: সূর্য ছায়া ‘নাসখ’ করেছে এবং ঝড় পদচিহ্ন ‘না্সখ’ করেছে, অর্থাৎ অপসারিত করেছে। এ অর্থে আল্লাহ বলেন: ‘‘আমি যদি কোনো আয়াত

নাসখ (অপসারিত) করি বা ভুলিয়ে দিই তবে তা থেকে উত্তম অথবা তারই অনুরূপ আনয়ন করি।’’

84

অন্যত্র তিনি বলেন: ‘‘শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা নাসখ (বাতিল বা অপসারিত) করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।’’

85

২. স্থানান্তর ও পরিবর্তন। এ অর্থে বলা হয়: কিতাবটি নাসখ করেছে, অর্থাৎ অনুলিপি তৈরির মাধ্যমে পুস্তকটির বিষয়বস্তু স্থানান্তর করেছে। বলা হয়: মৌমাছি মধু ‘নাসখ’ করেছে, অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছে। এ অর্থে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:
‘‘তোমরা যা কর্ম করতে আমি তা নাসখ (লিপিবদ্ধ) করতাম।’’

86

ইসলামী পরিভাষায় ‘নাসখ’ বা ‘রহিতকরণ’ (abrogation) অর্থ হলো ‘সকল শর্ত পূরণ করেছে এমন কোনো কর্ম বিষয়ক বিধানের পালনীয়তার সময়সীমার সমাপ্তি ঘোষণা করা।’
১. ৪. ১. ২. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণের ক্ষেত্র
ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে এই প্রকারের রহিতকরণ বা ‘কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘোষণা’ শুধু ‘কর্ম বিষয়ক বিধানের’ ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে, কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য, জ্ঞানভিত্তিক তথ্য, গল্প-কাহিনী বা ঘটনার

84 সূরা (২) বাকারা: ১০৬ আয়াত।
85 সূরা (২২) হজ্জ: ৫২ আয়াত।
86 সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ২৯ আয়াত।

বর্ণনায় এই প্রকারের রহিত করণ ঘটতে পারে না। যেমন, ‘এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন’ এই তথ্যটির সত্যতা ও পালনীয়তা চিরন্তন। অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বিষয়কে ‘রহিত’ বা ‘কার্যকরিতা সমাপ্ত’ করা যায় না। যেমন দিনের আলো এবং রাতের অাঁধার। অনুরূপভাবে ‘প্রার্থনা’ বিষয়ক বাক্য রহিত হয় না এবং চিরন্তন সত্যও ‘রহিত’ হয় না। যেমন ‘ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করিও না’। এই প্রকারের চিরন্তন সত্য রহিত হয় না।
যে সকল বিধান প্রদানের সময়েই তা চিরস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল বিধানও রহিত বা স্থগিত হয় না। যেমন নিরপরাধ নারীদেরকে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: ‘‘এবং কখনোই তোমরা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।’’

87 আবার যে সকল
বিধান প্রদান করার সময়েই তাকে অস্থায়ী বা সময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে দুআ বা প্রার্থনা রহিত হয় না।
ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ বা স্থগিতকরণ শুধু সে সকল বিধানের বিষয়ে ঘটতে পারে, যেগুলি কর্ম বিষয়ক, চিরস্থায়ী নয় এবং সাময়িকও নয় এবং যেগুলির বাস্তবায়ন থাকা ও না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা বিরাজমান। এই

87 সূরা নূর: ৪ আয়াত।
226

প্রকারের বিধানগুলিকে ‘উন্মুক্ত বিধান’ বলা হয়।
১. ৪. ১. ৩. রহিতকরণ বনাম মত-পাল্টানো ইয়াহূদী ধর্মে একটি বিশ্বাস আছে যাকে ‘‘আল-বাদা’’ বলা হয়। এর অর্থ কোনো অপ্রকাশিত বিষয় প্রকাশিত হওয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, মহান আল্লাহ কোনো একটি বিষয়ের পরিণাম ও পরিণতি না জেনে বা না বুঝেই সে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেন। এরপর নতুন একটি মত তার কাছে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি পূর্বে বিধান রহিত করে নতুন বিধান প্রদান করেন। এরূপ বিশ্বাসের দ্বারা মহান আল্লাহকে অজ্ঞ বা অপরিণামদর্শী বলে দাবি করা হয়, নাউযূ বিল্লাহ! তিনি এরূপ বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস থেকে অতি পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে। ইসলামী পরিভাষায় ‘রহিতকরণ’ বা ‘স্থগিতকরণ’ এরূপ কিছুই নয়। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ জানতেন যে, এ বিধানটি অমুক সময় পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং এরপর তা স্থগিত হবে। যখন তাঁর জানা সেই সময়টি এসে গেল তখন তিনি নতুন বিধান প্রেরণ করলেন। এ নতুন বিধানের মাধ্যমে সে পূর্বতন বিধানটির আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করতেন। প্রকৃত পক্ষে এ হলো পূর্বতন বিধানের কার্যকরিতার সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া। তবে যেহেতু পূর্বতন বিধানটি প্রদানের সময় এর সময়সীমা উল্লেখ করা হয় নি, সেহেতু, নতুন বিধানটির আগমনকে আমরা আমাদের

227

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যত ‘পরিবর্তন’ বলে মনে করি। এরূপ ‘রহিতকরণ’ যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেও তা তাঁর মহত্ব বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়। এরূপ রহিতকরণের মধ্যে মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষ অনেক সময় এরূপ পরিবর্তনের কল্যাণ বুঝতে পারে, অনেক সময় তা পারে না। তবে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সকল নির্দেশ ও বিধানই মানুষের মঙ্গল অর্জনের জন্য অথবা অমঙ্গল বর্জন বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
মহান আল্লাহই শুধু মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের গোপন বিষয় অবগত আছেন। তিনিই জানেন কখন কোন বিধানের কার্যকরিতা শেষ হওয়া মানুষের জন্য কল্যাণকর। এজন্য একমাত্র তিনিই কোনো বিধান রহিত বা স্থগিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে ‘‘প্রকাশ পাওয়া’’, ‘‘মত পাল্টানো’’ বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ তিনি অনাদি, অনন্ত ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী। কখন কি ঘটবে তা সবই তিনি জানেন। ফলাফল দেখে মতপাল্টনো, বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব, কারণ মানুষের জ্ঞান অতি সীমিত।
১. ৪. ১. ৪. কাহিনী ও ঐতিহাসিক বিবরণ রহিত হয় না

228

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে পাঠক বুঝতে পারছেন যে, কোনো গল্প, কাহিনী বা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ ‘রহিত’ বা ‘স্থগিত’ হয় না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোনো গল্প-কাহিনী আমাদের মতে রহিত নয়। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক মিথ্যা কাহিনী আছে। যেমন:
(১) লোট বা লূত আলাইহিস সালাম মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তার দুই কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তাঁর কন্যাদ্বয় এই ব্যভিচারের মাধ্যমে পিতাকর্তৃক গর্ভধারণ করেন। আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে এই ‘কাহিনী’টি উল্লেখ করা হয়েছে।

88

(২) য্যাকোব (ইয়াকূব আ)-এর পুত্র যিহূদা তাঁর পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ব্যভিচারের ফলে তামর গর্ভবতী হন এবং পেরস ও সেরহ নামে যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে এই ‘কাহিনী’ উল্লেখ করা হয়েছে।

89 দায়ূদ, শলোমন ও
যীশুখৃস্ট সকলেই পেরস নামের এ জারজ সন্তানের বংশধর। মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

90

(৩) দায়ূদ আলাইহিস সালাম ঊরিয়র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এই ব্যভিচারের ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হন।
তখন দায়ূদ সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে

88 আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।
89 আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।
90 মথি ১/৩-১৬।
229

[redacted]

(а) [redacted] **(**[redacted] **г.)** [redacted]

(б) [redacted]

(в) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

পাত্র একই হলে তা রহিত হতে পারে না। কারণ এইরূপ রহিতকরণ আপত্তিকর।
অনুরূপভাবে প্রার্থনার বাক্যাবলিও রহিত হয় না। এজন্য যাবূর বা ‘গীতসংহিতা’ আমাদের দৃষ্টিতে পারভিাষিকভাবে রহিত বা স্থগিত নয়। আমরা কখনোই বলি না যে, গীতসংহিতা বা যাবূরের দ্বারা তোরাহ রহিত হয়েছে এবং ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের আগমনে ‘যাবূর’ রহিত হয়েছে। কারণ যাবূর মূলত প্রার্থনা বা দুআর সমষ্টি, যা রহিত করে না বা রহিত হয় না।
ইসলামে যাবূরসহ পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি ব্যবহার করতে বা সেগুলির উপর নির্ভর করতে নিষেধ বা আপত্তি করার কারণ এ নয় যে, এগুলিতে বর্ণিত সকল প্রার্থনা, কাহিনী... ইত্যাদি সবকিছু রহিত হয়ে গিয়েছে। বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি ব্যবহারে আপত্তির কারণ হলো, এগুলি সত্যই মোশি, দায়ূদ, যীশু প্রমুখ ভাববাদীর প্রদত্ত সঠিক পুস্তক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ সকল পুস্তকের কোনো অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই এবং এগুলিতে সকল প্রকারের বিকৃতি ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।
১. ৪. ২. বাইবেলের পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত বিধানাদি
উপর্যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ উন্মুক্ত কর্মবিষয়ক বিধানাবলি রহিত হতে পারে। আমরা স্বীকার করি যে, তোরাহ ও ইঞ্জিল

হবে। উভয় প্রকারের ‘রহিতকরণ’ই পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় ঘটেছে বলে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। যেহেতু ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈশ্বরের বিধান কখনোই রহিত হতে পারে না, সেহেতু এখানে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য কিছু উদাহরণ পেশ করছি।
১. ৪. ৩. ১. পরবর্তী ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ব্যবস্থার রহিতকরণ
প্রথমে পরবর্তী নবীর শরীয়ত বা ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত বা ব্যবস্থার নাসখ বা রহিতকরণের কিছু উদাহরণ পেশ করছি:
১. ভাই-বোনের বিবাহের বৈধতা রহিত
আদম আলাইহিস সালাম-এর শরীয়তে বা ব্যবস্থায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। তাঁর সন্তানগণ এভাবে বিবাহ-শাদি করতেন।

94

পরে মোশির ব্যবস্থায় ভগ্নিকে বিবাহ করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আপন ভগ্নি, বৈমাত্রেয় ভগ্নি ও বৈপিত্রেয় ভগ্নি সকল প্রকারের ভগ্নিকে বিবাহ করাই নিষিদ্ধ। এরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য এবং এরূপ বিবাহকারী অভিশপ্ত। এরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের

94 বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী অবরাহামের স্ত্রী সারা আবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন। আদিপুস্তক ২০/১২।
233

৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা হউক কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না।’’
লেবীয় ২০/১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের্ আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাকর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে হত্যাকৃত

95 হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয়
অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।’’ দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২: ‘‘যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্থ।’’ এথেকে প্রমাণিত হলো যে, আদম আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থায় (শরীয়তে) ভগিনীকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। তা নাহলে প্রমাণিত হবে যে, সকল আদম-সন্তান ‘ব্যভিচার-তুল্য বিবাহের’ জারজ সন্তান এবং আদমের সন্তানগণ যারা এরূপ বিবাহ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ব্যভিচারী ছিলেন, হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী ছিলেন এবং অভিশপ্ত ছিলেন। সঠিক কথা হলো, এরূপ বিবাহ পূর্বতন ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় বৈধ ছিল, এরপর মোশির ব্যবস্থায় এই বৈধতা ‘রহিত’ করা হয়।

95 বাংলা বাইবেলে এখানে ‘হত্যাকৃত’-এর পরিবর্তে ‘‘উচ্ছিন্ন’’ বলা হয়েছে। আরবীতে ‘হত্যাকৃত’ বলা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ: (and they shall be cut off in the sight of their people)।

২. সকল প্রাণী ভক্ষণের জন্য বৈধ ছিল পরে তা রহিত করা হয়
আদিপুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে নোহের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর বলেন: ‘‘প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে (Every moving thing that liveth shall be meat for you); আমি হরিৎ ওষধির (green herb) ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম।’’
এভাবে আমরা দেখছি যে, নোহ-এর ব্যবস্থায় সকল প্রাণীই সবুজ শাকশব্জি-ফলমুলের মত বৈধ বা হালাল ছিল। পরবর্তীকালে মোশির ব্যবস্থায় অনেক প্রাণীর বৈধতা ‘‘রহিত’’ করে সেগুলি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লেবীয় পুস্তকের ১১/৪-৮ এবং দ্বিতীয় বিবরণের ১৪/৭-৮-এ যে বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বিবরণের ১৪/৭-৮ উদ্ধৃত করছি: ‘‘(৭) কিন্তু যাহারা জাওর কাট, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে এইগুলি ভোজন করিবে না: উষ্ট্র, শশক (hare: খরগোশ) ও শাফন (coney: খরগোশ); কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি; (৮) আর শূকর দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না, তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না।’’

৩. দুবোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ ছিল পরে রহিত করা হয়
যাকোব (ইয়াকূব আ) লেয়া ও রাহেল নামক দু বোনকে বিবাহ করেন। এ দুইজনই ছিলেন তাঁর মামাতো বোন। আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ১৫-৩৫ শ্লোকে বিষয়টি স্পষ্ট বলা হয়েছে। মোশির ব্যবস্থায় দু বোনকে একত্রে বিবাহ করার বৈধতা ‘‘রহিত’’ করা হয়। লেবীয় পুস্তকের ১৮/১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘আর স্ত্রীর সপত্নী হইবার জন্য তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না।’’
যদি যাকোবের ব্যবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ না হতো তা নাহলে প্রমাণিত হবে যে, যাকোবের এ বিবাহদুইটি অবৈধ ছিল এবং এ দুই স্ত্রীর সন্তানগণ সকলেই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান, নাঊযু বিল্লাহ! অধিকাংশ ইস্রায়েলীয় ভাববাদীই যাকোবের এ দুই স্ত্রীর সন্তান।
৪. স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ও অন্যত্র বিবাহ
মোশির ব্যবস্থায় বা শরীয়তে যে কোনো কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন। তালাকপ্রাপ্তা বা পরিত্যক্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য যে কোনো পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিবরণের ২৪ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘(১) কোন পুরুষ কোন

স্ত্রীকে গ্রহণকরিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। (২) আর সে স্ত্রী তাহার বাটী হইতে বাহির হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের ভার্যা হইতে পারে।’’
পক্ষান্তরে যীশুর ব্যবস্থায় একমাত্র ব্যভিচারের অপরাধ ছাড়া কোনো স্বামী তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না বা পরিত্যাগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্য কোনো ব্যক্তি সে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না। এইরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৩১-৩২ শ্লোকে এবং ১৯ অধ্যায়ের ৩-৯ শ্লোকে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মোশির ব্যবস্থার গোঁড়া অনুসারী ফরীশীগণ যীশুর নিকট এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, মোশি যেখানে ত্যাগপত্র বা তালাকনামা দিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান দিয়েছেন, সেখানে আপনি তা নিষেধ করছেন কেন? উত্তরে যীশু বলেন: ‘‘তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ

করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।’’ (মথি ১৯/৮-৯)
যীশুর এ উত্তর থেকে জানা গেল যে, এ বিধানের ক্ষেত্রে দুবার ‘রহিতকরণ’ ঘটেছে। প্রথম যুগে এইরূপ স্ত্রী-পরিত্যাগ অবৈধ ছিল। মোশির ব্যবস্থায় সেই অবৈধতা রহিত করে তা বৈধ করা হয়। পুনরায় যীশুর ব্যবস্থায় মোশির দেওয়া বৈধতা রহিত করা হয়। মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়তে বৈধ বিষয়টি ঈসার আলাইহিস সালাম শরীয়তে ব্যভিচারের মত পাপ বলে গণ্য হয়।
৫. মূসার আলাইহিস সালাম ব্যবস্থার সকল বিধান রহিতকরণ!
ইস্রায়েলীগণের সকল বিধিবিধান তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান। ইস্রায়েল-বংশের সকল নবী বা ভাববাদী এ সকল বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এ সকল বিধানের মধ্যে রয়েছে বৈধ ও অবৈধ বা শুচি ও অশুচি প্রাণী, খাদ্য ও পানীয়ের বিধান। ঈসা আলাইহিস সালাম ইস্রায়েল বংশের একজন নবী বা ভাববাদী। তিনি মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়ত রহিত করেন নি, বরং তিনি তার অনুসারী ছিলেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৫/১৭-১৮ শ্লোকের বর্ণনায় তিনি বলেন: ‘‘(১৭) মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আস নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। (১৮) আমি তোমাদিগকে সত্য
238

কহিতেছি, যে পর্যনত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যনত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।’’ ড. ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander) তার লেখা ‘‘মীযানুল হক্ক’’ (Scale of Truth) গ্রন্থে যীশুর এ বক্তব্যকে ভিত্তি করে বলেছেন যে, তাওরাতের কোনো বিধান নাসখ বা রহিত হতে পারে না। তিনি বলেন যে, যীশু তাওরাতের কোনো বিধান রহিত করেন নি; কারণ তিনি রহিত করতে বা লোপ করতে আগমন করেন নি, বরং পূর্ণ করতে এসেছিলেন।
কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা এই যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থার সকল হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় সাধু পলের (Paul)-এর এক ফতোয়ায় বৈধ ও হালালে পরিণত হয়েছে। সাধু পলের ধর্মে কোনো হারাম বা অবৈধ কিছু নেই। শুধু যারা নিজেরা অপবিত্র তাদের জন্যই হালাল-হারাম বা শুচি-অশুচির ব্যবস্থা। অশুচি বা খারাপ মানুষদের জন্য হালাল বা শুচি ও পবিত্র খাদ্যও অপবিত্র। আর শুচি বা পবিত্র মানুষদের জন্য সকল প্রকার হারাম, অপবিত্র ও অশুচি বিষয়ই হালাল ও পবিত্র। সাধু পলের এ এক মহা-বিস্ময়কর ফতোয়া! রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৪ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবত অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে
239

তাহা অপবিত্র।’’ তীতের প্রতি প্রেরিত পত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে পৌল লিখেছেন: ‘‘শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি (Unto the pure all things are pure); কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; বরং তাহাদের মন ও সংবেদ (বিবেক) উভয়ই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।’’
সাধু পলের এ ফতোয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূসা আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইস্রা্য়েল বংশের সকল নবী- ভাববাদী ও স্বয়ং যীশু কেউই পবিত্র ছিলেন না, একারণে তাঁদের ভাগ্যে এইরূপ ঢালাও বৈধতা জোটে নি। পক্ষান্তরে খৃস্টানগণ যেহেতু ‘পবিত্র’ সেহেতু তাঁরা এইরূপ ঢালাও বৈধতা লাভ করলেন। তাঁদের জন্য সব কিছুই বৈধ ও পবিত্র হয়ে গেল। স্বয়ং যীশু খৃস্টও মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থা রহিত করে সব কিছু হালাল করতে পারলেন না; কারণ তিনি ও তার শিষ্যরা তো পবিত্র বা শুচি হতে পারেন নি। যেহেতু সাধু পল ও তার অনুসারীরা শুচিতা অর্জন করেন সেহেতু তাদের জন্য সকল হারাম ও অপবিত্র খাদ্য ও পানীয় বৈধ ও পবিত্র হয়ে গেল। এভাবে মহামতি সাধু পল মোশির ব্যবস্থা পুরোপুরি রহিত করতে সক্ষম হলেন!
খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল এ ‘ঢালাও বৈধতা’ প্রচারের ক্ষেত্রে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা প্রাণপনে তাঁর অনুসারীদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, মোশির

240

ব্যবস্থা পুরোপুরি রহিত ও বাতিল হয়ে গিয়েছে। এজন্য তিনি তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১-৭ শ্লোকে লিখেছেন: ‘‘(১)... উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও শয়তানদের

96 শিক্ষামালায় মন দিয়া (giving
heed to seducing spirits, and doctrines of devils) বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে।...
(৩) ... এবং বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করে, যাহা ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন, যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যের তত্ত্ব জানে, তাহারা ধন্যবাদ-পূর্ব ভোজন করে (and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth)। (৪) বাস্তবিক ঈশ্বরে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল; ধন্যবাদসহ গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়,
(৫) কেননা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হয়। (৬) এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে করাইয়া দিলে তুমি খৃস্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবে; যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ করিয়া আসিতেছ তাহার বাক্যে পোষিত থাকিবে। (৭) আর ধর্মবিরূপক ও জরাতুর স্ত্রীলোকের যোগ্য গল্পসকল

96 এখানে কেরির বঙ্গানুবাদে ‘‘ভুতগণের’’ লেখা হয়েছে। মূল ইংরেজী (devil)-এর সুপ্রসিদ্ধ অর্থ শয়তান।

অগ্রাহ্য কর (But refuse profane and old wives' fables)।’’

97

৬- মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়তের সকল পর্ব ও দিবস রহিতকরণ
লেবীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে যে সকল সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পর্ব পালনের বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে, মোশির ব্যবস্থা অনুসারে সেগুলি সবই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এই অধ্যায়ের ১৪, ২১, ৩১ ও ৪১ শ্লোকে সুস্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পর্ববিষয়ক বিধানগুলি সর্বত্র ও সর্বদা পালনীয় চিরস্থায়ী বিধান।

98

97 সাধু পলের এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়:
(১) যীশুখৃস্ট ও অন্যান্য ভাববাদিগণ যারা বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করেছেন তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগের শয়তানদের শিক্ষামালা প্রচার করেছেন, (২) বিশ্বাস ও সত্যজ্ঞান থাকলে সকল হারাম খাদ্যই হালাল হয়ে যায়। (৩) সকল হারাম দ্রব্য ঈশ্বরের নাম নিয়ে খাওয়া যাবে এ কথা যত বেশি প্রচার করা যাবে ততবেশি যীশুর উত্তম শিষ্য হওয়া যাবে। (৪) অপবিত্র খাদ্য বর্জনের বিষয়ে যীশু ও অন্যান্য ভাববাদীর শিক্ষা ধর্মবিদ্বেষীয় কথা। আর যীশুখৃস্ট এরূপ ধর্মবিদ্বেষী কথাই বলেছেন, কারণ তিনি বলেছেন: ‘‘কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’’ মথি ৫/১৭-২০।
98 এ সকল শ্লোকে বারংবার বলা হয়েছে: ‘‘ইহা তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।’’

শনিবার (the sabbath of the LORD)-কে সম্মান করা এবং এ দিনে সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখা মোশির ব্যবস্থা অনুসারে একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। কেউ এ দিনে সামান্যতম কর্মও করতে পারবেন না। কেউ যদি এ দিনে কোনো প্রকারের কর্ম করেন তবে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বিভিন্ন স্থানে বারংবার এই বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: আদিপুস্তক ২/৩; যাত্রাপুস্তক ২০/৮-১১, ২৩/১২ ও ৩৪/২১; লেবীয় ১৯/৩ ও ২৩/৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১২-১৫; যিরমিয় ১৭/১৯-২৭; যিশাইয় ৫৬/১-৮ ও ৫৮/১৩-১৪; নহিমিয় ৯/১৪; যিহিষ্কেল ২০/১২-২৪।
এ দিনে সামান্যতম কর্ম করলেই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ৩১/১২-১৭ ও ৩৫/১-৩ শ্লোকে। মূসার আলাইহিস সালাম সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এক শনিবারে এক ব্যক্তিকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে দেখেন। তখন তারা সেই কাষ্ঠসংগ্রহকারীকে আটক করে এবং সদাপ্রভুর নির্দেশে তাকে আবাসিক এলাকার বাইরে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। গণনা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৩২-৩৬ শ্লোকে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।
খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ সাধু পল (পৌল) মহাশয় শনিবার-সহ তাওরাতের সকল পর্ব ও দিবস রহিত ও বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিধান সবই ছিল এক প্রকারের ইঙ্গিত ও ছায়া মাত্র।

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে তিনি লিখেছেন: ‘‘অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্মন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক।’’
ডাওয়ালি ও রজারমেন্ট (G. D'Oyley and R. Mant)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible) কতিপয় খৃস্টান পণ্ডিতের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে তিন প্রকারের পর্ব প্রচলিত ছিল: প্রতি বছর বছর পালিত পর্ব, প্রতি মাসে মাসে পালিত পর্ব ও প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে পালিত পর্ব। এ সকল পর্ব সবই রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি শনিবার সাবাথ বা বিশ্রামদিন পালনও রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে খৃস্টানদের সাবাথ (রবিবার) পালনের ব্যবস্থা করা হয়।’’
৭- খাতনা বা ত্বকচ্ছেদ বিধান রহিতকরণ খতনা বা ত্বক্ছেদ করা (circumcision) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর শরীয়তের একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ৯-১৪ শ্লোকে তা স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। কয়েকটি শ্লোক দেখুন: ‘‘(১২) পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ হইবে। (১৩)... আর তোমাদের মাংসে-বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে (my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant)।’’
244

এজন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে এ বিধান প্রচলিত থাকে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর শরীয়ত বা ব্যবস্থায়ও এ বিধান কার্যকর থাকে। লেবীয় পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘পরে অষ্টম দিনে বালকটির পুরুষাঙ্গের ত্বক্ছেদ হইবে।’’ যীশুরও ত্বক্ছেদ করা হয়েছিল। লূকলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: ‘‘আর যখন বালকটির ত্বকচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল।’’ খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত যীশুর ত্বক্ছেদ দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত প্রার্থনা রয়েছে, যা তাঁরা এই দিবসের স্মরণে পালন করেন।
যীশুর ঊর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত তক্বচ্ছেদ বা খাতনার এ বিধান কার্যকর ছিল। যীশু এ বিধান রহিত করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেরিতগণের যুগে তাঁরা এই ‘চিরন্তন’ বিধানটি রহিত করেন।

99

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল এ বিধানটি রহিত করার বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। গালাতীয় ২/৩-৫, ৫/১-৬, ৬/১১-১৬; ফিলীপিয় ৩/৩; কলসীয় ২/১১ ইত্যাদি স্থানে তিনি বারংবার খাতনা বা তক্বচ্ছেদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং খাতনা করলে

99 প্রেরিতগণের কার্যবিবরণ ১৫ অধ্যায় দেখুন।
245

আর যীশুর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে শুধু গালাতীয় ৫/২ ও ৬ শ্লোক উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন: ‘‘(২) দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খৃস্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না।... (৬) কারণ খৃস্ট যীশুতে ত্বক্ছেদের কোন শক্তি নাই, অত্বকচ্ছেদেরও নাই; কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্যসাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত।’’

100

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের এ চিরস্থায়ী বিধান, যা স্বয়ং যীশুও পালন করেছেন এবং নিষেধ বা রহিত করেন নি, সে বিধানকে সাধু পলের নির্দেশে বাতিল করে দেন এবং রহিত বলে গণ্য করেন।
৮- সাধু পলের দৃষ্টিতে তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের মূল্য:
সাধু পল বারংবার বলেছেন যে, তাওরাত বা পুরাতন নিয়ম বাতিল, অচল, দুর্বল ও নিষ্ফল। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৭ম অধ্যায়েরই ১৮ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ (রহিতকরণ) হইতেছে (For there is verily a disannulling of the commandment going before for the

100 অর্থাৎ, অপবিত্র খাদ্যভক্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদির চেয়েও কঠিন অপরাধ হলো ত্বকছেদ করা। এ সকল অপরাধ করলে কেউ অনুগ্রহ থেকে পতিত হবে না। কিন্তু ত্বকছেদ করলে সে অনুগ্রহ থেকে পতিত হবে এবং খৃস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

weakness and unprofitanleness thereof)।’’
বাইবেলের আরবী অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণের এখানে disannulling বা লোপ-এর অনুবাদে ‘‘নাসখ’’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮২৫, ১৮২৬ সালের আরবী বাইবেলে এ শ্লোকের অনুবাদে বলা হয়েছ: ‘‘পূর্ববতী বিধানের (পুরাতন নিয়মের) দুর্বলতা ও নিষ্ফলতার কারণে তা নাসখ বা রহিত করা হয়েছে।’’
১৬৭১, ১৮২৩ ও ১৮৪৪ সালের আরবী বাইবেলে শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘পূর্ববর্তী নিয়ম বাতিল ও অচল হয়েছে কারণ তার দুর্বল ও তার মধ্যে কোনো ফায়েদা বা উপকার নেই।’’ ১৮৮২ সালের আরবী সংস্করণে বলা হয়েছে: ‘‘পূর্ববর্তী নিয়ম আমরা প্রত্যাখ্যান করি কারণ তার দুর্বলতা ও তার মধ্যে কোনো ফায়দা বা কল্যাণ না থাকা।’’
ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৭ ও ১৩ শ্লোক: ‘‘(৭) কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের চেষ্টা করা যাইত না।... (১৩) ‘নূতন’ বলাতে তিনি প্রথমটি পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত (ready to vanish away)।’’
ইব্রীয়দের পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে সাধু পল বলেন: ‘‘তিনি প্রথম বিষয় লোপ (নাসখ) করিতেছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন।’’

আরবী বাইবেলের কোনো কোনো সংস্করণে এখানে ‘‘নাসখ’’ (রহিত) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
এ সকল বক্তব্যে সাধু পল বারংবার বলেছেন যে, তাওরাত দুর্বল, নিষ্ফল, কল্যাণবিহীন, অচল, ত্রুটিযুক্ত, পুরাতন, জরাজীর্ণ, প্রস্থান-উদ্যত, বিলুপ্ত-প্রায়, প্রায়-অচল, প্রত্যাখ্যাত এবং রহিত।
ডাওয়ালি ও রজারমেন্ট-এর
ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাবেল-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ঈশ্বর নতুন উত্তম বিধানের মাধ্যমে পুরাতন অসম্পূর্ণ বিধানকে রহিত করতে চান। এজন্যই ইয়াহূদীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিধানাবলি বিলোপ করে সেখানে খৃস্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীদের যজ্ঞ ও নৈবেদ্য মুক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য যীশু নিজে মৃত্যু গ্রহণ করে সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করেছেন। তিনি একটি কর্মের মাধ্যমে অপরটি রহিত করেছেন।
উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছি:
১- পরবর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মের কিছু বিধিবিধান রহিত হওয়া শুধু মুসলমানদের দাবি নয় বা ইসলামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয় বরং পূর্ববর্তী

248

ধর্ম ও ব্যবস্থাগুলিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়।
২- তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধানই খৃস্টধর্মে রহিত করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে যে সকল বিধান ‘চিরস্থায়ী’ ও ‘চিরন্তন’ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলিসহ সকল ফরয দায়িত্ব, ইবাদত, শুচি-অশুচি বা হালাল-হারামের বিধান ইত্যাদি সবই সাধু পল রহিত করেছেন। তার অনুসারিগণের জন্য এ সকল বিধান পালনীয় নয় বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

101

৩- খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পলের বক্তব্যের মধ্যে তাওরাতের বিধানাবলির ক্ষেত্রে ‘নাসখ’ বা ‘রহিত করা’ বা ‘বিলোপ করা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী খৃস্টান গবেষক ও ধর্মগুরুগণও এক্ষেত্রে এ সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন।
৪- সাধু পল দাবি করেছেন যে, পুরাতন ব্যবস্থা দুর্বল, নিষ্ফল, কল্যাণবিহীন, অচল, ত্রুটিযুক্ত, পুরাতন, জরাজীর্ণ, প্রস্থান-উদ্যত, বিলুপ্ত-প্রায়, প্রায়-অচল, প্রত্যাখ্যাত এবং রহিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামের ব্যবস্থা দ্বারা ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ব্যবস্থা রহিত ও বিলুপ্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। বরং সাধু পলের বক্তব্য অনুসারে এরূপ বিলোপ

101 উপরন্তু এ সকল বিধান পালন করলে যীশুর দয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মহাপাপের চেয়েও বড় মহাপাপ মূসা (আ)-এর ব্যবস্থা মেনে চলা।
249

সাধন জরুরী। কারণ যীশুর ব্যবস্থাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও জীর্ণ। সর্বোপরি খৃস্টানদের প্রাণপুরুষ পল মহাশয় এবং খৃস্টান ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ তাওরাত সম্পর্কে অনেক অশালীন ও অশোভনীয় মন্তব্য করেছেন, যদিও তাঁরা তাকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন।
উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, কুরআনের বিধান ও ব্যবস্থা দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু বিধান ও ব্যবস্থা রহিত হওয়া কোনো অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ রহিতকরণ, স্থগিতকরণ বা পরিবর্তন পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় ঘটেছে বলে আমরা বাইবেলের আলোকে জানতে পারলাম। কুরআনের বিধান পালনের মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিধান রহিতকরণ কার্যকর হয়।
১. ৪. ৩. ২. একই ভাববাদীর ব্যবস্থায় রহিতকরণ
রহিতকরণের দ্বিতীয় প্রকার হলো, একই নবীর ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিধান রহিত করে অন্য বিধান দেওয়া। এর কতিপয় উদাহরণ দেখুন:
১. জবাই বা বলিদানের নির্দেশ রহিত করা আদিপুস্তকের ২২/১-১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে, ঈশ্বর অব্রাহামকে নির্দেশ দেন ‘ইসহাক’কে

102

102 বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর ইসহাক'কে বলিদান করার নির্দেশ দেন। তবে বাইবেলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, এখানে ‘ইসহাক’ শব্দটি পরিবর্তিত। 250

বলিদান করতে। তাঁরা উভয়ে যখন এ নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত হলেন তখন নির্দেশ কার্যকর করার আগেই তিনি তা রহিত করেন।
২. যিহিষ্কেল ভাববাদীকে দেওয়া বিধান রহিত করা:
যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ১০, ১২, ১৪ ও ১৫ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(১০) তোমার খাদ্য পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা করিয়া ভোজন করিতে হইবে। তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা ভোজন করিবে।... (১২) আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে।... (১৪) তখন আমি কহিলাম, আহা, প্রভু সদাপ্রভু, দেখ, আমার প্রাণ অশুচি হয় নাই; আমি বাল্যকাল অবধি অদ্য পর্যন্ত স্বয়ং-মৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নাই, ঘৃণার্হ মাংস কখনও আমার মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। (১৫) তখন তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটি পাক করিবে।’’

কারণ এখানে বারংবার বলা হয়েছে যে, তোমার একমাত্র পুত্র, তোমার অদ্বিতীয় পুত্র। এই বিশেষণটি শুধু ইশ্মায়েলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ইশ্মায়েলের জন্মের ১৪ বৎসর পরে ইসহাকের জন্ম হয়। কাজেই ইসহাক কখনোই অবরাহামের অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি জন্ম থেকেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আদিপুস্তক ২২/২-১২।
251

এখানে ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়ে রুটি পাক করতে আজ্ঞা করেন। যিহিষ্কেল ভাববাদী অপারগতা প্রকাশ করলে পালন করার পূর্বেই তা রহিত করে মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে গরুর গোবর দিয়ে রুটি পাক করে খেতে নির্দেশ দিলেন।
৩. নির্ধারিত বেদিতে উৎসর্গের নির্দেশ রহিত করা:
লেবীয় পুস্তকের ১৭/১-৬ শ্লোকে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে নির্দেশ দেন যে, সকল প্রকার জবাই-কুরবানী হবে ‘‘সমাগম-তাম্বুর দ্বারে’ নির্ধারিত স্থানে। যে ব্যক্তি অন্য কোনো স্থানে জবাই করবে তাকে উচ্ছিন্ন অর্থাৎ হত্যা করতে হবে।

103

এরপর দ্বিতীয় বিবরণের এ নির্দেশ রহিত করা হয় এবং তাদেরকে যে কোনো স্থানে জবাই-কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

104

103 ‘‘ইস্রায়েল-কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ হনন করে, কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগম-তাম্বর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার উপর রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।’’ লেবীয় ১৭/৩-৪। 104 ‘‘১৫ তথাপি যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হইবে, তখন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্বাদানুসারে আপনার সমস্ত নগর-দ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারিবে... ২০ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যখন তোমার সীমা বিস্তার করিবেন, এবং মাংস ভক্ষণে তোমার 252

হর্ন তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উপর্যুক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করার পর বলেন: এ দুই স্থানের মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু যদি এ কথা লক্ষ্য করা হয় যে, মোশির ব্যবস্থা অপরীবর্তনীয় ও স্থির ছিল না; বরং ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থা অনুসারে তার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন করা হতো, তবে এই বৈপরীত্যের সমাধান দেওয়া খুবই সহজ হবে। মিসর ত্যাগের ৪০তম বৎসরে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের পূর্বে মোশি পূর্বোক্ত বিধানটি, অর্থাৎ লেবীয় পুস্তকের বিধানটি সুস্পষ্টরূপে রহিত করেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেখানে ইচ্ছা গোরু, মেষ ইত্যাদি বধ করতে পারবে এবং ভক্ষণ করতে পারবে।
এভাবে তিনি মূসার আলাইহিস সালাম ব্যবস্থায় নাসখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করলেন। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, মোশির ব্যবস্থার

প্রাণের অভিলাষ হইলে তুমি বলিবে, মাংস ভক্ষণ করিব, তখন তুমি প্রাণের অভিলাষানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবে। ২১ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা যদি তোমা হইতে বহু দূর হয়, তবে আমি যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি সদাপ্রভুর দত্ত গোমেষাদি পাল হইতে পশু লইয়া বধ করিবে, ও আপন প্রাণের অভিলাষানুসারে নগর-দ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবে। যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, তেমনি তাহা ভক্ষণ করিবে; অশুচি কি শুচি লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে।’’ দ্বিতীয় বিবরণের ১২/১৫-২১।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রথম বিধানের ফলাফল জানার পরে মত পাল্টানোর কথা উল্লেখ করেছেন।
৪- লেবীয়দের সেবাদানের বয়সসীমার পরিবর্তন
গণনাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩, ২৩, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ও ৪৬ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাগম তাম্বুর (tabernacle of the congregation) কর্মচারীর বয়স কোনো মতেই ত্রিশের কম এবং পঞ্চাশের বেশি হবে না (ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত)।
পক্ষান্তরে এই পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তাদের বয়স ২৫ বৎসরের কম হবে না এবং ৫০ বৎসরের বেশি হবে না (লেবীয়দের বিষয়ে এই ব্যবস্থা: পঁচিশ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়েরা সমাগম তাবুতে সেবাকর্ম করিবার জন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে..)।
একই পুস্তকে দু প্রকারের বিধান। এখানে ইয়াহূদী-খৃস্টানগণকে দুটি বিষয়ের একটি স্বীকার করতেই হবে। হয় একে ভুল ও বৈপরীত্য মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হবে যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। অথবা একে ‘‘নাসখ’’ বা রহিতকরণ বলে মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হবে যে, একই ভাববাদীর ব্যবস্থায় বিবর্তন ও রহিতকরণ ঘটতে পারে।
৫- হিষ্কিয়ের বয়স বিষয়ক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও রহিতকরণ

২ রাজাবলির ২০/১-৬ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যিশাইয় ভাববাদীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয়কে তার আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবেন, যেন রাজা তার পরিবারকে মৃত্যুকালীন ওসীয়ত করতে পারেন। আয়ু শেষ হওয়ার খবর পেয়ে রাজা হিষ্কিয় অনেক কাঁদাকাটি ও প্রার্থনা করেন। এতে আল্লাহ তার আয়ুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টে তার আয়ু বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যিশাইয় ভাববাদী ফিরে নগরের মধ্যস্থানে পৌঁছানোর আগেই তাকে নির্দেশ দেন বিষয়টি রাজাকে জানিয়ে দিয়ে তিনি যেন রাজাকে বলেন, আল্লাহ বলেছেন: ‘‘আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবে। আর আমি তোমার আয়ূ পনের বৎসর বৃদ্ধি করিব...।’’
এখানে ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীর মুখে হিষ্কিয় রাজাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা কর; কারণ তুমি মারা যাচ্ছ। এরপর যিশাইয় ভাববাদী এই আজ্ঞা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তাঁর নিজ বাড়ি পৌঁছানোর আগেই তিনি তাঁর এই আজ্ঞা রহিত করলেন এবং হিষ্কিয়ের আয়ু পনের বৎসর বৃদ্ধি করলেন। রহিত বিধান ও রহিতকারী নতুন বিধান উভয়ই একই ভাববাদীর দ্বারা প্রচার করা হলো।
৬- যীশুর ধর্ম শুধু ইস্রায়েলীদের জন্য না সকলের জন্য

মথিলিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে: ‘‘(৫) এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- (৬) তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।’’ মথিলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন: ‘‘ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।’’
এ সকল শ্লোকের নির্দেশনা অনুসারে যীশু খৃস্টের মিশন ছিল শুধু ইস্রায়েল সন্তানদের জন্যই, আর কারো জন্য নয়। কিন্তু মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে যীশুর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: ‘‘তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।’’ এখানে হয় বৈপরীত্য, নয় রহিতকরণ স্বীকার করতে হবে। খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, দ্বিতীয় বক্তব্যটি যীশুর ধর্মের সার্বজনীনতা প্রমাণ করে। তাহলে মানতে হবে যে, প্রথম নির্দেশটি ‘নাসখ’ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। প্রথমে যীশু তার ধর্মকে শুধু ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট করলেন এবং অন্য কাউকে দীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। এরপর এ নির্দেশ রহিত করে সবাইকে দীক্ষা দিতে নির্দেশ দিলেন।
এখন তাঁরা যদি আল্লাহর নির্দেশের পরিবর্তন ও রহিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার

257

সম্ভব এবং অন্য সময়ে অন্য মানুষদের জন্য অসম্ভব হতে পারে। কোনো কোনো আজ্ঞা কিছু মানুষের জন্য পালনযোগ্য ও অন্যদের জন্য পালনের অযোগ্য হতে পারে। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে তা মানুষ অনেক সময় পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে না, বরং মহান আল্লাহই তা ভাল জানেন।
ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ আল্লাহর বিধানের নাসখ, রহিতকরণ বা পরিবর্তন অসম্ভব বলে যে দাবি করেন তা তাদের ধর্মগ্রন্থের আলোকেই ভিত্তিহীন ও সত্যের বিপরীত বলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

এ অধ্যায়ে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

ভূমিকা : কতিপয় প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও তথ্য
প্রথম পরিচ্ছেদ: বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যীশুখৃস্টের বক্তব্য দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণাদি খণ্ডন

ভূমিকা:
কতিপয় প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও তথ্য
মানবীয় জ্ঞান, বিবেক ও বাইবেলের আলোকে ত্রিত্ববাদ

106 আলোচনার পূর্বে ভুমিকায়
কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছি। এ বিষয়গুলি

106 (Trinity) বা ত্রিত্ববাদ-এর সাধারণ অর্থ ‘তিনত্ব’, তিনের সমাহার বা তিনের সমস্টি (a group of three closely related persons or things)। খৃস্টধমের পরিভাষায় এর অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন।
খৃস্টান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এ অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তখনো এ পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খৃস্টীয় শতকগুলিতে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ

পাঠককে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে।
১ম বিষয়: পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি বারংবার ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ বা ঈশ্বর এক, একক, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, স্ত্রী- সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র, অমরণশীল, সর্বময়

ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহূদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তাঁরা সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভু হিসাবে পূজা করতেন। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে ‘প্রজ্ঞা’ (Logos)-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো। পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খৃস্টান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে ‘যীশুর’ ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এ বিশ্বাসের সাথে ‘একত্ববাদে’র সমন্বয় এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ। এখানে পাঠকের জন্য ‘এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায়’ ত্রিত্ববাদ’ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি:
Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Old Testament: "Hear, OIsrael: The Lord our God is one Lord" (Deuteronomy 6:4). The earliest Christians, however, had to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the presumed presence and power of God among them, i.e, the Holy Spirit, whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in

[illegible]

such New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:19); and in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all" (2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. Initially, both the requirements of monotheism inherited from the Old Testament and the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until the 4th century that the distinctness ofthe

এগুলির জন্য উদ্ধৃতি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা নিষ্প্রয়োজন।
২য় বিষয়: আল্লাহ বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা বা পূজা করা নিষিদ্ধ। তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বারংবার বলা হয়েছে। যেমন, যাত্রাপুস্তকের ২০/৩, ৪, ৫, ২৩; ৩৪/১৪, ১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭ ইত্যাদি।
তাওরাতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা আরাধনার কথা প্রচার করে বা এরূপ করতে আহবান করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে, তিনি যদি মহা মহা অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার অধিকারী নবীও হন। অনুরূপভাবে তাওরাতে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করে বা এরূপ করতে কাউকে উদ্বুদ্ধ করে বা অনুপ্রেরণা দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এরূপ ব্যক্তি নারী হোক আর পুরুষ হোক, আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক বা বন্ধু হোক সর্বাবস্থায় তাকে এভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।

107

তৃতীয় বিষয়: তোরাহ-এর বিভিন্ন শ্লোক থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কোনো তুলনীয় নেই এবং তিনি কোনো সৃষ্টির মত নন। দ্বিতীয়

three and their unity were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons.....

107 দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭।

বিবরণের ৪র্থ অধ্যায়ের ১২ ও ১৫ শ্লোক নিম্নরূপ: ‘‘(১২) তখন অগ্নির মধ্য হইতে সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কথা কহিলেন; তোমরা বাক্যের রব শুনিতেছিলে, কিন্তু কোনো মুর্তি দেখিতে পাইলে না, কেবল রব হইতেছিল। ... (১৫) যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিন তোমরা কোন মুর্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও।’’ নতুন নিয়মের অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই।’’
তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র ৬/১৬ শ্লোক: ‘‘যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।’’
যোহনের প্রথম পত্র ৪/১২: ‘‘ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই।’’
এ সকল শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঈশ্বরের কোনো তুলনা বা নমুনা নেই। সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। তাকে পৃথিবীতে দেখা যায় না। যাকে দেখা যায় তিনি কখনোই ঈশ্বর হতে পারেন না, যদিও ঈশ্বরের বাক্যে, ভাববাদিগণের বাক্যে বা প্রেরিতগণের বাক্যে তাঁর বিষয়ে ‘ঈশ্বর’, ‘প্রভু’ বা অনুরূপ কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়। কাজেই কারো বিষয়ে শুধু ‘ঈশ্বর’ (God),
265

সদাপ্রভু (Lord), উপাস্য (god) বা অনুরূপ কোনো শব্দের প্রয়োগ দেখেই ধোঁকাগ্রস্থ হয়ে তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করা যায় না। কারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও বাইবেলের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক প্রয়োগকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা জরুরী। বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে অগণিত স্থানে ফিরিশতা, ঈশ্বরের দূত, মূসা আলাইহিস সালাম, ভাববাদী, ইস্রায়েল-বংশীয় বিচারকর্তৃগণ, ভাল মানুষ, সাধারণ মানুষ, এমনকি শয়তানকে ‘‘ঈশ্বর’’ বা উপাস্য বলা হয়েছে।

108

ঈশ্বর
ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে যখন ঈশ্বর শব্দের

108 সামান্য কয়েকটি নমুনা দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৭/১ ‘‘তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বর করিয়া (I have made thee a god to Pharaoh) (বাংলা বাইবেলে: ‘‘ঈশ্বর স্বরূপ করিয়া’’, আসলে ‘‘স্বরূপ’’ শব্দটি অতিরিক্ত) নিযুক্ত করিলাম; আর তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে।’’ এখানে মোশিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। গীতসংহিতা ৮২/৬: ‘আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের (মহান ঈশ্বরের) সন্তান (I have said, Ye are gods; and all of you are children of the Most High)।’’ এখানে শুধু বিশেষ মানুষদেরকেই নয় গড়ভাবে সাধারণ মানুষদেরকে ‘‘ঈশ্বর’’ ও ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ করিন্থীয় ৪/৪ ‘‘তাহাদের মধ্যে এই যুগের ঈশ্বর (god of this world: এখানে বাংলা বাইবেলে ও ‘ইঞ্জিলে (god) অর্থ ‘দেব’ বা ‘দেবতা’ বলা হয়েছে; অথচ অন্যান্য স্থানে God ও god : আল্লাহ এবং ইলাহ উভয়ের অর্থই ‘ঈশ্বর’ লেখা হয়েছে) অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খৃস্ট তাঁহার গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।’’

প্রয়োগ করা হয় তখন এরূপ ব্যবহারের পিছনে নির্ধারিত কোনো কারণ বা সূত্র থাকে। মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করলে শ্রোতা বা পাঠক সে সূত্র অনুধাবন করতে পারেন। কাজেই ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে ‘‘ঈশ্বর’’ বা অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখে বাইবেলের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা ও মানবীয় জ্ঞান-বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে প্রকৃত ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অংশ বা উপাস্য বলে দাবি করা কোনো বিবেকবান সজ্ঞান মানুষের জন্য সম্ভব নয়। চতুর্থ বিষয়: কোনো নবী বা ভাববাদী কখনো ‘‘ত্রিত্ববাদ’’ প্রচার করেন নি, ত্রিত্ববাদের পক্ষে কিছু বলেন নি এবং কোনো আসমানী গ্রন্থে এ বিষয়ক কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। তাওরাত বা মোশির ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যে ত্রিতত্ত্ববাদের অস্তিত্ব নেই তা সকলেই জানেন। এজন্য কোনো পৃথক প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই। যে কেউ প্রচলিত তোরাহ পাঠ করলেই দেখবেন যে, এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে, অস্পষ্টভাবে, ইশারা- ইঙ্গিতে বা কোনোভাবে ত্রিত্ববাদের কথা উল্লেখ করা হয় নি। মূসা আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ইয়াহূদী আলিম, পণ্ডিত বা ধর্মগুরু ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস স্বীকার করতে বা এরূপ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে বলে কখনোই স্বীকার করবেন না।

ও অপূর্ণ, সেই বিষয়গুলি মোশি ও সকল ভাববাদী কত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন, একবার বলে আবার বললেন, বারংবার বিভিন্ন ভাবে বুঝালেন, সেগুলি মেনে চলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন, সেগুলি অমান্যকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান দিলেন.... অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্তির উৎসটির বিষয়ে কিছুই বললেন না!!
এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, স্বয়ং যীশু তাঁর ঊর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত কখনোই এই ‘বিশ্বাস’টিকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বললেন না। তিনি কখনোই বললেন না যে, ‘‘ঈশ্বর তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও সত্তা (three hypostases or three concrete realities): পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তন্মধ্যে পুত্র সত্তা আমার দেহের সাথে অমুকভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে। অথবা পুত্র সত্তাটি আমার দেহের সাথে এমন একভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে যার নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদের জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। কাজেই তোমরা জেনে রাখ যে, উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমিই ঈশ্বর।’’ অথবা এই অর্থে এমন কোনো কথা বললেন না যাতে অন্তত এ বিশ্বাসটি স্পষ্টরূপে জানা যেত। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ ত্রিত্বের পক্ষের তাঁর কোনো স্পষ্ট বাক্য পেশ করতে পারেন না। শুধু কয়েকটি দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট বাক্যই তাঁদের সম্বল।

‘□□□□□□□□ □□□□’ (Scale of Truth) □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □. □□□□□□□□ (Carl Gottaleb Pfander) □□□□□ ‘□□□□□□□□□ □□□□□□’ (□□□□□□□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□: ‘‘□□□□□ □□□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□? □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□, ‘□□□□□ □□□□□□’?’’...

□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□: ‘‘□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□: ‘‘□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□ (the Spirit of truth : □□-□□□□□, □□-□□□□□□) □□□□ □□□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□; □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□’’[109]

---

[109] □□□□□ □□/□□-□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□)-□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□

এরপর তিনি বলেন: ‘‘ইয়াহূদী ধর্মের নেতৃবৃন্দ অনেকবারই তাঁকে গ্রেফতার করতে ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চেয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা তাঁদের সামনে একান্তই ধাঁধার আকারে পেশ করেছিলেন।’’ পাদরী সাহেবের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, দুইটি কারণে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা স্পষ্ট করে জানান নি:
প্রথমত, তাঁর ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে কেউ তা বুঝতে সক্ষম ছিল না।
দ্বিতীয়ত, ইয়াহূদীদের ভয়।
দুইটি ওজরই অত্যন্ত দুর্বল ও একান্তই অবাস্তব ব্যাখ্যা।
প্রথম বিষয়টি একেবারেই বাতিল। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর এতটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল যে, ‘‘আমার দেহের সাথে ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ত্বা (পুত্রের সত্তার) সম্মিলন ও সংমিশ্রণের বিষয়টি বুঝা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। কাজেই তোমরা এ বিষয়ে গবেষণা বাদ দেও। তোমরা শুধু বিশ্বাস কর যে, আমি এ মানবীয় দেহের হিসাবে ঈশ্বর নই; বরং উপর্যুক্ত সম্মিলনের ও সংমিশ্রণের ভিত্তিতে আমি ঈশ্বর।’’

110

আত্মার’ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।...
110 এ কথাগুলি তিনি নিজে মুখে বললে তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়টি বুঝা কতই না সহজ হতো! হাজার বছর ধরে তাঁর অনুসারীদের আর ঝগড়া ও দলাদলি করতে হতো না!! তিনি কত কথা বললেন! কত অপ্রয়োজনীয় (!) কথা বললেন, যেগুলি সব তাঁর শিষ্যরা ‘রহিত’ করে দিলেন! ধার্মিকতার বিষয়ে কত কথা বললেন, যেগুলি মূলত পাপমোচন ও মুক্তির জন্য 271

এছাড়া তাঁর সাথে ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক বুঝার অক্ষমতা তাঁর ঊর্ধ্বারোহণের পরে দূরীভূত হয়েছে বলে যে দাবি তিনি করেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়টি বুঝার অক্ষমতা এর পরেও একইভাবে বিদ্যমান। আজ পর্যন্ত একজন খৃস্টান পণ্ডিতও এ সম্পর্ক ও একত্ববাদের সাথে এর সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। যে যা বলেছেন সবই আন্দাযে ঢিল ছুঁড়েছেন। প্রত্যেকের কথার মধ্যেই কঠিন সমস্যা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সর্বদা তাঁরা একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন। এজন্যই প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণ এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। মি. ফান্ডারও তাঁর পুস্তকাদিতে বিভিন্ন স্থানে স্বীকার করেছেন যে, এ বিষয়টি একটি গূঢ় রহস্য যা জ্ঞান দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়।

111

অপ্রয়োজনীয়। কত কথা তিনি বললেন, যা শিষ্যগণ না বুঝলে আবার বুঝিয়ে দিলেন।... অথচ যে বিষয়টির উপর পাপমোচন ও মুক্তি নির্ভর করছে, সেই বিষয়টি তিনি একেবারেই বুঝালেন না।... তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য, অথচ যে বিশ্বাস দিয়ে পাপ মোচন হবে সে বিশ্বাসের কথাটি বুঝালেন না! 111 ত্রিত্বের সাথে একত্বের সমন্বয় ও খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে মনুষ্যত্বের সমন্বয়ের দাবিটি একটি অযৌক্তিক ও বুদ্ধিবিরোধী বিষয়। ফলে খৃস্টানগণ কখনোই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। খৃস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস ও অগণিত যাজকীয় সম্মেলনের (ecumenical council) বিবরণ পাঠ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ‘অবতারবাদ’ বা মানুষরূপে ঈশ্বরের (God incarnate)

দ্বিতীয় ওযরটিও একইভাবে বাতিল। কেন যীশু খৃস্ট ধাঁধার আকারে তার ঈশ্বরত্বের কথা বলবেন? কেন তিনি ইয়াহূদীদেরকে ভয় পাবেন? খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁর আগমনের তো একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ক্রুশে চড়ে প্রাণ দিয়ে সৃষ্টির পাপ মোচন।

আগমন বিষয়ক ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দুধর্মেও এই বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে খৃস্টানদের মত বিপদে কেউ পড়েন নি। হিন্দুরা খুবই সহজভাবে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ঈশ্বর মানুষ রূপে এসেছিলেন.... ইত্যাদি। আবার খৃস্টানরা খৃস্টকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের খুবই বেগ পেতে হয়। মূলত পুরাতন নিয়মের একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের সাথে এই অবতার বাদের সমন্বয় করতে যেয়েই এই বিপদ। এর পাশাপাশি নতুন নিয়মের কিছু কথাও তাঁদেরকে বিপদে ফেলেছে। ৪টি বিষয় তাঁদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছে: (১) ঈশ্বরকে তিনটি পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্রময় সত্তায় বিভক্ত করা, (২) আবার এই তিনটি স্বতন্ত্র সত্তাকে এক বলে দাবি করা, (৩) এই তিনের একজন খৃস্টের মধ্যে আবার পৃথক দুইটি সত্তার অস্তিত্ব দাবি করা এবং (৪) এই ঈশ্বর মানব জাতির পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে দাবি করা। এই ৪টি বিষয়ের সমন্বিত ব্যাখ্যা তাঁদের জন্য এত কঠিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে একজনের ব্যাখ্যার সাথে অন্যজনের ব্যাখ্যা মিলে না। প্রাচীন যুগ থেকে অগণিত খৃস্টান ধর্মগুরু ও পন্ডিতের মতামত পাঠ করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। খৃস্টধর্মের অগণিত দল উপদলও মূলত এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই জন্মেছিল। কোনো খৃস্টানই এই তিনটি বিষয়ের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: Encyclopaedia Britannica, articles: Chalcedon, Council of; Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian, Monarchianism; Paul Of Samosata, etc.

(an irrational truth found in revelation)[illegible] (Trinity) [illegible]

পারছেন না, যে কথাটি বিশ্বাস করার উপরে মুক্তি ও পূর্ণতা নির্ভর করছে। অথচ সেই ঈশ্বরেরই সৃষ্ট ভাববাদিগণ, যেমন যিরমিয়, যিশাইয়, যোহন, এরা তাঁদের সামনে সত্য বলতে ভয় পাচ্ছেন না। তাঁদেরকে কঠিন ভাবে যন্ত্রণা ও শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। কাউকে আবার হত্যাও করা হচ্ছে! কিন্তু তাঁরা সত্য প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন না। এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, খৃস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিশ্বাসটি সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদেরকে ভয় পাচ্ছেন। অথচ সৎকার্যে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার বিষয়ে তাঁদেরকে কঠোরতার সাথে সত্য কথা বললেন। এমনকি সে বিষয়ে তাঁদেরকে গালাগালি করলেন। তিনি ইয়াহূদী অধ্যাপক ও ফরীশীগণকে মুখোমুখি সম্বোধন করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের গালি দিয়েছেন ও তাদের অনাচার মানুষদের সামনে প্রকাশ করে দেন। এমনকি তাঁদের একজন তাঁকে অভিযোগ করে বলেন যে, ‘‘হে গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন।’’ মথি ২৩/১৩-৩৭ ও লূক ১১/৩৭-৫৪-এ সকল বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

112

এর পরেও কিভাবে মনে করা যায় যে, খৃস্ট ইয়াহূদীদের ভয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ বিশ্বাসটি স্পষ্ট করে বলেন নি? কখনোই তা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না, কখনোই না।

112 মথি ২৩/১৩-৩৭; লূক ১১/৩৭-৫২।
275

প্রথম পরিচ্ছেদ: বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত, বাস্তব ও আক্ষরিক সত্য, কোনোটিই রূপক বা আপেক্ষিক নয়। আর মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ও বিজ্ঞান কখনোই প্রকৃত ‘একত্ব’ ও প্রকৃত ‘বহুত্ব’কে একত্রিত বলে স্বীকার করতে পারে না। কোনো কিছু প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থে ‘‘তিন’’ বলে প্রমাণিত হওয়ার অর্থ তা প্রকৃত ও আক্ষরিকভাবে ‘‘একাধিক’’ বলে প্রমাণিত। আর যা প্রকৃত ‘‘একাধিক’’ তা কখনোই প্রকৃত ‘‘এক’’ হতে পারে না। একই বিষয়ে প্রকৃত ‘একাধিক্য’- এর সাথে প্রকৃত ‘একত্ব’ একত্রিত হওয়ার দাবি করলে ‘দুইটি প্রকৃত সাংঘষিক বিষয়’ একত্রিত হওয়ার দাবি করা হবে। যা একেবারেরই অসম্ভব ও অবান্তর।
কাজেই যিনি ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনটি ব্যক্তি বা সত্ত্বা (three persons) বলে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই প্রকৃত একত্বে- অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতই এক ব্যক্তি বা সত্ত্বা বলে বিশ্বাস করতে পারেন না।
যা প্রকৃত ‘এক’ তার পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে না। কিন্তু ‘তিন’-এর একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, তা হলো ‘এক’। তিন হলো ‘তিনটি এক’-এর সমষ্টি।

‘প্রকৃত এক’ কখনো একাধিক ‘এক’ এর সমষ্টি হতে পারে না।
প্রকৃত ‘এক’ তিন-এর একটি অংশ। যদি একই বস্তু একই সময়ে ‘তিন’ ও ‘এক’ হয় তবে বুঝতে হবে যে, বস্তুটি একই সময়ে নিজেই পূর্ণ এবং নিজেই নিজের অংশ। একত্ব ও ত্রিত্বের একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো ‘এক’ নিজেই নিজের এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন ‘এক’-এর এক তৃতীয়াংশ। আবার তিন নিজেই নিজের তিনগুণ এবং এক নিজেই নিজের তিনগুণ। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক এরূপ চিন্তাকে পাগলের প্রলাপ বলে গণ্য করবে।

113

113 খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাঁদের ধর্ম পুরাতন নিয়মের ধর্মের শিক্ষা থেকে গৃহীত। কিন্তু এই দাবিটি একটি অন্তঃসারশূণ্য মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। পুরাতন নিয়মের ‘‘মাসীহ’’, ‘‘বাক্য’’ ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের বিকৃত অর্থ ছাড়া পুরাতন নিয়মের কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচারই প্রচলিত খৃস্টধর্মে নেই। খৃস্টধর্মের ভিত্তি হলো গ্রীক দর্শন ভিত্তিক রোমান প্যাগান ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ভারতে আগমণের পরে সম্রাট আকবর হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে ‘ইসলাম’ ধর্মকে ‘সাইজ’ করে নতুন ধর্ম তৈরির চেষ্টা করেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু একই চেষ্টায় পৌল ও তাঁর সহকর্মিগণ সফল হয়েছিলেন। গ্রীক লগস (logos) শব্দটির অর্থ ‘জ্ঞান’, ‘বিবেক’, ‘পরিকল্পনা’ ‘বাক্য’ ইত্যাদি (word, reason, plan)। গ্রীক দর্শনে ও রোমান পৌত্তলিক ধর্মে এই ‘লগস’ শব্দটিকে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ এবং সৃষ্টির উৎস মনে করা হতো। এছাড়া মানুষের মধ্যে ‘বিবেক’ বা ‘জ্ঞান’-কেও ঐশ্বরিক শক্তি বলে বিশ্বাস করা হতো। এর পৌত্তলিক ব্যবহারও ছিল। শব্দটির প্রতি এই পৌত্তলিক ভক্তি ও গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ‘খৃস্টকে’

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ‘‘প্রকৃত ত্রিত্ব’’ কখনোই সম্ভব নয়। এজন্য যদি খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর ত্রিত্ববোধক কোনো কথা পাওয়া যায় তাহলে তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন তা বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্য ও মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। জর্জ সেল (George Sale) অষ্টাদশ শতকের একজন খৃস্টান পণ্ডিত। তিনি ইংরেজি ভাষায় কুরআন কারীমের অনুবাদ করেন ১৭৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি খৃস্টান প্রচারক ও পাদরিদেরকে মুসলিমদের বিষয়ে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দান করেন। এতে তিনি বলেন: ‘‘আপনারা মুসলমানদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি-বিরোধী ধর্মীয় বিষয়গুলি শেখাবেন না। কারণ তারা এমন বোকা নয় যে, এ সকল জ্ঞান বিরোধী বিষয় আমরা তাদেরকে গেলাতে পারব। যেমন মুর্তি বা প্রতিকৃতির উপাসনা

114

, প্রভুর নৈশভোজ

মুর্তিমান লগস বলে প্রচার করা হয়। বলা হয় ‘বাক্য মাংস হলেন’। বিস্তারিত দেখুন: Encyclopaedia Britannica, articles: Logos; Incarnation. বাক্যের দেহ গ্রহণ যদি জিন, ভুত বা ফিরিশতার দেহ গ্রহণের মত কিছু বলে তাঁরা দাবি করতেন, তবে তাঁদের সমস্যা কম হতো। তাঁরা দাবি করেন যে, যীশুর মানবীয় সত্তার সাথে বাক্যের ঈশ্বরীয় সত্তা মিশ্রিত হয়। এ মিশ্রণের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তাঁরা কোনো দিনই দিতে পারেন নি।
114 খৃস্টানগণ উপাসনায় বা প্রার্থনায় যীশু, মেরি, ক্রশ ইত্যাদির প্রতিমুতির (icon) পুজা করেন, এগুলির 278

(Eucharist/Holy Communion/ Lord's Supper)

115 ইত্যাদি বিষয়। এ সকল বিষয় গ্রহণ
করতে তাদের খুবই অসুবিধা হয়। যে সকল চার্চে বা ধর্মমতে এ ধরনের বিষয় রয়েছে সেগুলি কখনো মুসলমানদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না।’’
এখানে এ খৃস্টান পণ্ডিত স্বীকার করছেন যে, প্রতিকৃতি উপাসনা এবং প্রভুর নৈশভোজ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি ‘জ্ঞান বিরোধী’।

116

প্রকৃত সত্য কথা হলো, এই সকল বিষয় যারা বিশ্বাস করেন তারা নিঃসন্দেহে একত্ববাদের ছায়া থেকে বঞ্চিত এবং বহু-ঈশ্বরবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহিমাময় আল্লাহ

উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান ও প্রার্থনা করেন, যদিও বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মুর্তি, প্রতিমা ও প্রতিকৃতির পূজা-অর্চনা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
115 খৃস্টধর্মের মূল ‘ইবাদত’ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে খৃস্টানগণ রুটি ও মদ গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে পাদরি প্রার্থনার সাথে সাথে প্রত্যেকের হাতের রুটির টুকরা ও মদ প্রকৃত অর্থে যীশু খৃস্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। তারা আক্ষরিকভাবে ও প্রকৃত অর্থে যীশুর মাংস ভক্ষণ করেন ও রক্ত পান করেন। এভাবে যীশুর রক্ত-মাংস পানাহারের মাধ্যমে তারা অনন্ত জীবন লাভ করেন।
116 তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এত স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ জ্ঞান-বিরোধী কুসংস্কারের ও বিশ্বাসের প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এজন্য তাঁরা এ প্রকারের বিষয় মানতে পারেন না।
279

তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। প্রকৃত সত্য কথা হলো, পৃথিবীতে এত বেশি অবান্তর, অবাস্তব ও বুদ্ধিবিবেক বিরোধী ধর্ম বিশ্বাস আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা ধর্মবিশ্বাস হিসেবে ও তাঁর প্রমাণে যে সকল কথা বলেন এগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক অসচ্ছত ও মানবীয় জ্ঞানের সার্থে সাংঘর্ষিকতা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে সুস্পষ্ট।

117

117 খৃস্টধর্মের মূল বিষয়: ত্রিত্ববাদ (Trinity), মূল পাপ (Original Sin) ও প্রায়শ্চিতবাদ (Atonement), নৈশভোজ, ইত্যাদি। ত্রিত্ববাদ ও নৈশভোজের কথা পাঠক জনলেন। মূলপাপ ও প্রায়শ্চিতবাদের মূল কথা হলো, আদমের ফল ভক্ষণের কারণে সকল মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এ পাপের জন্য সকল মানব সন্তানকে জাহান্নামে যেতেই হবে। প্রায়শ্চিত্ব হিসেবে কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু পাপী নিজে বা পাপীর সন্তানগণ প্রায়শ্চিত করলে বা কুরবানী দিলে হবে না। নিষ্পাপকে পাপীর জন্য কুরবানী দিতে হবে। ঈশ্বর মানুষের এ পতনে বেদনাতুর হন। মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার আর কোনো পথ না পেয়ে তিনি নিজের পুত্র সত্ত্বাকে মানুষরূপে পৃথিবীতে পাঠান। মানুষরূপী ঈশ্বর মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত হিসেবে নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। জাহান্নাম বা নরকের চাবী শয়তানের হাতে থাকে। মৃত্যুর দরজা পার না হয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। ঈশ্বর স্বয়ং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে মৃত্যুর দরজা পার হয়ে নরকে গমন করেন এবং তিন দিন নরক-শাস্তি ভোগ করার পর নরকের চাবি নিয়ে চলে আসেন। এভাবে তিনি আদমের পাপের প্রায়শ্চিত করেন ও মানবজতিকে নরক থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এখন মানুষের দায়িত্ব শুধু একথা 280

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
যীশুর বক্তব্য দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন
প্রথম বাক্য: যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে যীশুখৃস্ট ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন: ‘‘আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর তিনটি ঈশ্বরের সমষ্টি। তিনজনই পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রকৃত ঈশ্বর। তবে তিন মিলে তিন ঈশ্বর নন, এক ঈশ্বর। আর এ ঈশ্বরের এক ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পৃথিবীতে এসে মরিয়ম-তনয় যীশুর দেহের মধ্যে মিশে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তিনদিন নরকবাস করেন এবং পু্নরুত্থিত হয়ে স্বর্গে পিতার নিকট গমন করেন। এ বিশ্বাস করলেই মানুষের জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত। এ বিশ্বাস যার আছে সে যত পাপই করুক না কেন তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। কোনো কর্মই তার জন্য জরুরী নয়। বরং কর্ম করে বা শরীয়ত মেনে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই যীশুর বরকতে অবিশ্বাস করা। খৃস্টধর্মের মূলপাপ ও প্রায়শ্চিতবাদ বিষয়ে জনৈক খৃস্টান লেখক বলেন: "No heathen tribe has conceived so grotesque an idea, involving as it does the assumption, that man was born with a hereditary stain uopn him, and that this stain (for wihch he was not personally responsible) was to be atoned for, and that the creator of all things had to sacrifice His only begotten son to neutralise this mysterious curse." Major Yeats-Brown, Life of a Bengal Lancer. From Ahmed Deedat, The Choice Vo.-2, p165.
281

(And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.)''

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (God manifested in the flesh/ God in the flesh/ God incarnate)[illegible]'

[illegible]

ত্রিত্বে বিশ্বাস করা এবং যীশুর প্রেরিতত্বের বিপরীতে যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা অনন্ত ধ্বংস ও অনন্ত মৃত্যু। এখানে যীশু নিজেকে প্রেরিত ও আল্লাহকে প্রেরণকারী বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যীশুর প্রেরিত হওয়া তাঁর ঈশ্বর হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রেরিত ও প্রেরণকারী কখনোই এক হতে পারেন না; তারা অবশ্যই পৃথক। নইলে এ কথার কোনো অর্থ থাকে না।
দ্বিতীয় বাক্য: মার্কলিখিত সুসমাচারের ১২/২৮-৩৪: ‘‘(২৮) আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্টি প্রথম?
(২৯) যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, ‘হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; (৩০) আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। (৩১) দ্বিতীয়টি এই, ‘তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই।
(৩২) অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; (৩৩) আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম

283

করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ।
(৩৪) তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।’’
মথিলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৩৪-৪০ শ্লোকেও যীশুর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে তিনি উপর্যু&ক্ত দুটি আজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বলেন: ‘‘এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতেছে।’’

118

এ থেকে একটি বাস্তব মহাসত্য জানা গেল। তা হলো, প্রথম যে আজ্ঞাটি তোরাহ ও সকল ভাববাদীর গ্রন্থেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা ঈশ্বরের রাজ্যের নৈকট্যের মূল কারণ তা হলো একত্ববাদ, অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর বা উপাস্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। যদি ত্রিত্ববাদের উপরে মুক্তি নির্ভর করতো, তবে নিশ্চয়ই তা তোরাহ ও অন্য সকল ভাববাদীর গ্রন্থে প্রথম আজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হতো। আর তাহলে যীশু বলতেন: ‘প্রথম আজ্ঞাটি এই, ‘ঈশ্বর প্রভু এক, যিনি তিনটি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার অধিকারী এবং আমিই দ্বিতীয় ঈশ্বর বা ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি ও ঈশ্বরের পুত্র।’
যেহেতু যীশু তা বলেন নি এবং পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই তা বলা হয় নি, সেহেতু আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে,

118 মথি ২২/৪০।
284

ঈশ্বরের প্রকৃত একত্বে বিশ্বাস করাই মুক্তির পথ। ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক, কাজেই তা মুক্তির পথ নয়, বরং ধ্বংসের পথ।

119

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি ঈশ্বরের প্রকৃত একত্বের নির্দেশনায় ভরপুর। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদ দেখতে পারেন: দ্বিতীয় বিবরণ ৪/৩৫ ও ৩৯; ৬/৪-৫; যিশাইয় ৪৫/৫-৬; ৪৬/৯।
তৃতীয় বাক্য: মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘কিনতু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।’’
এ বাক্যটি সন্দেহাতীতভাবে ত্রিত্ববাদের বাতুলতা ঘোষণা করছে। কারণ যীশু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে, কিয়ামত বা বিনাশ দিবসের জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরেই আছে, আর কারো নেই। অন্য সকল

119 এখানে লক্ষণীয় যে, এ অধ্যাপক ত্রিত্বে বিশ্বাস করতেন না। উপরন্তু কেউ ত্রিত্বের কথা বললে বা যীশু নিজেকে ঈশ্বরের এক অংশ বলে দাবি করলে তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতেন। অথচ যীশু সুস্পষ্ট উক্ত অধ্যাপককে ঈশ্বরের রাজ্যের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের রাজ্যে বা জান্নাতে প্রবেশের জন্য ত্রিত্বে বিশ্বাস ও যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয় নয়; বরং ত্রিত্বমুক্ত প্রকৃত একত্বে বিশ্বাসই জান্নাতের জন্য যথেষ্ট।
285

সৃষ্টির সাথে তাঁর নিজেকেও তিনি এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও অন্য সকল সৃষ্টির সমান বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁকে ঈশ্বর কল্পনা করলে তা কখনোই সম্ভব নয়।

120

চতুর্থ বাক্য: মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭/৪৬ ও ৫০ শ্লোক: ‘‘(৪৬) আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া

120 বিশেষত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খৃস্টধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে ‘বাক্য’ এবং ঈশ্বরের ‘পুত্রসত্ত্বা’ বলতে ঈশ্বরের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের পুত্রসত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার সাথে একাকার হয়ে ছিল। এ সংমিশ্রণের প্রকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেভাবেই হোক, তারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত জ্ঞান। আর সেক্ষেত্রে পিতা ঈশ্বরের চেয়ে পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান বেশি থাকা উচিত। তা না হলে অন্তত পুত্রের জ্ঞান পিতার চেয়ে কোনো অংশেই কম হতে পারে না। খৃস্টান পন্ডিতগণ যীশুর এ জাতীয় বাক্যের ব্যাখ্যায় অনেক সময় বলেন যে, যীশু তার দেহের দিকে লক্ষ্য করে ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যার কোনো উপায় নেই। কারণ ‘জ্ঞান’ কোনো দৈহিক বিষয় নয় বা দেহ সম্পৃক্ত গুণ নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেহ, প্রাণ, সত্ত্বা বা আত্মায় কোনো দিক থেকেই যীশু ঈশ্বর ছিলেন না। এছাড়া এখানে যীশু সুস্পষ্ট পুত্রের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র হিসেবেও তিনি এ দিবসের কথা জানেন না। এতে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের পুত্র বলতে তিনি কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বলে দাবি করেন নি; বরং ইস্রায়েলীয়গণ অন্যান্য নেককার মানুষ বা ভাববাদিগণকে যেভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলত, সেভাবেই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলতেন।
286

কহিলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? (৫০) পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন।’’
লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘আর যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, পিত, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।’’
খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে এ হলো যীশুর জীবনের সর্বশেষ কথা। আর এ কথাগুলি তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়ে খৃস্টানদের দাবি সর্বোতভাবে মিথ্যা ও বাতিল বলে প্রমাণ করে। তিনি যদি ঈশ্বরই হতেন তাহলে অন্য কোনো ঈশ্বরের নিকট তিনি ত্রাণ বা সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। ঈশ্বর এরূপ অসহায় হতে পারেন না বা ঈশ্বর এভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। অবসাদ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, শ্রান্তি, ক্লান্তি ইত্যাদির দুর্বলতা কখনো ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। যিশাইয় ৪০/২৮: ‘‘তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অননত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।’’
এভাবে পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে অগণিত শ্লোক ও অনুচ্ছেদ বিদ্যমান যেগুলিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এরূপ মানবীয়

287

দর্বলতা কখনো ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। নমুনা হিসেবে পাঠক যিশাইয় ৪৪/৬; যিরমিয় ১০/১০; হবক্কুক ১/১২; তিমথীয় ১/১৭ ইত্যাদি দেখতে পারেন। এ সকল শ্লোকে বারংবার বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, জীবন্ত, অমর (everlasnting), অক্ষয় ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে (immortal)।
যে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, যাকে কোনো ক্লান্তি, শ্রান্তি বা দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারে না, যিনি জীবন্ত-চিরঞ্জীব, অমর ও অক্ষয় তিনি কিভাবে অসহায় হয়ে ত্রাণপ্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবেন? মরণশীল ক্ষয়শীল অসহায় অক্ষম কি ঈশ্বর হতে পারে? কখনোই নয়! কোনোভাবেই নয়!! বরং তাদের ধারণা ও বর্ণনা অনুসারে এই অন্তিম সময়ে যীশু যার কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করে চিৎকার করেছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত ও সত্য ঈশ্বর।
এখানে লক্ষণীয় যে, ঈশ্বরকে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে অমর বা মৃতুহীন বলা হয়েছে। এর মধ্যে হবক্কুক ১/১২। আরবী অনুবাদের প্রাচীন সংস্করণগুলিতে এ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম..... তুমি মরিবে না (وت#تم ال(।’’ কিন্তু পরবর্তী আরবী সংস্করণগুলিতে লেখা হয়েছে: ‘‘... আমরা মরিব না (نموت ال(।’’
কেরির বঙ্গানুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ: ‘‘ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল হইতে নহ? আমরা মারা পড়িব

না; হে আমার সদাপ্রভু, তুমি বিচারার্থে উহাকে নিরূপন করিয়াছ...।’’ ‘আমরা মারা পড়িব না’ কথাটির টীকায় লেখা হয়েছে ‘‘(বা) তুমি মরিবে না।’’
যে কোনো পাঠক এ শ্লোকটি পাঠ করলে বুঝবেন যে, ‘‘আমরা মারা পড়িব না’’ কথাটি এখানে অর্থহীন। এ বাক্য সম্পূর্ণ ঈশ্বরের প্রশংসায় বলা হয়েছে, আগে ও পরে সবই ঈশ্বরকে সম্বোধন করে তার গুণাবলি বর্ণনা করা। এখানে মাঝখানে ‘‘আমরা মরিব না’’ কথাটি অর্থহীন। একথা সুস্পষ্ট যে, ‘‘তুমি মরিবে না’’ কথাটি কোনো ধার্মিক খৃস্টান লিপিকার বিকৃত করে ‘‘আমরা মরিব না’’ বানিয়ে দেন; যেন যীশুর মৃত্যু দাবির বৈধতা পাওয়া যায়। আর আরবী, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় এরূপ বিকৃতি খুবই সহজ, একটি বা দুটি নুকতা পরিবর্তন করলেই হয়।
পঞ্চম বাক্য: যোহন ২০/১৭ শ্লোকে মগ্দলীনী মরিয়মকে সম্বোধন করে যীশু বলেন: ‘‘আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; কিনতু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাইতেছি (I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God)।’’
এখানে যীশু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে অন্য সকল মানুষের

কর...।’’ সূরা মরিয়মের ৩৬ আয়াতের বর্ণনায় তিনি বলেন: ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তার ইবাদত কর।’’ সূরা যুখরুফের ৬৪ আয়াতের বর্ণনায় তিনি বলেন: ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তার ইবাদত কর।’’ এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশু সর্বশেষ যে কথাগুলি বলেছেন এবং তার ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বমুহূর্তে শিষ্যদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সাথে ত্রিত্ববাদ এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের দাবি সাংঘর্ষিক। তিনি সেই সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তিনি নিজেও যে তাঁদেরই মত আল্লাহর বান্দা তা শিক্ষা দিয়েছেন।
ষষ্ঠ বাক্য: সুসমাচারগুলিতে অগণিত স্থানে যীশু বলেছেন যে, তিনি মানুষের সন্তান বা ‘মনুষ্যপুত্র’ (son of man)।

121

121 হিব্রু বা সেমিটিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভু অর্থে ঈশ্বরকে ‘পিতা’ বলার প্রচলন ছিল। তেমনিভাবে মানুষদেরকে বা ঈশ্বরের প্রিয় মানুষদেরকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলার প্রচলন ছিল। এই অর্থে যীশুও ঈশ্বরকে পিতা বলতেন। তবে মানুষ যেন অতিভক্তির কারণে তাকে প্রকৃত অর্থে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে শির্ক বা অংশীবাদিতায় নিপতিত না হতে পারে, এজন্য তিনি নিজেকে সর্বদা ‘মনুষ্য পুত্র’ বলে আখ্যায়িত করতেন। কারণ, বাইবেলে বারংবার ‘‘মনুষ্যপুত্র’’ বা মানুষের পুত্র বলতে মানুষ বুঝানো হয়েছে। উপরন্তু বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষ নন এবং মনুষ্যপুত্রও নন। দেখুন গণনা পুস্তক ২৩/১৯।

তিনি যে মানুষ মাত্র তা বুঝাতেই তিনি তা বলেছেন; কারণ মনুষ্য পুত্র মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। এছাড়া তিনি বারংবার বলেছেন যে, তিনি আচার্য বা শিক্ষক, তিনি প্রেরিত-রাসূল, তিনি নবী বা ভাববাদী। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: মথি ১০/৪০, ১১/১৯, ১৩/৫৭, ১৫/২৪, ১৭/১২, ২২, ১৯/১৬, ২১/১১, ৪৬, ২৩/৮, ১০, ২৬/১৮; মার্ক ৯/৩৭, ৩৮, ১০/৩৫; লূক ৪/৪৩, ৫/৫, ৭/১৬, ৩৯, ৪০, ৮/২৪, ৪৫, ৯/৩৩, ৩৮, ৫৬, ১০/১৬, ১২/১৩, ১৩/৩৩, ৩৪, ১৭/১৩, ২৩/৪৭, ২৪/১৯; যোহন ১/৩৮, ৪/১৯, ৩১, ৩৪, ৫/২৩, ২৪, ৩৬, ৩৭, ৬/১৪, ২৫, ৭/১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৫২, ৮/১৬, ১৮, ২৬, ২৮, ২৯, ৪০, ৪২, ৯/১১, ১৫, ১৭, ১১/৪২, ১২/৪৪, ৪৯, ৫০, ১৩/১৩, ১৪, ১৪/২৪, ১৭/৩, ৮, ১৮, ২৫, ২০/১৬, ২১।
এখানে সামান্য কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। মথি ১০/৪০: ‘‘যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাকে (আমার প্রেরণকর্তাকে) গ্রহণ করে (he that receiveth me receiveth him that sent me)।’’ মথি ১৫/২৪: ‘‘তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)।’’
মথি ২১/১১: ‘‘তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরাতীয় যীশু।’’

মথি ২৩/৮ ও ১০: ‘‘তোমাদের গুরু (আচার্য) একজন তিনি খৃস্ট (one is your Master, even Christ)।’’
লূক ৪/৪৩: ‘‘কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।’’ লূক ৭/১৬: ‘‘তখন সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর (a great prophet) উদয় হইয়াছে, আর ‘ঈশ্বর আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।’’
লূক ১০/১৬: ‘‘ যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে, এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে, আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।’’
যোহন ৫/৩৬, ৩৭: ‘‘(৩৬) ... যে সকল কার্য আমি করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
(৩৭) আর পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখনও শুন নাই, তাহার আকারও দেখ নাই।’’ যোহন ৬/১৪ শ্লোকে যীশুর অল্প খাদ্য দিয়ে অনেক মানুষকে খাওয়ানোর অলৌকিক চিহ্নের কথা উল্লেখের পরে বলা হয়েছে: ‘‘অতএব সেই লোকের তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য দেখিয়া বলিতে লাগিল, উনি সত্যই সেই ভাববাদী যিনি

জগতে আসিতেছেন (This is of a truth that prophet that should come into the world)।’’ যোহন ৭/১৫-১৭: ‘‘(১৫) তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? (১৬) যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার। (১৭) যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর ইহতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি।’’ যোহন ৮/১৮, ২৬, ২৯, ৪০, ৪২: ‘‘(১৮) আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। (২৬) যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্য, এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগৎকে বলিতেছি। (২৯) আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই...। (৪০) কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে, আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ...। (৪২) আমি তো আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।’’
যোহন ৯/১০, ১১, ১৭ শ্লোকে জন্মান্ধকে চক্ষু দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ‘‘তখন তাহারা তাহাকে (জন্মান্ধকে) বলিল, তবে কি প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল? (১১) সে উত্তর করিল, যীশু নামের একজন মানুষ (A man

that is called Jesus)

122 কাদা করিয়া আমার
চক্ষুতে লেপন করিলেন...। (১৭) পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। সে কহিল তিনি ভাববাদী।’’
যোহন ১৩/১৩: ‘‘তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই।’’
যোহন ১৪/২৪: ‘‘আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।’’
এ সকল বক্তব্যে এবং অনুরূপ অগণিত বক্তব্যে যীশু অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, তিনি একজন মানুষ, শিক্ষাদাতা গুরু, একজন ভাববাদী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত (রাসূল), তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী, কথা বা প্রত্যাদেশ বিশ্বস্ততার সাথে শিষ্যদেরকে শিক্ষা দেন, কোনো কিছু গোপন করেন না, তিনি যেভাবে আল্লাহর নিকট থেকে শুনেন সেভাবেই তা শিষ্যদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহ তাঁর হাতে যে সকল অলৌকিক চিহ্ন-কার্য সম্পন্ন করান তা সবই একজন মানুষ ও প্রেরিত নবী বা ভাববাদী হিসেবে, তিনি এগুলি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র হিসেবে এ সকল চিহ্ন-কার্য করেন নি।
সপ্তম বাক্য: মথি ২৬/৩৬-৪৬: ‘‘(৩৬) তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক
122

কেরির বাংলা বাইবেলে: যীশু নামের সেই ব্যক্তি। 295

স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ঐখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এইখানে বসিয়া থাক। (৩৭) পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। (৩৮) তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যনত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। (৩৯) পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া (fell on his face: সাজদা করিয়া) প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।
(৪০) পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরেক কহিলেন, এ কি? এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না? (৪১) জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল। (৪২) পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।
(৪৩) পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। (৪৪) আর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পূর্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। (৪৫) তখন
296

তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। (৪৬) উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পন করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।’’
এ বিষয়টি লূকলিখিত সুসমাচারের ২২/৩৯-৪৬ শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে। উপরের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত যীশুর অবস্থা ও কথাবার্তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং ঈশ্বরের দাস ও মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর কি কখনো দুঃখার্ত, বেদনার্ত ও আকুল হতে পারেন? ঈশ্বর কি মৃত্যু বরণ করেন এবং অন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন? ঈশ্বর কি অন্য ঈশ্বরের কাছে এভাবে আকুল আবেগ ও কাতরতা নিয়ে প্রার্থনা করেন? কখনোই নয়।

123

123 খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তাঁর রক্ত দিয়ে বিশ্ববাসীকে নরক থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তিনি দেহ গ্রহণ করে এই বিশ্বে এসেছিলেন। তাহলে এই দুঃখ, বেদনা ও আহাজারির অর্থ কী? আর সম্ভব হলে এই পানপাত্র দূরীভুত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারই বা অর্থ কী?!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণাদির অসারতা সুসমাচারগুলির কিছু বক্তব্যকে, বিশেষত যোহনলিখিত সুসমাচারের কিছু বক্তব্যকে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

124 এ
পরিচ্ছেদে আমরা তাদের এ সকল প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার অসারতা প্রমাণ করব।
প্রথম প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টান ধর্মগুরুগণের পেশকৃত প্রথম প্রমাণ, বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ (Son of God) কথাটির প্রয়োগ।
দুটি কারণে এ প্রমাণটি বাতিল:

124 যীশু তার স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনোই তার ঈশ্বরত্বের কথা দ্ব্যর্থহীন সন্দেহমুক্তভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি এমন কিছুই বলেন নি যা থেকে তার ঈশ্বরত্বের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়। এ বিষয়ে খৃস্টানগণ যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করেন তা মূলত যোহনের লেখা থেকে গৃহীত দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কিছু কথা। সকল খৃস্টান গবেষক একমত যে, যোহনের বাক্যাবলি রূপকতায় পরিপূর্ণ। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এমন অনুচ্ছেদ তার পুস্তকে কমই পাওয়া যায়। এছাড়া সুসমাচারগুলি থেকে দেখা যায় যে, খৃস্টের কথার মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা থাকত, যে কারণে তার সমসাময়িক মানুষেরা এবং তার নিকটতম শিষ্যরাও অনেক সময় তিনি বুঝিয়ে না দিলে তার কথার মর্ম বুঝতে পারতেন না।
298

প্রথমত, ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটির বিপরীতে বাইবেলে বারংবার যীশুকে ‘মনুষ্য পুত্র’ (son of man) বলা হয়েছে। এছাড়া তাকে বারংবার ‘দাঊদের পুত্র’ বা ‘দাউদ সন্তান’ (son of David) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যীশুকে মানুষের পুত্র বা মানুষের সন্তান বলে আখ্যায়িত করার বিষয়ে নমুনা স্বরূপ পাঠক মথির সুসমাচারের নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: ৮/২০, ৯/৬, ১৬/১৩, ২৭, ১৭/৯, ১২, ২২, ১৮/১১, ১৯/২৮, ২০/১৮, ২৮, ২৪/২৭, ২৬/২৪, ৪৫,
৬৪। আর যীশুকে দায়ূদের পুত্র বলার বিষয়ে পাঠক নমুনা হিসেবে নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: মথি ১/১, ৯/২৭, ১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫ ২২/৪২; মার্ক ১০/৪৭, ৪৮; লূক ১৮/৩৮, ৩৯।
এছাড়া মথির ১/১-১৭ ও লূকের ৩/২৩-৩৪ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তাকে দায়ূদের বংশধর ও দায়ূদের মাধ্যমে ইয়াকূব, ইসহাক ও ইব্রাহীমের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল ভাববাদী সকলেই আদম সন্তান বা মানব সন্তান ও মানুষ ছিলেন। তাঁদের বংশধর যীশু নিঃসন্দেহে মানব সন্তান ছিলেন। আর এজন্যই তাঁকে বারংবার ‘‘মানুষের পুত্র (son of man) বলা হয়েছে। আর মানুষের পুত্র তো মানুষই হবেন, তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না বা আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র হতে পারেন না।

125

125 বাইবেলে, বিশেষ করে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে বারংবার ‘‘মনুষ্যপুত্র’’ বা মানুষের পুত্র বলতে

দ্বিতীয়ত, ‘ঈশ্বরের পুত্র’ (son of God) কথাটির মধ্যে ‘পুত্র’ শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ সকল জ্ঞানী একমত যে, আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থে পুত্র বলতে বুঝানো হয় পিতামাতা উভয়ের দৈহিক জৈবিক মিশ্রণের

মানুষ বুঝানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মে মনুষ্যপুত্র শতাধিক স্থানে ‘‘মনুষ্যপুত্র’’ বা ‘‘মানুষের ব্যাটা’’ (Son of man) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বত্র একমাত্র উদ্দেশ্য ‘‘মরণশীল মানুষ’’ বুঝানো। নবী বা ভাববাদীকে বিশেষভাবে ‘‘মানুষের পুত্র বা মানব সন্তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে একই উদ্দেশ্যে যেন কেউ অলৌকিক কার্যাদি দেখে তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত মনে না করে। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: গণনা পুস্তক ২৩/১৯; ইয়োব ২৫/৬, ৩৫/৮; গীতসংহিতা ৮/৪, ৮০/১৭, ১৪৪/৩, ১৪৬/৩; যিশাইয় ৫১/১২, ৫৬/২; যিরমিয় ৪৯/১৮, ৪৯/৩৩, ৫০/৪০, ৫১/৪৩; যিহিষ্কেল ২/১, ৩, ৬, ৮, ৩/১, ৩, ৪, ১০, ১৭, ২৫, ৪/১, ১৬, ৫/১, ৬/২, ৭/২, ৮/৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ১১/২, ৪, ১৫, ১২/২, ৩, ৯, ১৮, ২২, ২৭, ১৩/২, ১৭, ১৪/৩, ১৩, ১৫/২, ১৬/২, ১৭/২, ২০/৩, ৪, ৭, ৪৬, ২১/২, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৯, ২৮, ২২/২, ১৮, ২৪, ২৩/২, ৩৬, ২৪/২, ১৬, ২৫, ২৫/২, ২৬/২, ২৭/২, ২৮/২, ১২, ২১, ২৯/২, ১৮, ৩০/২, ২১, ৩১/২, ৩২/২, ১৮, ৩৩/২, ৭, ১০, ১২, ২৪, ৩০, ৩৪/২, ৩৫/২, ৩৬/১, ১৭, ৩৭/৩, ৯, ১১, ১৬, ৩৮/২, ১৪, ৩৯/১, ১৭, ৪০/৪, ৪৩/৭, ১০, ১৮, ৪৪/৫, ৪৭/৬, ১৩, দানিয়েল ৮/১৭। এগুলি পাঠ করলে পাঠক সন্দেহাতীতভাবে সুনিশ্চিত হবেন যে, বাইবেলের পরিভাষায় মানুষ্যপুত্র অর্থ মানুষের ব্যাটা মানুষ মাত্র।
এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে বারংবার বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর কখনোই মনুষ্যপুত্র নন, এবং কোনো মনুষ্যপুত্র কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদ দেখুন: গণনা পুস্তক ২৩/১৯: ‘‘God

মাধ্যমে যার জন্ম। এ অর্থ ‘ঈশ্বরের পুত্র’ (son of God)-এর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে এমন একটি রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে যা খৃস্টের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যতাপূর্ণ। আর ইঞ্জিল বা নতুন

is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে, মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্যপুত্র (কেরির বঙ্গানুবাদে: মনুষ্য-সন্তান) নহেন যে অনুশোচনা করিবেন।’’
ইয়োব ২৫/৬: (How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?) মানুষের মূল্য কত কম, যা একটি কীটের তুল্য? মনূষ্যপুত্রের মূল্য কত কম, যা একটি কীটের তুল্য (কেরির বঙ্গানুবাদে: তবে কীটসদৃশ মত্ত্য কি? কৃমিসদৃশ মনুষ্য-সন্তান কি?)
গীতসংহিতা ১৪৬/২-৫ শ্লোকে রাজা-বাদশা ও মনুষ্যপুত্রের উপর নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে ও তারই কাছে সাহায্য চাইতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বলা হয়েছে: (Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God) ‘‘(৩) তোমরা নির্ভর করিও না রাজন্যগণে, বা মনুষ্যপুত্রে (কেরির অনুবাদে: মানুষ্য-সন্তানে), যাহার নিকট ত্রাণ নাই। (৪) তাহার স্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হইবে। (৫) ধন্য সেই, যাহার সহায় যাকোবের ঈশ্বর, যাহার আশাভূমি সদাপ্রভু, তাহার ঈশ্বর।’’

নিয়মের ব্যবহার থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে ‘ধার্মিক’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রমাণ, মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে যীশুর ক্রুসবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে: ‘‘আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যই এ মানুষটি (ইনি) ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন (Truly this man was the Son of God)।’’
একই ঘটনায় উক্ত শতপতির উপর্যুক্ত বক্তব্য লূক তার সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে উদ্ধৃত করেছেন। লূকের ভাষা:

যিশাইয় ৫১/১২-১৩ তেও একই কথা বলা হয়েছে: ‘‘(I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass; And forgettest the LORD thy maker) আমি, আমিই তোমাদের সান্তনাকর্তা। তুমি কি যে, মানুষকে (মর্তকে) ভয় করিতেছ, সে ত মরিয়া যাইবে; এবং মনুষ্যপুত্রকে (মনুষ্য-সন্তানকে) ভয় করিতেছ, সে ত তৃণের ন্যায় হইয়া পড়িবে; আর তোমার নির্মাতা সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়াছ?...’’ এভাবে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুষ্যপুত্র অসহায়, তার নিকট কোনো ত্রাণ নেই, তার কাছে কিছু আশা করা যাবে না, সে মরণশীল, সে তৃণের ন্যায়, সে কীটের ন্যায়। এরপরও কি আমরা মনে করব যে, বাইবেলের পরিভাষায় মনুষ্যপুত্র বলতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো কিছু বুঝানো হতে পারে?
302

‘‘যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন (Certainly this was a righteous man)।’’
এভাবে আমরা দেখছি যে, মার্ক যেখানে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেখানে লূক ‘ঈশ্বরের পুত্র’-র পরিবর্তে ‘ধার্মিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশু ও যীশুর যুগের মানুষদের ভাষায় ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটির অর্থ ছিল ‘‘ধার্মিক মানুষ (righteous man)’’।
আমরা দেখেছি যে, যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য খৃস্টান ধর্মগুরুগণ সুসামাচরগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছেন, যে কারণে সুসমাচারগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলি নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। তারপরও খৃস্টানগণের দাবিমত এগুলি বিশুদ্ধ এবং তাঁদের দাবিমতই একথা প্রমাণিত হলো যে, সুসমাচারের পরিভাষায় ঈশ্বরের পুত্র অর্থ ধার্মিক মানুষ (righteous man)। বিশেষত মার্ক ও লূক উভয়ের বর্ণনাতেই শতপতি যীশুকে মানুষ (man) বলে উল্লেখ করেছেন। সুসমাচারগুলির বিভিন্ন স্থানে যীশু ছাড়া অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনভাবে ‘পাপী’র ক্ষেত্রে

‘দিয়াবলের পুত্র’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।
মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘৯ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।... ৪৪ কিনতু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; ৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সনতান হও...।’’
এখানে যীশু যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও মানুষদের মধ্যে মিল করে দেন তাদেরকে এবং যারা এভাবে শত্রুমিত্র সকলকেই ভালবাসেন তাদেরকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে অভিহিত করেছেন এবং ‘ঈশ্বর’-কে তাদের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন।
যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াহূদীগণ ও খৃস্টের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়: ‘‘(৪১) তোমাদের পিতার কার্য তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর।
(৪২) যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে... (৪৪) তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা;... কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার (মিথ্যাবাদীর) পিতা।’’

[illegible] (the children of God are manifest, and the children of the devil)[illegible]’’

উক্ত পত্রের ৪ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God) ও ঈশ্বরকে জানে’’।
উক্ত পত্রের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘(১) যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God); এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে; সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে (every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him) (২) ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরের সনতানগণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।’’
রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে: ‘‘কেননা যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।’’ ফিলিপীয় ২/১৪-১৫: ‘‘(১৪) তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর, (১৫) যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও।’’
উপরের উদ্ধৃতিগুলি সুস্পষ্টরূপে আমাদের দাবি প্রমাণ করে। এ সকল শ্লোকে যাদেরকে ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ ও ‘‘ঈশ্বরের জাত’’ বলা হয়েছে তারা কেউই আক্ষরিক অর্থে ‘‘ঈশ্বরের জাত’’ বা ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ নন; বরং উপরে উল্লেখিত রূপক অর্থে তাদেরকে ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ বলা হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলিতে ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ শব্দদ্বয়কে অসংখ্য অগণিত স্থানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।
(১) লূক তার সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে খৃস্টের বংশাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে ৩৮ শ্লোকে বলেছেন: আদম ঈশ্বরের পুত্র।
(২) যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু মোশিকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন: ‘‘২২ আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত (my son, even my firstborn)। ২৩ আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিনতু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।’’
এখানে দুই স্থানে ‘ইস্রায়েল’-কে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, উপরন্তু তাকে প্রথমজাত পুত্র অর্থাৎ বড় ছেলে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
(৩) গীতসংহিতার ৮৯ গীতে দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন: ‘‘(২০) আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি, আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি (with my holy oil have I anointed him)।... (২৬) সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর

(Thou art my father, my God)...। (২৭) আবার আমি তাহাকে প্রথমজাত করিব ...।’’
এখানে দায়ূদকে অভিষিক্ত অর্থাৎ মসীহ (The Messiah) বা খৃস্ট (The Christ, The Anointed) ও ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (firstborn) বলে অভিহিত করা হয়েছে।
(৪) যিরমিয় ৩১/৯-এ ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: ‘‘যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত পুত্র।’’
(৫) ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে শলোমনের বিষয়ে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে: ‘‘আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে’’।
যদি যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলায় তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে আদম, ইস্রায়েল, ইফ্রয়িম দায়ূদ ও সুলাইমান ঈশ্বরত্বের বেশি অধিকারী বলে প্রমাণিত হবে; কারণ তাঁরা যীশুর পূর্বেই এ পদ লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁর পূর্বপুরুষ এবং বিশেষত ইস্রায়ৈল, ইফ্রয়িম ও দায়ূদকে ‘ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র’ বলা হয়েছে। আর আবরাহাম, মোশি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রথমজাত পুত্রই সম্মান-মর্যাদার সর্বাধিক অধিকার ভোগ করেন। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই এর প্রচলন রয়েছে।

126

126 এখানে খৃস্টানগণ বলতে পারেন যে, যীশুকে নতুন নিয়মের কোথাও কোথাও ‘ঈশ্বরের একজাত পুত্র বা

(৬) বাইবেলের অনেক স্থানে সকল ইস্রায়েল-সন্তানকে ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ বা ‘‘ঈশ্বরের সন্তান’’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/১, ৩২/১৯; যিশাইয় ১/২, ৩০/১, ৬৩/৮; হোশেয় ১/১০।
(৭) আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘(২) তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের

‘ঈশ্বরের জন্মদেওয়া একমাত্র পুত্র’ (only begotten son)’ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে তার বিশেষত্ব বুঝা যায়। তাদের এ দাবি বাইবেলের আলোকে বাতিল বলে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে ‘একজাত’ বা ‘একমাত্র জন্মদেওয়া’ শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হতে পারে না। কারণ ঈশ্বর নিজেই এ ‘একমাত্র জন্মদেওয়া পুত্রের’ আরো অনেক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে তিনজনতে ‘প্রথমজাত’ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই ‘পুত্র’ বা ‘প্রথমজাত’ শব্দের ন্যায় ‘একজাত’ শব্দেরও রূপক অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ইস্রায়েল, ইফ্রমিয় ও দায়ূদ-এর ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন যে তাঁরা তাঁর প্রথমজাত। আর যীশুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজে এরূপ কিছু বলেছেন বলে প্রচলিত সুসমাচারগুলিতেও নেই। যীশুর অস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে বা সুসমাচার লেখকদের কথার মধ্যে এরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। সর্বোপরি (only begotten son) বা ‘‘একমাত্র জন্মদেওয়া পুত্র’’ কথাটিকে প্রকৃত ও আক্ষরিক অথ্যে গ্রহণ করলে বাইবেরের আলোকে তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ বাইবেলেই ঈশ্বর আরো অনেক পুত্র জন্ম দেওয়ার কথা বলেছেন। গীতসংহিতা ২/৭: ‘‘(the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee) সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।’’ কাজেই ঈশ্বরের জন্মদেওয়া (begotten) পুত্র মাত্র একজন একথা বাইবেলের আলোকে মিথ্যা।

কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।
(৪) তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের নিকটে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সনতান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।’’
এখানে আদম সন্তানদেরকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
(৮) যিশাইয় ৬৩/১৬ ও ৬৪/৮ শ্লোকে ঈশ্বরকে ইস্রায়েল-সন্তানদের সকলের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
(৯) ইয়োব ৩৮/৭: ‘‘তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল।’’
(১০) গীতসংহিতার ৬৮/৫: ‘‘ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা।’’
এখানে ঈশ্বরকে পিতৃহীনদের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ সকল স্থানে ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ পরিভাষাকে অবশ্যই ‘‘রূপক’’ অর্থে ব্যবহার করতে হবে। কোনো একজন খৃস্টানও বলবেন না যে, এ সকল স্থানে ঈশ্বরের পুত্র বলতে বা ঈশ্বরকে পিতা বলতে প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। যেভাবে আদম, আদম-পুত্রগণ, ইস্রায়েল (ইয়াকুব), ইফ্রয়িম, দায়ূদ, সুলাইমান, সকল ইস্রায়েলীয় মানুষ এবং সকল এতিম-পিতৃহীন-কে ঈশ্বরের পুত্র বা অনুরূপ

কিছু বলার কারণে ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি যীশুখৃস্টের ক্ষেত্রেও তাকে ঈশ্বরের পুত্র বা অনুরূপ কিছু বলার কারণে তাকে ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এরূপ কল্পনা বাইবেল, সকল ভাববাদীর শিক্ষা ও মানবীয় জ্ঞান-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক।
দ্বিতীয় প্রমাণ: যীশুর ঈশবরত্বের পক্ষে খৃস্টানগণের দ্বিতীয় প্রমাণ, নতুন নিয়মের কিছু শ্লোকে যীশুকে এ জগতের নন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৮/২৩: ‘‘তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের (Ye are from beneath; I am from above); তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।’’
খৃস্টানগণ ধারণা করেন যে, এখানে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি ‘‘ইঙ্গিত’’ করেছেন এবং বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের নিকট থেকে আগমন করেছেন এবং তিনি এ জগতের নন। তিনি মানুষরূপী হলেও মানুষ নন, বরং স্বর্গের বা ঊর্ধ্বজগতের ঈশ্বর।
তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেও সঠিক নয়। কারণ যীশু বাহ্যত ও প্রকৃত অর্থে এ জগতেরই ছিলেন। তাদের ব্যাখ্যাটি দুই কারণে বাতিল: প্রথমত, এ ব্যাখ্যা যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক। তেমনি ভাবে তা

311

নতুন ও পুরাতন নিয়মের অগণিত বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।
দ্বিতীয়ত, যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলেছেন। যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন: ‘‘তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব বলিয়া ভাল বাসিত; কিনতু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।’’
যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।... ১৬ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।’’
এভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন যে, তাঁরা এ জগতের নন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁদেরকে তাঁরই মত একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যেমন এ জগতের নন, তাঁর শিষ্যরাও ঠিক তেমনি এ জগতের নন। খৃস্টানদের দাবি অনুসারে, যদি এ জগতের না হওয়ার কারণে ঈশ্বরত প্রমাণিত হয়, তবে যীশুর শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে। আর যেহেতু খৃস্টানগণ যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, সেহেতু তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, ঊর্ধ্বজগতের হওয়া, ঈশ্বরের নিকট থেকে আগমন করা বা এ

312

জগতের না হওয়া অর্থের বাক্যাদি দিয়ে যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। যীশুর এ বাক্যের সঠিক অর্থ হলো, তোমরা পার্থিব জগতের লোভ লালসার অনুসারী ও জাগতিক স্বার্থান্বেষী আর আমি তদ্রুপ নই, বরং আমি ও আমার শিষ্যগণ ঊর্ধ্বজগতের বা স্বর্গের মর্যাদার অভিলাসী এবং ঈশ্বরের প্রেম অনুসন্ধানী। এরূপ রূপক ব্যবহার সকল ভাষাতেই বিদ্যমান। ধার্মিক ও সংসারবিমুখ মানুষদেরকে সকল দেশে এবং সকল ভাষাতেই বলা হয় ‘এরা এ জগতের মানুষ না।’
তৃতীয় প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের তৃতীয় দলিল, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে এক বলে উল্লেখ করেছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: ‘‘আমি ও পিতা, আমরা এক (I and my Father are one)।’’ খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, এই বাক্য যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। দু কারণে তাঁদের এই দাবি বাতিল:
প্রথম কারণ: প্রকৃত অর্থে খৃস্ট এবং ঈশ্বর কখনোই এক হতে পারেন না। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেও তিনি ও ঈশ্বর এক ছিলেন না। কারণ খৃস্টের একটি মানবীয় আত্মা ও দেহ ছিল, খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এ দিক থেকে তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক ছিলেন। তাঁরা বলেন যে, ‘আমি ও পিতা এক’ কথাটি বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো,

313

ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি ও ঈশ্বর এক। মানুষ হিসেবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। আবার ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। তার মধ্যে দুটি পৃথক সত্ত্বা বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যকার পুত্র সত্ত্বার দিক তিনি ও পিতা এক ছিলেন। তাঁদের এ ব্যাখ্যা অন্তসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র। কারণ খৃস্টের বাক্য হয় তার প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অথবা যীশুর অন্যান্য বাক্য, অন্যান্য ঐশ্বরিক গ্রন্থের বাক্য এবং যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের ব্যাখ্যাটি প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক, আবার জ্ঞান, যুক্তি এবং বাইবেলের অন্যান্য বাণীর সাথেও সাংঘর্ষিক।
দ্বিতীয় কারণ: এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন: ‘‘২১ যেন তাহারা সকলে এক হয় (they all may be one); ২১ পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে (এক)

127 থাকে (that
they also may be one in us); যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক

127 (এক) শব্দটি বাংলা বাইবেলে উল্লেখ করা হয় নি, তবে ইংরেজিতে রয়েছে।
314

হয়, যেমন আমরা এক (that they may be one, even as we are one); ২৩ আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে

128 (I in them, and thou
in me, that they may be made perfect in one)।’’
এখানে যীশু বলেছেন: ‘‘যেন তাহারা সকলে এক হয়’’, ‘‘যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা এক’’ এবং ‘‘যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে’’। এ বাক্যগুলি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা সকলে এক ছিলেন। দ্বিতীয় বাক্যে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, ‘ঈশ্বরের সাথে তাঁর একত্ব’ যেরূপ ‘তাদের মধ্যকার একত্ব’-ও ঠিক তদ্রূপ।
এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে ‘একসত্ত্বা’ ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে ‘ঈশ্বরের’ সাথে ‘একসত্ত্বা’ ছিলেন না।
বস্তুত, ‘ঈশ্বরের সাথে এক’ হওয়ার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া। তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা। এই ঐক্যের মূল পর্যায়ে খৃস্ট, প্রেরিতগণ ও সকল বিশ্বাসী সমান। পার্থক্য হলো ঐক্যের শক্তি ও দুর্বলতায়। ঈশ্বরের সাথে এরূপ ঐক্যে খৃস্ট অন্যদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও তাঁর ঐক্য পূর্ণতর।

128 বাংলা বাইবেলের ভাষ্য: যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়।

তাহলে এ সকল বক্তব্যে ‘একত্ব’, ঐক্য বা এক হওয়ার অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এক করে দেওয়া, তার আনুগত্যে ও সেবায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। একত্ব অর্থ সকলে সত্ত্বা এক হয়ে যাওয়া নয়। প্রেরিত ও শিষ্যগণের এক হওয়ার অর্থ তাদের সকলের সত্ত্বা এক হওয়া নয়। অনুরূপভাবে যীশু ও ঈশ্বরের এক হওয়ার অর্থ উভয়ের সত্ত্বা এক হওয়া নয়।
চতুর্থ প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের চতুর্থ প্রমাণ যীশুকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হবে বলে যীশুর বক্তব্য। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘(৯)...যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন? (১০) তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিনতু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।’’
খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, খৃস্টের এই কথাগুলি: ‘‘যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে (he that hath seen me hath seen the Father)’’, ‘‘আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন (I am in the Father, and the Father in me)’’ এবং ‘‘পিতা আমাতে থাকিয়া (the Father that dwelleth in me) আপনার কার্য সকল সাধন করেন’’ এগুলি প্রমাণ করে যে, খৃস্ট ও ঈশ্বর একই সত্ত্বা ছিলেন বা

316

ঈশ্বরের সত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার মধ্যে অবতরণ ও অবস্থান করেছিল।
তাঁদের এই দাবি দুটি কারণে অগ্রহণযোগ্য।
প্রথমত, বাইবেলে প্রমাণ করে যে, এ পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কাজেই যীশুর কথা তাদের মতেই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে ঈশ্বরকে দেখা বলতে ঈশ্বরকে জানা বুঝানো হয়েছে। আর খৃস্টকে তার দৈহিকরূপে দেখলে বা তার দেহকে জানলে ঈশ্বরকে দেখা বা জানা হয় না। এ বক্তব্যের সঠিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি যীশুর কর্মকান্ড দেখবে সে যেন ঈশ্বরের কর্মই দেখল; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা, আদেশ ও শক্তিতেই তিনি এ সকল কর্ম করেছেন। দ্বিতীয়ত, যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে যীশু বলেছেন: ‘‘সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি।’’
যোহন ১৭/২১ শ্লোকে যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন: ‘‘পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে (that they also may be one in us)।’’ করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত ১ম পত্রের ৬/১৯ শ্লোকে

129 শ্লাকে সাধু পল বলেন: ‘‘অথবা

129 বাংলায় শেষ বাক্যটি ২০ শ্লোকের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
317

তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অনতরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও।’’
২ করিন্থীয় ৬/১৬: ‘‘আমরাই ত জীবনত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব (I will dwell in them)। ইফিষীয় ৪/৬: ‘‘সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও (তোমাদের) সকলের মধ্যে (in you all)

130 আছেন।’’
খৃস্টানদের ব্যাখ্যা অনুসারে এ বাক্যগুলি দ্বারা যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়! কারণ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যার মধ্যে কেউ অবস্থান করছেন তিনি যদি কোথাও অবস্থান করেন, তবে তার মধ্যের সত্ত্বাও তথায় অবস্থান করবেন। আর যীশু ও ঈশ্বর এক এবং যীশুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। সেই যীশু ও শিষ্যগণ এক এবং শিষ্যগণের মধ্যে যীশু অবস্থান ও অবতরণ করেছেন। কাজেই শিষ্যদের মধ্যেও ঈশ্বর অবতরণ ও অবস্থান করছেন। কারো মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান করা যদি উক্ত ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের একত্ব (union) বা উক্ত ব্যক্তির ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে, তবে বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর, বরং করিন্থের বাসিন্দাগণ সকলেই ঈশ্বর এবং ইফেসাস (Ephesus) অঞ্চলের

130 বাংলা বাইবেলে ‘‘সকলের অন্তরে’’।

সকল বাসিন্দাই ঈশ্বর! কোনো খৃস্টান কি তা মানবেন!
বস্তুত কারো মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান, কারো সাথে ঈশ্বরের এক হওয়া, কারো মধ্যে যীশুর অবস্থান বা কারো সাথে যীশুর এক হওয়া ইত্যাদি দ্বারা আনুগত্য ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যীশুকে জানা ও তার আনুগত্য করার অর্থ তাঁর প্রেরণকারী মহান আল্লাহকে জানা ও তাঁর আনুগত্য করা। কারণ তাঁর আদেশের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আদেশ। অনুরূপভাবে শিষ্যদের আনুগত্য করার অর্থ তাঁদের প্রেরণকারী যীশুর আনুগত্য করা; কারণ তাঁদের নির্দেশের মধ্যেই তাঁর নির্দেশ নিহিত। ঐক্য ও মধ্যে থাকার এ হলো সঠিক ব্যাখ্যা।

131

131 যদিও যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রচলিত খৃস্টধর্মের মূল ভিত্তি, কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য দিয়ে তা সমর্থন করা খুবই কঠিন। কোথাও যীশু স্পষ্ট করে তা বলেন নি। তার বিপরীতে ঈশ্বরের একত্বের কথা ও তাঁর নিজের মানবত্বের কথা ও অ-ঈশ্বরত্বের কথা তিনি বারংবার বলেছেন। তারপরও তাঁরা বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাদের মূল দলীলগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি অনেক সময় তারা যে সকল বিষয়কে যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেষ্টা করেন সেগুলির অন্যতম হলো: (১) যীশুর পিতা ব্যতিরেকে জন্ম ও (২) যীশু কর্তৃক অলৌকিক কার্যাদি, বিশেষত মৃতকে জীবিত করা। বাইবেলের আলোকে এ দুটি বিষয়ের একটিও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম পিতামাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া বাইবেলের উল্লেখ করা হয়েছে যে, 319

প্রিয় পাঠক, এখানে খৃস্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত খৃস্টের বা প্রেরিতদের বাণীগুলি উল্লেখ করে সেগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছি খৃস্টান প্রচারকদের দাবির অসারতা নিশ্চিত করার জন্য। অন্যথায় আমাদের বিশ্বাস, নতুন নিয়মে উদ্ধৃত এ সকল বক্তব্য বা বাণী খৃস্টের বা তার প্রেরিতদের বলে প্রমাণিত নয়। প্রচলিত এ সকল পুস্তকের কোনোটিরই অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এছাড়া এসকল পুস্তকের মধ্যে সাধারণভাবে পরিবর্তন,

অবরাহামের সমসাময়িক যাজক মল্কীষেদক (Melchisedec)-ও পিতামাতা ব্যতিরেকেই জন্ম গ্রহণ করেন। ইব্রীয় ৭/১-৩ শ্লোকে সাধু পল লিখেছেন: ‘‘সেই যে মল্কীষেদক... তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি নাই, ... ’’। অলৌকিক কার্য বা মৃতকে জীবিত করাও যীশুর কোনো বিশেষত্ব নয়। যদি আমরা প্রচলিত সুসমাচারগুলির এ বিষয়ক বর্ণনাগুলি সঠিক বলে মেনে গ্রহণ করি, তবে তা থেকে প্রমাণিত হবে যে, যীশু মাত্র তিন ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে যিহিষ্কেল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেন (যিহিষ্কেল ৩৭/১-১৪)। কাজেই মৃতকে জীবিত করা যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয় তবে যিহিষ্কেল ভাববাদীই ঈশ্বর হওয়ার অধিকতর যোগ্যতা রাখেন। এছাড়া এলিয় (Elijah) একটি মৃত শিশুকে পুনর্জীবিত করেন (১ রাজাবলির ১৭/১৭-২৪)। ইলীশায় (Elisha) একজন মৃত বালককে পুনর্জীবিত করেন (২ রাজাবলির ৪/৮-৩৭)। এছাড়া ইলীশায় ভাববাদী কুষ্ঠরোগীকে তার কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য করেছিলেন (২ রাজাবলির ৫/১-১৪)। মূসা (আ)-এর অলৌকিক কার্যাদি প্রসিদ্ধ। অলৌকিক কার্য ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হলে এরা সকলেই ঈশ্বর বলে গণ্য হতেন।
320

পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে অগণিত বিকৃতি সাধিত হয়েছে। খৃস্টের ঈশ্বরত বা ত্রিত্বের বিষয়ে বিশেষভাবে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে বিকৃতি সাধন করা বা মিথ্যা বলা খৃস্টান পণ্ডিতদের একটি সুপরিচিত অভ্যাস।

132

আমরা বিশ্বাস করি যে, নিঃসন্দেহে যীশু খৃস্ট এবং তাঁর প্রেরিতগণ এ সব কুফরী বা ঈশ্বর বিরোধী (blasphemous) বিশ্বাস থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং ঈসা (যীশু) আল্লাহর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং যীশুর প্রেরিতগণ আল্লাহ প্রেরিতের প্রেরিত।

132 ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য পৌল মিথ্যা কথা বলতেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিনতু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?’’ (রোমান ৩/৭) এ থেকে জানা যায় যে, তিনি যে বিষয়কে ‘ঈশ্বরের গৌরব’ প্রকাশক বলে কল্পনা করেছেন, সে বিষয়ে ঈশ্বর, যীশু বা পবিত্র-আত্মার নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর অনুসারী খৃস্টান ধর্মগুরুগণও এ মূলনীতিতে বিশ্বাসী ও পালনকারী।
321

তৃতীয় অধ্যায়: আল-কুরআন ও আল-হাদীস

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ, তার অলৌকিকত্ব, কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা, আল-হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রমাণ ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাদীস বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব
এ পরিচ্ছেদে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করব। এরপর এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তিগুলির পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।
৩. ১. ১. আল কুরআনের অলৌকিকত্ব অগণিত বিষয় প্রমাণ করে যে, কুরআন কারীম সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী (God's Word)

133। এবং তা একটি অলৌকিক গ্রন্থ।

133 মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনেক অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেন। সেগুলির অন্যতম হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। গ্রন্থকার এখানে কুরআনের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। তবে কুরআনের অলৌকিকত্ব এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্ত্তত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। 323

এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হবে, যেগুলি বিষয়টি প্রমাণ করে।
৩. ১. ১. ১. অলৌকিক ভাষাশৈলী
কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণীত্বের (Divinity, Divine Authority) একটি প্রমাণ হলো, কুরআনে সর্বত্র ভাষা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্য মান রক্ষা করা হয়েছে।

134 আরবীতে এই সর্বোচ্চ
সাহিত্য মানকে ‘বালাগাত’ বলা হয়। এর অর্থ হলো, আকর্ষণীয় সর্বোত্তম শব্দের মাধ্যমে প্রয়োজীনয় অর্থের প্রকাশ ঘটানো এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। এভাবে শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের মহত্ব ও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য যত গভীর ও

134 মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য ‘নিয়ম পুস্তক’ নয়। বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের একটি দিক। লক্ষণীয় যে, এটি কুরআন কারীমের একক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে এই বৈশিষ্ট পাওয়া যায় না। সকল ধর্মগ্রন্থেই ভালভাল বিষয় আলেচিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে বিষয় ও অর্থ মানুষের মন নাড়া দিতে পারে। তবে অর্থের পাশাপাশি শব্দ, বাক্য ও ভাষাশৈলীর মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহিতা কুরআনের বৈশিষ্ট্য।
324

পরিপূর্ণ হয় ‘বালাগাত’-এর মানও তত পূর্ণতা পায়। বিভিন্নভাবে কুরআনের এই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান জানা যায়:
(ক) প্রথম দিক: বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা
আরব ও অনারব কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা বা বালাগাত সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনার ক্ষেত্রে। উট, ঘোড়া, নারী, রাজা, তরবারীর আঘাত, তীর নিক্ষেপ, যুদ্ধক্ষেত্র, আক্রমন ইত্যাদির বর্ণনায় আরবগণ সবচেয়ে বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে সাহিত্য ও অলঙ্কারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। কারণ অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি এরূপ বর্ণনা পছন্দ করে। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে কবি ও সাহিত্যিকগণ এ সকল বিষয়ে নতুন নতুন অর্থ উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তী কবি সাহিত্যিকগণ সাধারণত এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের থেকে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করেন। যদি কোনো বুদ্ধিমান ও মেধাবী মানুষ কোনো একটি বিষয়ে সাহিত্যিক যোগ্যতা অর্জন করার মানসে দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী কবি সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ ও চর্চা করেন তবে ক্রমান্বয়ে তিনি এ বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন।
কুরআন মূলত এ সকল কাব্যিক বা সাহিত্যিক কোনো বিষয়ের বর্ণনায় রচিত নয়, সেহেতু এ গ্রন্থে সাহিত্যিক মান রক্ষিত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে কুরআনে সর্বোচ্চ

325

সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কোনো মানবীয় চর্চা বা চেষ্টার ফলে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবেই এর সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।
(খ) দ্বিতীয় দিক: সত্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা
সাহিত্যের উচ্চাঙ্গতার সাথে কল্পনা ও মিথ্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি মিথ্যা বর্জন করে শুধু সত্যের মধ্যে নিজের সাহিত্যকর্ম আবদ্ধ রাখেন তবে তার সাহিত্যমানের অবনতি ঘটে। এরূপ সাহিত্য উন্নত সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। এজন্য আরবী সাহিত্যে বলা হয়: ‘সবচেয়ে সুন্দর কাব্য যা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা।’ কিন্তু কুরআন এর সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ কুরআনে সকল ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন এবং মিথ্যা সর্বোতভাবে পরিহার করেছেন। সকল প্রকার মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও বাড়িয়ে বলা থেকে বিমুক্ত থাকা সত্ত্বেও কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্যমান অক্ষুন্ন রয়েছে।
(গ) তৃতীয় দিক: সর্বব্যাপিতা
মানবীয় উচ্চাঙ্গ সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, একটি বৃহৎ কাব্যের মধ্যে হয়ত একটি দুইটি পংক্তি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম বলে গণ্য হয়। বাকি পংক্তিগুলি সাধারণ মানের হয়। পক্ষান্তরে কুরআনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যত বৃহৎ বা

দীর্ঘ কাহিনী বা বর্ণনাই হোক, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে, যা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেউ যদি সূরা ইউসূফ নিয়ে একটু চিন্তা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই দীর্ঘ সূরাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ের সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।
(ঘ) চতুর্থ দিক: পুনরাবৃত্তির উচ্চাঙ্গতা
কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি কোনো বিষয় বা গল্প পুনরাবৃত্তি করেন তবে প্রথম বর্ণনা ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে সাহিত্য মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে কুরআন কারীমে নবীগণের কাহিনী, সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের কাহিনী, ধর্মীয় বিধিবিধান, আল্লাহর গুণাবলির বিবরণ বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কোথাও দীর্ঘ এবং কোথাও সংক্ষেপ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বর্ণনার শব্দ, বাক্য, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, সকল বর্ণনায় চূড়ান্ত সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার মধ্যে সাহিত্যিক মানের কোনো কমবেশি লক্ষ্য করা যায় না।
(ঙ) পঞ্চম দিক: অসাহিত্যিক বিষয়ের সাহিত্যিকতা
কুরআনের আলোচ্য বিষয় মূলত উপাসনা- আরাধনা বা ইবাদত বন্দেগির নির্দেশ দেওয়া,

অশ্লীল, অন্যায় ও গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করা, উত্তম আচরণ, লোভমুক্ত জীবন ও আখিরাতমুখিতার উৎসাহ প্রদান। এ ধরনের বিষয়ে সাহিত্যিকের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা পরিদর্শনের সুযোগ খুবই সীমিত। কোনো সুপ্রসিদ্ধ ভাষার যাদুকর কবি বা সাহিত্যিককে যদি বলা হয়, তুমি উচ্চাঙ্গের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও ভাষার অলঙ্কার দিয়ে দশটি ফিক্হী বিষয়ে অথবা ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ, তাহলে তিনি তাতে পুরোপুরি সক্ষম হবেন না। পক্ষান্তরে কুরআন এই অসাহিত্যিক বিষয়গুলিতেই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করেছে।
(চ) ষষ্ঠ দিক: বিষয়বস্তুর বৈচিত্রময়তা ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা
কোনো কবি বা সাহিত্যিক একাই সাহিত্যের সকল বিষয়ে পারঙ্গমতা দেখাতে পারেন না। প্রত্যেকেই একটি বিশেষ বিষয়ে ভাল করেন, বাকি বিষয়গুলিতে অত ভাল করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কুরআনে সকল বিষয়েই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষিত হয়েছে। উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উপদেশ, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমরা তা দেখতে পাই। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

135

135 স্বভাবতই আরবী পাঠের সাহিত্যিক মান, শব্দ প্রয়োগ ও ভাষাশৈলীর প্রভাব অনুবাদের মধ্যে রক্ষা করা যায় না। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের আলাদা ছন্দ আছে। উদ্দীপনার ছন্দ থেকে ভয়ের ছন্দ

পারলৈŠ কিক জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রদান করে কুরআনে বলা হয়েছে: ‘‘কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।’’

136

ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক স্থানে বলা হয়েছে: ‘‘তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। তাদের প্রত্যেকের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করান হবে গলিত পুঁজ। যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে কিন্তু তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।’’

137

শাসন ও নিন্দাবাদের অর্থে একস্থানে বলা হয়েছে: ‘‘তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলোম প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।’’

138

আলাদা। অনেক সময় ভাষা ভাল না বুঝলেও এই ছন্দের প্রভাব হৃদয়ে অনুভব করা যায়।
136 সূরা: ৩২ সাজদা, ১৭ আয়াত।
137 সূরা: ১৪ ইবরাহীম, ১৫-১৭ আয়াত।
138 সূরা: ২৯ আনকাবূত, ৪০ আয়াত।
329

ওয়ায-উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ‘‘তুমি বল তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই, এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ বিলাস তাদের কোনো কাজে আসবে কি?’’139
আল্লাহর গুণবর্ণনায় বলা হয়েছে: ‘‘আল্লাহ অবগত আছেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যা কিছু কমে ও বাড়ে এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্ত্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।’’

140

(ছ) সপ্তম দিক: বিষয় পরিবর্তন ও সাহিত্যিকতা
মানবীয় কথায়, গল্পে, কাব্যে বা আলোচনায় যখন বিষয় পরিবর্তন করা হয় বা অনেক বিষয় আলোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা কঠিন হয়। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গমনের ক্ষেত্রে ভাষার গতিশীলতা বা কাব্যের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। এতে সাহিত্যকর্মের সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান ক্ষুণ্ণ হয়।
কুরআনে অতি সীমিত পরিসরে বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনী বা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়া হয়েছে। আদেশ, নিষেধ, সংবাদ, জিজ্ঞাসা,

139 সূরা: ২৬ শু‘আরা, ২০৫-২০৭ আয়াত।
140 সূরা: ১৩ রা’দ, ৮-৯ আয়াত।
330

সুসংবাদ, শাস্তির সংবাদ, নবুয়ত প্রমাণ, আল্লাহর একত্ব প্রমাণ, আল্লাহর গুণাবলির একত্ব আলোচনা, উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উদাহরণ উল্লেখ, কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে ভাষাশৈলীর ধারাবাহিকতা ও সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে। আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ যা দেখে হতবাক হয়ে যায়।
(জ) অষ্টম দিক: সংক্ষেপায়িত ব্যাপকতা অধিকাংশ স্থানে কুরআনের বাক্যাবলি অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। শ্রুতিমধুর সুন্দর কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থ ও ভাবের আবহ তৈরি করা হয়। নমুনা হিসেবে আমি পাঠককে কুরআনের ৩৮ নং সূরা, সূরা ‘সাদ’ পাঠ করতে অনুরোধ করছি। সূরাটির শুরুতেই অবিশ্বাসীদের সংবাদ, তাদের চরিত্র, আচরণ, অবিশ্বাসের কারণে পূর্ববর্তী জাতিগুলির ধ্বংসের সংবাদ, আরবের কাফিরগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবিশ্বাস করার কথা, তাঁর প্রচারিত একত্ববাদের বিষয়ে তাদের বিস্ময় প্রকাশ, অবিশ্বাসের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যের কথা, তাদের কথায় হিংসার প্রকাশ, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা, পৃথিবীতে ও পুনরুত্থানের পরে তাদের লাঞ্ছনার আগাম সংবাদ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রবণতা, আল্লাহ কর্তৃক

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

রোধকারী হত্যা ও রোধকৃত হত্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। শুধু বিশেষ প্রকারের হত্যা, অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড প্রদানই হত্যা রোধ করে।
(৩) আরবদের মধ্যে প্রচলিত বাক্য তিনটির মধ্যে সর্বোত্তম বাক্যে ‘হত্যা’ শব্দটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনে তা করা হয় নি। ফলে শব্দ ব্যবহারে আলঙ্কারিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
(৪) আরবদের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, হত্যা শুধু হত্যাই রোধ করে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, কিসাস হত্যা, আঘাত ইত্যাদি জীবনের জন্য ক্ষতিকর সকল কর্মই রোধ করে। এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের বাক্যটির অর্থ ব্যাপকতর।
(৫) হত্যা রোধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো, জীবন রক্ষা করা। আরবীয় বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায় না, বরং শুধু হত্যা রোধ করার বিষয়টিই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায়।
(৬) আরবীয় বাক্যটির অর্থ বিভ্রান্তিকর। বাক্যটি থেকে মনে হতে পারে যে, যে কোনো হত্যা হত্যা রোধ করে। যুলূম, অন্যায় বা বিনা বিচারে হত্যাকেও ‘হত্যা’ বলা হয়। এরূপ হত্যা কখনোই হত্যা রোধ করে না, বরং হত্যার প্রসার ঘটায়। আরবীয় বাক্যটি ভাল অর্থে বলা হলেও বাক্যটি থেকে ভুল বুঝার বা ভুল অর্থে

ব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি পরিপূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক অর্থ জ্ঞাপক।
(ঝ) নবম দিক: গাম্ভীর্য, শ্রুতিমধুরতা ও বিনম্রতার সমন্বয়
শব্দের গাম্ভীর্য-দৃঢ়তা এবং তার শ্রুতিমধুরতা ও বিনম্রতা মূলত দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ। মানবীয় সাহিত্যকর্মে দুটি দিক একত্রিত করা কষ্টকর। বিশেষত কথা লম্বা হলে তাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের ক্ষেত্রে এই দুটিগুণ সর্বদা রক্ষা করা মানবীয় অভ্যাসের ঊর্ধ্বে। কুরআনের সকল ক্ষেত্রে এ দুটি গুণ সমানভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে সাহিত্য মান অলৌকিক।
(ঞ) দশম দিক: আরবী ভাষালঙ্কারের সামগ্রিক প্রয়োগ
কুরআনে অলঙ্কারশাস্ত্রের সকল শিল্প প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বায়ন, রূপক, তুলনা, উৎপ্রেক্ষা, রূপালঙ্কার, শুরুর সৌন্দর্য, সমাপ্তির সৌন্দর্য, বাক্যশেষের সৌন্দর্য, অগ্রবর্তীকরণ, স্থানান্তরকরণ, প্রয়োজন অনুসারে বাক্যসমূহের সংযোজন, বিভাজন ইত্যাদি সকল আলঙ্কারিক শিল্প কুরআনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। দুর্বল, শ্রুতিকটু, অপ্রচলিত, ব্যবহারের অনুপযুক্ত বা বাজে শব্দ থেকে তা পরিপূর্ণ মুক্ত। কোনো ভাষার যাদুকর আরব সাহিত্যিকও

335

শেষের মিল ও ছন্দ, অভ্যন্তরীণ অর্থ ও অর্থের আবহ ইত্যাদি বিষয় আরবের ভাষাবিদ কাবি-সাহিত্যিকদের হতবাক করে দিয়েছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো, কোনো কুরআন বিরোধী গায়ের জোরেও যেন বলতে না পারে যে, অমুক বা তমুক সাহিত্যিক, কবি বা লেখকের লেখা থেকে এ কথাগুলি বা এ বিন্যাস চুরি করা হয়েছে। এভাবে কুরআন সকল মানবীয় কাব্য ও সাহিত্যের উপরে নিজের স্থান নিশ্চিত করেছে।
একজন কবি বা সাহিত্যিক তার গদ্য বা পদ্যে যত চেষ্টাই করুন, সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না এবং তার পুরো সাহিত্যকর্মকে নির্ভুল করতে পারবেন না। এজন্য কবি- সাহিত্যিকগণকে তাদের সাহিত্যের জন্য যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তাদের ভুলভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্য তাদের নিন্দাও করা হয়েছে। সকল জাঁদরেল কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ধরা পড়েছে। আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রপতিগণ আরবী ভাষায় তাদের পরিপূর্ণ দখল এবং ইসলামের প্রতি তাদের কঠিনতম শত্রুতা সত্ত্বেও তারা কুরআনের সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক ও বিন্যাসের মানের ক্ষেত্রে কোনো সমালোচনার সুযোগ পান নি। তারা এ বিষয়ে কুরআনের কোনো সমালোচনা করতে সক্ষম হন নি।
তারা স্বীকার করেন যে, কুরআন আরবীয় সাহিত্যিকদের গদ্য সাহিত্য বা কবিদের

337

কবিতা কোনোটির সাথেই তুলনীয় নয়। এর যাদুকরী আকর্ষণীতায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে ‘যাদু’ বলে অভিহিত করেছেন।

142 কখনো তারা
বলেছেন, এগুলি পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী

143 এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বানিয়েছেন

144। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছেন: ‘‘তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।’’

145

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তার অলঙ্কার, সর্বোচ্চ সাহিত্যমান ও সর্বোত্তম বিন্যাস পদ্ধতিতে অননুকরণীয় ও অলৌকিক।
আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যারা সংখ্যায় মরুভূমির বালুকা ও পাহাড়ি প্রান্তরের কাঁকরের মত অগণিত, যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট

142 নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ৭, ইউনূস: ২, হূদ: ৭, হিজর: ১৫, ইসরা: ৪৭, আনবিয়া: ৩, ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফ্ফাত: ১৫, সাদ: ৪, যুখরুফ: ৩০, আহকাফ: ৭, কামার: ২, মুদ্দাসি্সর: ২৪ আয়াত।
143 নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ২৫, আনফাল: ৩১, নাহল: ২৪, মুমিনূন: ৮৩, ফুরকান: ৫, নামল: ৬৮, আহকাফ: ১৭, কালাম: ১৫, মুতাফ্ফিফীন: ১৩ আয়াত।
144 নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা ফুরকান; ৪, সাবা: ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।
145 সূরা: ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস্সাজদা): ২৬ আয়াত।
338

জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভুতি সুপ্রসিদ্ধ, তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্ততি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ তাদের প্রতিপক্ষ সকল মানুষের সামনে তাদেরকে একটিমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন।
তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করছেন: ‘‘আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।’’

146

আরো বলেছেন: ‘‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’’

147

অন্যত্র বলছেন: ‘‘বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে

146 সূরা: ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।
147 সূরা: ১০ ইউনূস, ৩৮ আয়াত।
339

তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।’’

148

তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদের মতই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল। কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারীর যুদ্ধ গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বা এর বিপরীতে কোনো সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

149

148 সূরা: ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।
149 নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় 340

মন্তব্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, যা বিষয়টি নিশ্চিত করে।
৩. ১. ১. ৩. ভবিষ্যতের সংবাদ
তৃতীয় যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী তা হলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি পরবর্তীকালে ঠিক সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে:
(১) মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘‘আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাস্জিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।’’

150

(২) মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত-ক্ষমতাধর করবেন, যেভাবে তিনি ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং অব্যশই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না...’’।

151

150 সূরা: ৪৮ ফাত্হ, ২৭ আয়াত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয় পরে তা বাস্তবায়িত হয়।
151 সূরা: ২৪ নূর, ৫৫ আয়াত।

[illegible]

(г) [illegible]: ‘‘[illegible]

[illegible]’’.[152]

[152] [illegible]

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে।[153]

(৪) মহান আল্লাহ বলেন **: "**যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। "[154]

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করেছে।

(৫) আল্লাহ বলেন **: "**আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। "[155]

---

[153] ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় রাওয়ানা দেন। মদীনার মুনাফিকগণ এতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং মনে করে যে, মক্কার কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মুল করবে। তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ হুদাইবিয়ার সন্ধি শেষে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন মহান আল্লাহ সূরা ফাতহে নির্দেশ দেন, যে সকল মুনাফিক এ যাত্রা থেকে বিরত ছিল তারা পরবর্তী যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আহবান করা হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

[154] সূরা : ১১০ নাস্র, ১-২ আয়াত।

[155] সূরা : ৫ মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

344

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা করার ও তাঁকে ধরার বুক থেমে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই তার ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহর হেফাযতে থেকে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাসস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে গমন করেন।
(৬) আল্লাহ বলেন: ‘‘আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী) পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়)। কিন্তু তারা (রোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন থেকে দশ) বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।’’

156

পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নি উপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল খৃস্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগে

156 সূরা: ৩০, রূম, ১-৭ আয়াত।

থেকেই চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃস্টাব্দের দিকে (নবুয়তের ৮/৯ম বৎসরের দিকে, হিজরতের ৩/৪ বৎসর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

157 কিছু
সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে যায়। রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছালে মক্কার কাফিরগণ আনন্দিত হন। তারা বলে, তোমরা মুসলিমগণ এবং খৃস্টানগণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসীগণ আমাদেরই মত কোনো কিতাব মানে না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এভাবে আমরাও শীঘ্রই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়। পরাজয়ের প্রায় ৭ বৎসর পরে ৬২৭ খৃস্টাব্দে (৬ হি) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে

157 পারস্য সম্রাটের সেনাদল মিসর অধিকার পূর্বক উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কার্থেজ নগর আক্রমন করে। অপর একদল পারসিক সেনা এসিয়া মাইনর পুরোটাই রোমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়ী বেশে বস্ফোরাস প্রণালীর তীরে উপনীত হয়। দুর্দান্ত স্লাভ জাতির আক্রমনে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে রোমক সম্রাট পারসিক সেনাদলের গতিরোধ করতে অক্ষম হন। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪১।
346

শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হৃত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

158

(৭) মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।’’

159

এভাবে আল্লাহ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্ডিত তা জানেন। এ মহান নেয়ামতের জন্য প্রশংসা মহান আল্লাহর।
(৮) ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ‘‘বল, (হে ইয়াহূদীগণ,) ‘যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে কখনোই (যতক্ষণ জীবন আছে) তারা তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ যালিমদের বিষয়ে অবাহিত।’’

160

এ বিষয়ে সূরা জুমুআয় আবারো বলেছেন: ‘‘বল, হে ইয়াহূদীগণ, তোমরা যদি বিশ্বাস করে থাক যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়জন, অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের

158 মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪৭।
159 সূরা: ১৫ হিজ্র, ৯ আয়াত।
160 সূরা: ২ বাকারা, ৯৪-৯৫ আয়াত।
347

[illegible] [illegible] [illegible] [

করতে পারেন।

163

এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক
পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।

164

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি যদি তার তথ্য সংগ্রহে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্পের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ

163 নবুয়তের পূর্বে পূর্ববর্তী ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ আগ্রহ ছিল বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না। তিনি কখনো অন্য ধর্মের পন্ডিতদের নিকট যেয়ে এ সকল বিষয়ে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করেন নি বা আলোচনা করেন নি। চলতি পথে কোনো ব্যক্তি তাকে কিছু বললেও তা নিয়ে পরে চিন্তা গবেষণাও করেন নি।
164 যীশুখৃস্ট প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রপাঠ করেছেন বলে জানা যায় না, তবে তিনি ইহূদী সমাজে ইহূদী পন্ডিতদের মধ্যে বড় হয়েছেন, স্বভাবতই ইহূদী ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের বিষয়গুলি তিনি সমাজ ও পন্ডিতদের থেকে জেনেছেন। তারপরও যখন তিনি শরীয়ত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তখন ইহূদীরা আশ্চার্য হয়। বাইবেলে একে যীশুর অলৌকিকত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৭/১৫-১৬: ‘‘তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার।... 350

সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতেন না।

165

খৃস্টের ক্রুসেবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন প্রচলিত বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয়, অথবা তা ঐশ্বরিক প্রেরণা- নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে: ‘‘ইস্রায়েল সন্তানগণ যে

165 প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকাইলি রচিত ‘The Bible, The Qur'an and Science’ (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান) পুস্তকটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের অগণিত অবৈজ্ঞানিক, আজগুবি ও অবাস্তব গল্প-কাহিনী কুরআনে সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলের অতিরঞ্জনও কুরআনে পরিহার করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সন, তারিখ, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যাদি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তিনি যদি ইহূদী খৃস্টানদের থেকেই এ সকল গল্প কাহিনী গ্রহণ করতেন তবে তিনি এগুলি বাদ দিলেন কেন? বিশেষত, যে যুগে মানুষ এ সব সন, তারিখ, ইতহিাস ও অবাস্তব কাহিনীগুলি শোনার জন্য পাগল ছিল, এগুলিকেই অলৌকিকত্ব মনে করত, এবং এ সকল গল্প দিয়ে সহজেই মানুষের হৃদয় প্রভাবিত করা যেত, সে যুগে তিনি এগুলি পরিহার করলেন কেন? আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কুরআনের বর্ণনাই সঠিক এবং বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সকল বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন সেগুলির অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।’’

166

৩. ১. ১. ৫. মুনাফিকদের গোপন খবর
কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা গোপনে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটতো। আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে। প্রত্যেক বারেই তা সত্য বলে পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে।
৩. ১. ১. ৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজানা তথ্য কুরআনের অলৌকিত্বের ষষ্ঠ বিষয় হলো, কুরআনে এমন সব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিষয়াবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না এবং সাধারণভাবে আরবগণও জানত না। বিশেষত, শরীয়তের বিধিবিধান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ও যুক্তি, ইতিহাস, উপদেশ-ওয়ায, প্রজ্ঞাময় বাণী, পরকালীন জগতের সংবাদ, উন্নত আচরণ ও মহান চরিত্রের প্রশংসা ইত্যাদি। কুরআন

166 সূরা: ২৭ নাম্ল, ৭৬ আয়াত।

কারীম থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রসারিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে, ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞান-শাস্ত্র, ফিকহ ও বিধিবিধান বিষয়ক জ্ঞান-শাস্ত্র, আচরণ, চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শাস্ত্র ইত্যাদি।

167

৩. ১. ১. ৭. বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিমুক্তি
কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণী হওয়ার (Divinity) সপ্তম প্রমাণ স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে বিমুক্তি।

168

কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, একবারে তা

167 আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, কুরআন এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেছে যা শতবর্ষ পূর্বেও কোনো বৈজ্ঞানিক জানতেন না। বিস্তারিত জানতে দেখুন: Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science; A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam.
168 বাইবেলে কোথাও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল মানুষ। আবার কোথাও দেখতে পাই যে, তাকে অস্বাভাবিক বদরাগি ও কঠোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক ক্রোধে তিনি নিরপরাধ বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলছেন, নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে গালিগালাজ করছেন। নিঃসন্দেহে এই চিত্রায়ণ স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ২৩ বৎসরের দীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ কুরআনে এক্ষেত্রে অলৌকিক সুসামঞ্জস্যতা দেখতে পাই। ঈসা (আ)-কে সর্বদা সংবেদনশীল, ক্ষমাশীল ও দয়ালু রূপে দেখতে পাই। মূসা (আ)-কে দৃঢ়চেতা, দ্রুত উত্তেজিত ও দ্রুত সংযত দেখতে পাই।

প্রদত্ত হয় নি; বরং সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন অংশ অবতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন সূরার মধ্যে সংযুক্ত হয়। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে কোনো মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখা যেত। সুদীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ এরূপ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য ও অসংগতি না থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘‘তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।’’

169

উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘এ গ্রন্থ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’’

170

অর্থাৎ আকারে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র এরূপ অত্যাশ্চার্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান, অলঙ্কার ও রচনাশৈলী সংরক্ষণ করা, এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী, অদৃশ্য বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা, বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় করা এবং স্ববিরোধিতা থেকে বিমুক্ত থাকা কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থে হতে পারে না।

169 সূরা: ৪ নিসা, ৮২ আয়াত।
170 সূরা: ২৫ ফুরকান, ৬ আয়াত।
354

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৩. ১. ১. ৯. ক্লান্তিহীন প্রেমের স্থায়ী উৎস
কুরআনের অলৌকিত্বের নবম দিক হলো, এর পাঠক বিরক্ত হন না এবং শ্রোতা ক্লান্ত হন না। বারংবার পাঠের বা শ্রবণের ফলে ক্লান্তির পরিবর্তে ভালবাসাই বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য গ্রন্থ বা রচনা যত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মানেরই হোক না কেন, বারংবার পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে ক্লান্তি ও বিরক্তি এসে যায়। কিন্তু কুরআন এক অপার্থিব প্রশান্তি এনে দেয় পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে। এমনকি যে পাঠক বা শ্রোতা এর অর্থ বুঝতে পারছেন না তিনিও যদি একটু আবেগ ও মনোযোগ দিয়ে তা পাঠ বা শ্রবণ করেন তবে তিনি হৃদয়ে এক অপূর্ব-অপার্থিব তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করেন।
৩. ১. ১. ১০. হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্ত করা সহজ কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্থ করা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: ‘‘কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?’’172 এমনকি ছোট্ট ছোট্ট শিশুরাও অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই এ বৃহৎ গ্রন্থটি মুখস্থ করে ফেলে।

বর্তমান যুগেও অগণিত। শত বিরোধিতা ও অপপ্রচারের পরেও প্রতি বৎসরই হাজার হাজার মানুষ কুরআনের অলৌকিকত্বে ইসলাম গ্রহণ করছেন।
172 সূরা: ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত।
356

[illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible][173]

[173] [illegible]

৩. ১. ২. ২. ক্রমান্বয়ে অবতরণ
দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কুরআন একবারে একত্রে অবর্তীণ না হয়ে অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হলো কেন?
এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে বুঝা যায়:

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের অলৌকিক চিহ্ন (miracle) ছিল তাদের সমসাময়িকদের জন্য। তারা যেমন শুধু তাদের যুগের মানুষদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের অলৌকিক চিহ্নও ছিল শুধু তাদের যুগের মানুষদের জন্য। তাদের তিরোধানের পরে তা ‘সংবাদে’ পরিণত হয়েছে। একজন খৃস্টান দাবি করতে পারেন যে, যীশু মৃতকে জীবিত করতেন। কিন্তু খৃস্ট সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিকে তিনি তা দেখাতে পারবেন না। শুধু তার বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু ‘সংবাদ’ বলবেন। এমনকি এ সকল অলৌকিকত্বের পক্ষে ইতিহাস থেকেও কিছু তথ্য দিতে পারবেন না। ঐতিহাসিকভাবে যীশুর অস্তিত্বই প্রমাণিত নয়। যীশু নামে কোনো ব্যক্তি যিরূশালেমে ধর্মপ্রচার করেছেন এরূপ কোনো তথ্যই তাঁর সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নি, তাঁর অলৌকিকত্বের স্বীকৃতি তো অনেক দূরের কথা। অন্যান্য নবীদের অলৌকিত্বের অবস্থাও একই। পক্ষান্তরে কুরআন জীবন্ত ও অনন্ত অলৌকিক চিহ্ন। যে কোনো যুগে যে কোনো মুসলিম ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তির সামনে কুরআনকে অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে পেশ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, নবী-রাসূলদের অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার উদ্দেশ্য হলো আগ্রহী ব্যক্তিকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করা। যীশুর মৃতকে জীবিত করা, মোশির লাঠিকে সাপ বানানো ইত্যাদি কর্ম তৎকালীন কোনো কোনো মানুষকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করলেও তাদের তিরোধানের পরে কেউ আর তা দেখে বিশ্বাসী হন না। পক্ষান্তরে কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরস্থায়ী। সকল যুগেই এমন অনেক মানুষ 360

(□) □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ ‘□□□□□□□□ □□□□□’ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

[illegible]

(д) [illegible]

(е) [illegible]

(ж) [illegible]

(□) □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□**174**

□. □. □. □. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□**?**

(□) □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□

---

174 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

(д) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

(д) [illegible] ‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted], [redacted], [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

তাঁরা বলেন: আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য ও আলঙ্কারিক সুষমায় মন্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্দ্ধে। যদি তা আমরা স্বীকারও করি, তবে তা কুরআনের অলৌকিকত্বের জন্য পরিপূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে না, বরং অসম্পূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে। কারণ আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তারাই এ অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন। এছাড়া এতে প্রমাণিত হবে যে, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের গ্রন্থগুলি সবই আল্লাহ বাণী। সর্বোপরি অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও ঘৃণিত অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন:
প্রথমত: পাদরিদের প্রথম কথা ‘‘আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য ও আলঙ্কারিক সুষমায় মন্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্দ্ধে’’ ভিত্তিহীন গলাবাজি ও সুস্পষ্ট সত্যকে বুঝার পরেও গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

177

177 খৃস্টানগণ, বিশেষত, আরব খৃস্টানগণ, যাদের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি, কুরআনের ভাষার অভাবনীয় যাদুকরি প্রভাবের কথা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। শুধু ভাষার সৌন্দর্য অর্জন ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য 367

দ্বিতীয়ত: তাদের দ্বিতীয় কথা ‘‘আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তারাই এই অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন’’- কথাটি ঠিক হলেও এতে প্রমাণিত হয় না যে, তা কুরআনের অলৌকিকত্বের অসম্পূর্ণ প্রমাণ। বস্তুত, কুরআনের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক অলৌকিকত্ব ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকটেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্ভাসিত। কুরআনের মুকাবিলায় তাদের অক্ষমতা, অপারগতা ও তাদের স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করেছে। আরবী ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের স্বভাবজাত রুচি দিয়ে কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী অনুভব করেন। অন্যভাষার পণ্ডিতগণও আরবী ভাষার সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পান্ডিত্য

অনেক আরব খৃস্টান কুরআন পাঠ করেন। অনেকে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থও করেন। এজন্য আরবীয় খৃস্টান পন্ডিতগণ দীর্ঘ কয়েক যুগ চেষ্টা করে কুরআনের শব্দ, শব্দবিন্যাস, আয়াত বিন্যাস সব কিছু চুরি করে অবিকল কুরআনী শৈলীতে একটি আরবী বাইবেল লিখেছেন। এমনকি প্রত্যেক ‘অধ্যায়ের’ পূর্বে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখেছেন। বিভিন্ন খৃস্টান বেতার কেন্দ্র থেকে এই বাইবেল কুরআনের পদ্ধতিতে ‘কারিয়ানা’ তিলাওয়াত করা হয়। এত কিছুর পরেও যে কোনো সাধারণ আরব খৃস্টানও বুঝতে পারেন যে কুরআনের যাদুকরি প্রভাব এর মধ্যে নেই। কোনো আরব খৃস্টান আরবী ভাষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ বাইবেল পাঠ করেন না, পড়ে মজাও পাওয়া যায় না। বরং এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন সত্যই অলৌকিক এবং এর ভাষা ও শৈলী অননুকরণীয়। দেখুন, Ahmed Deedat, The Choice: Islam and Christiaanity, Vol-1, page 227-228.
368

আল্লাহ বাণী।’’ তাদের এ কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। কারণ:
(১) পূর্ববর্তী আলোচনায় কুরআনের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যমানের যে বিভিন্ন দিক আমরা দেখেছি এরূপ বিভিন্নমুখি সাহিত্যমান গ্রীক, ল্যাটিন বা অন্যান্য ভাষার কোনো পুস্তকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না।
(২) এ সকল পুস্তকের লেখকগণ তাদের নিজেদের ভাববাদিত্ব বা তাদের পুস্তকের অলৌকিকত্ব দাবি করেন নি।
(৩) এ সকল ভাষার অন্যান্য লেখক ও সাহিত্যিক সে সকল পুস্তকের অনুরূপ পুস্তক রচনা করতে অক্ষম হয়েছেন বলেও প্রমাণিত হয় নি।
যদি কেউ এ সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয় তিনটি দাবি করেন তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। তাকে গ্রীক, ল্যাটিন বা অন্য কোনো ভাষার কোনো একটি পুস্তক সম্পর্কে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত পুস্তকটিতে বিভিন্নমুখি অলৌকিক সাহিত্যমান রয়েছে, উক্ত পুস্তকের লেখক তার অলৌকিকত্ব দাবি করেছিলেন এবং সে ভাষার সাহিত্যিকগণ তার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় অক্ষম হয়েছিলেন। আর এ বিষয়গুলি প্রমাণ করতে না পারলে পাদরি সাহেবদের উপর্যুক্ত কথাটি ভিত্তিহীন ও অন্তসারশূন্য বাতিল কথা বলে গণ্য হবে।
আর এরূপ বিষয় দাবি ও প্রমাণ করতে হলে তাকে অবশ্যই কুরআনের ভাষায় ও দ্বিতীয় যে

370

ভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ বিদ্যমান বলে দাবি করছেন উভয় ভাষায় সুগভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে এরা কেউ নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার তেমন কিছুই জানেন না। অন্য ভাষার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও বহুবচনের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারেন না। অন্য ভাষার বিভক্তি চিহ্নের পার্থক্যও করতে পারেন না। কাজেই কোনটি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম, কোনটি উচ্চতর তা তারা কিভাবে বুঝবেন!
তাঁদের ভাষাগত দুর্বলতার একটি নমুনা দেখুন। ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম উর্বানের (Urban)

178

-এর নির্দেশে সিরিয়ার প্রধান
বিশপ সার্কিস হারূনী আরবী, গ্রীক, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অভিজ্ঞ বহুসংখ্যক পাদরি, সন্যাসী, পণ্ডিত ও ভাষাবিদকে একত্রিত করেন। তিনি তাদেরকে বাইবেলের আরবী অনুবাদটিকে পরিমার্জিত করতে দায়িত্ব দেন; কারণ আরবী অনুবাদটি অগণিত ভুলে ভরা ছিল। পোপের নির্দেশে ও বিশপের তত্ত্বাবধানে এ সকল পণ্ডিত প্রাণপন পরিশ্রম করে ১৬২৫ খৃস্টাব্দে বাইবেলের আরবী অনুবাদটি পরিমার্জন ও সংশোধন করে প্রকাশ করেন। কিন্তু এভাবে পরিপূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জনের পরেও এই অনুবাদের মধ্যে অগণিত ভুলভ্রান্তি থেকে যায়; কারণ

178 পোপ অষ্টম উর্বান ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ খৃস্টাব্দে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৪৩/১৬৪৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যমান ও অলঙ্কার ছাড়াই তিনি ঐশ্বরিক রহস্যাবলি আমাদেরকে প্রদান করেছেন।’’

179

চতুর্থত: পাদরিগণ বলেছেন, ‘‘অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও নিন্দনীয় অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়’’।
তাদের এ কথটি এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার কোনো অবকাশই নেই। কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণময় ও প্রশংসনীয় কথায় পরিপূর্ণ। কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলি সবই প্রশংসিত ও কল্যাণময়। যেমন:
(১) আল্লাহর মহান গুণাবলি বর্ণনা করা এবং অক্ষমতা, অজ্ঞতা, অত্যাচার ইত্যাদি সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা।
(২) বিশুদ্ধ একত্ববাদের প্রচার এবং সকল প্রকারের শিরক, বহু উপাস্য উপাসনা নিষেধ

179 মানব রচিত জাল গ্রন্থগুলির দুর্বলতা ও অক্ষমতা ঢাকতে কি অদ্ভুত যুক্তি!! কথাটির অর্থ হলো, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সৃষ্ট খাদ্যের প্রশস্ততাকে সুস্বাদু রান্নার মধ্যে সংকীর্ণ করতে চান নি। তাই তিনি কাঁচা খাদ্য গোবর মিষিয়ে পেশ করেছেন!! যেন খাদ্যের পুষ্টি পাওয়া যায় কিন্তু স্বাদের তৃপ্তি না মেলে!! খাদ্যের স্বাদ যেমন পুষ্টিকর খাদ্য সহজে ও তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করতে সাহায্য করে, ভাষার বিশুদ্ধতা ও উচ্চাঙ্গতা তেমনি ঐশ্বরিক সত্যকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। পবিত্র আত্মা কি সত্যকে দুঃসাধ্য করতে চান? 373

[illegible]

(г) [illegible]

(д) [illegible]

(е) [illegible]

(ж) [illegible]

(з) [illegible]

(и) [illegible]

(৭) আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহর প্রিয় মানুষদের প্রেম অর্জনে উৎসাহ প্রদান। পাপী ও অধার্মিকদের সাহচর্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করা।
(৮) সকল ক্ষেত্রে অন্তরের বিশুদ্ধতা ও শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া লাভের জন্য কর্ম করার গুরুত্ব বর্ণনা করা। লোক দেখানো বা লোক শোনানো কর্ম বা মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য কর্ম করার নিন্দা।
(৯) উত্তম আচরণ অর্জনের জন্য সাধারণভাবে ও বিস্তারিতভাবে উৎসাহ প্রদান করা, সদাচারণ ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা করা। অসদাচারণ ও অসৎস্বভাবের নিন্দা করা।
(১০) আল্লাহর ভয়, আল্লাহর যিকর-স্মরণ ও ইবাদতের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক উপদেশ ও আজ্ঞা প্রদান।
নিঃসন্দেহে জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও সকল ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে এ বিষয়গুলি প্রশংসিত। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং পাঠকের মনের গভীরে তাকে স্থায়ী আসন দেওয়ার জন্য কুরআনে এগুলি বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল বিষয় যদি নিন্দনীয় হয়, তবে প্রশংসনীয় বিষয় কী হবে?
তবে লক্ষণীয় যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের মধ্যে বহুল আলোচিত ও বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে

পুনরাবৃত্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না:
(১) বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে, ভাববাদী লোট (লূুত আ) মদ পান করে মাতাল হয়ে তার কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। দেখুন: আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।
(২) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে দায়ূদ উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং উরিয়কে কৌশলে হত্যা করেন। এরপর উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করেন। দেখুন: ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।
(৩) বাইবেলে আছে যে, হারোণ গোবৎসের প্রতিমা তৈরি করে তার পুজা করেন। দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৩২/১-৬।
(৪) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ্দ-মুশরিক হয়ে প্রতিমা পূজা করতে শুরু করেন এবং মুর্তিপূজার প্রচার প্রসারের জন্য মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। দেখুন: ১ রাজাবলি ১১/১-১৩।
(৫) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ভাববাদী একান্তই হিংসাবশত অন্য একজন ভাববাদীকে ঈশ্বরের ভাববানী বা ওহীর নামে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দেন এবং তার কথা বিশ্বাস করে প্রথম ভাববাদী ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে নিপতিত হয়ে নিহত হন। দেখুন: ১ রাজাবলি ১৩/১-৩০।
376

(৬) ইস্রায়েল বা যাকোবকে (ইয়াকূব আ.) বাইবেলে ঈশ্বরের প্রথমজাত (firstborn) পুত্র বা বড় ছেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের সকল ভাববাদী বা সকল হিব্রু ভাববাদীর মূল পিতা তিনিই। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে ইস্রায়েল (ইয়াকূব আ)-এর পুত্র যিহূদা আপন পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচার করেন এবং এ ব্যভিচারের ফলে অবৈধ জারজ সন্তান ‘পেরস’ এর জন্ম হয়। দায়ূদ, শলোমন ও যীশু- ঈশ্বরের এ তিন পুত্র

180

সকলেই এ যারজ সন্তানের বংশধর ছিলেন। দেখুন: আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।
(৭) বাইবেলে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে ইস্রায়েলের প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে পুত্র রূবেন তার পিতার ‘বিলহা’ নামের উপপত্নীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র ইস্রায়েল তার প্রথমজাত পুত্রের নিজ বিমাতার সাথে ব্যভিচার এবং চতুর্থ পুত্রের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারের সংবাদ জানার পরও তাদেরকে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে শাস্তি প্রদান

180 ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এরা তিনজনই ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম জন ঈশ্বরের বড় ছেলে (firstborn) এবং স্বয়ং জন্মদেওয়া (begotten) ছেলে, দ্বিতীয় জন ঈশ্বরের ছেলে এবং তৃতীয়জন ঈশ্বরের একমাত্র জন্মদেওয়া ছেলে (only begotten son)। ঈশ্বরের এ তিন পুত্রই জারজ সন্তানের বংশধর।

করেন নি। উপরন্তু ব্যভিচারী যিহূদাকে পরিপূর্ণ বরকত ও চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ বা দুআ করেন। তিনি তাঁর পুত্রগণের মধ্যে এ যিহূদার জন্য সবচেয়ে বেশি দুআ করেন। যাত্রাপুস্তক ৪/২২-২৩; আদিপুস্তক ৩৫/২২, ৪৯/১-২৮।
(৮) আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বরের আরেকজন প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে (firstborn) এবং জন্মদেওয়া পুত্র (begotten son) দায়ূদ আলাইহিস সালাম। বাইবেলের বর্ণনানুসারে তিনি নিজেই পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করতেন। এ ছাড়াও বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ বড় ছেলের (দায়ূদের) প্রিয় পুত্র তারই প্রিয় কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র তার পুত্র ও কন্যার ব্যভিচারের সংবাদ জানতে পারেন। মোশির ব্যবস্থা অনুসারে ব্যভিচারীর যে শাস্তি পাওনা সে শাস্তি তিনি তার পুত্র-কন্যাকে প্রদান করেন নি। দেখুন: গীতসংহিতা ২/৭, ৮৯/২৭, ২ শমূয়েল ১৩/১-৩৯।
(৯) খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু খৃস্টের ১২ জন প্রেরিতের মর্যাদা মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়েও বেশি। এ মহান মর্যাদার অধিকারী প্রেরিত শিষ্যদের একজন ছিলেন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscariot), যিনি অলৌকিক চিহ্নাদির

অধিকারী প্রেরিত রাসূল ছিলেন

181। এ মহান
প্রেরিত একজন চোর ছিলেন। তার কাছে টাকার থলি থাকত এবং তাতে যা রাখা হতো তিনি তা চুরি করতেন।

182 এ মহান প্রেরিত শিষ্য মাত্র
ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দেন। এ সামান্য অর্থের জন্য তিনি তার ঈশ্বরকে ইয়াহূদীদের হাতে তুলে দিতে রাযি হয়ে যান। ইয়াহূদীরা তার ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করে।

183

(১০) ইয়াহূদী মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) ঈশ্বরের একজন ভাববাদী (prophet) বা নবী ছিলেন বলে সুসমাচার লেখক যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন

184। এ ভাববাদী
যীশুকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী (কাফির) বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাকে হত্যা করার রায় প্রদান করেন।

185

খৃস্টানদের বিশ্বাসানুসারে যীশুই ঈশ্বর (God Incarnate)। তাহলে কায়াফা ছিলেন যীশুরই একজন ভাববাদী। আর এ ভাববাদী স্বয়ং তার ঈশ্বরকে মিথ্যবাদী ও কাফির বলে ঘোষণা করলেন, তাকে লাঞ্ছিত করলেন এবং তাকে হত্যা করার রায় দিলেন!

181 মথি ১০/১-৮; মার্ক ৩/১৪-১৫; লূক ৬/১৩।
182

যোহন ১২/৬।
183 মথি ২৬/১৪-১৬, ২৭/৩-৯; মার্ক ১৪/১০-১১; লূক ২২/৩-৬; যোহন ১৮/১-৫।
184 যোহন ১১/৪৯-৫১।
185 মথি ২৬/৫৭-৬৮; মার্ক ১৪/৫৩-৬৫; লূক ২২/৫৪-৭১; যোহন ১৮/১২-২৪।

এ ধরনের আরো অনেক নোংরা ও ঘৃণিত বিষয় বাইবেলের মধ্যে রয়েছে। খৃস্টান ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকদের কাছে এগুলি সুপরিচিত। তাঁরা এ সকল কথা সঠিক, নির্ভুল ও ধর্মগ্রন্থের বাণী বলে বিশ্বাস করেন। এ সকল বিষয়কে তারা উচ্চাঙ্গের ভাবসম্পন্ন, সুন্দর, মহান, আত্মার খোরাক ও সুরুচিসম্পন্ন বিষয় বলে গণ্য করেন। সম্ভবত এ সকল ‘‘উচ্চাঙ্গের ভাবসম্পন্ন, সুন্দর ও মহান বিষয় (ব্যভিচার, অনাচার, অগম্য-গমন, মিথ্যা, ঈশ্বর ও ভাববাদীগণের নিন্দাজ্ঞাপক কথা, মূর্তিপূজা, বুদ্ধি বিরোধী কথা ইত্যাদি) যদি কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান থাকত তবে হয়ত খৃস্টান পাদরি ও যাজকগণ কুরআনকে ‘ঈশ্বরের বাণী’ (God's Word) বলে মেনে নিতেন। কিন্তু যেহেতু কুরআনের মধ্যে এ সকল ‘মহান’ বিষয় ও অনুরূপ বিষয়াদি আলোচিত হয় নি, সেহেতু তারা কুরআনকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানতে পারছেন না।
৩. ১. ৩. ২. বাইবেল ও কুরআনের বৈপরীত্য পাদরিগণ উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তিতে তাঁরা বলেন: ‘‘অনেক স্থানে কুরআনের বক্তব্য পুরাতন ও নতুন নিয়মের বক্তব্যের বিরোধী, কাজেই কুরআন ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না।’’
আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন:
(ক) ইতোপূর্বে আমরা নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের এ সকল পুস্তক যে

প্রকারের (১) রহিত বিধানাবলি সম্পর্কিত,
(২) এমন কিছু বিষয় যেগুলি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোনো পুস্তকে নেই এবং (৩) এমন কিছু বিষয় যা কুরআনে ও বাইবেলে রয়েছে, কিন্তু এগুলির বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা বাইবেলের বর্ণনার বিপরীত। এ তিন প্রকার বৈপরীত্যই পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই এগুলির কোনোটিকেই কুরআনের ত্রুটি হিসেবে নির্দেশ করার অধিকার পাদরিগণের নেই।
প্রথমত, প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, রহিতকরণ শুধু কুরআনের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বাইবেলের মধ্যেও তা বিদ্যমান। কাজেই কুরআন যদি পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু বিধান রহিত করে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। পাঠক দেখেছেন যে, পুরাতন নিয়মের অনেক বিধান নতুন নিয়মে রহিত করা হয়েছে। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান খৃস্টান নতুন বা পুরাতন নিয়মের কোনো বিধান রহিত করার কারণে কুরআনকে দোষ দিতে পারেন না। তাহলে তো প্রমাণিত হবে যে, নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি ‘ঈশ্বরের বাণী’ নয়; কারণ তা পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত করেছে। ইযহারুল হক্ক গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে প্রকাশ্য বিতর্কে পাদরি ড. ফান্ডার স্বীকার করেন যে, তাওরাত ও ইঞ্চিলের মধ্যে নাসখ বা রহিতকরণ বিদ্যমান। কিন্তু বিতর্কের আগে তিনি তাওরাত ও

382

ইঞ্জিলের মধ্যে নাসখ বা রহিতকরণের বিদ্যমানতা কঠিনভাবে অস্বীকার করতেন। দ্বিতীয়ত, বাইবেলে উল্লেখ করা নেই এরূপ কোনো তথ্য কুরআনে বিদ্যমান থাকলে তা কুরআনের কোনো ত্রুটি বলে গণ্য করা খৃস্টানদের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এরূপ তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা যদি পরবর্তী গ্রন্থের ত্রুটি বলে গণ্য করা হয় তবে তাতে নতুন নিয়ম ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হবে; কারণ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা নেই এরূপ অনেক তথ্য নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান রয়েছে।

186 এখানে
সামান্য কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে:
(১) যিহূদার পত্রের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে: ‘‘কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভৎর্সনা করুন।’’ মোশির দেহের বিষয়ে মীখায়েলের সাথে দিয়াবলের এই বাদানুবাদের কথা পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই উল্লেখ নেই।

186 বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা নেই এরূপ অনেক তথ্য নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। আবার পুরাতন নিয়মের পূববর্তী পুস্তকে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য পরবর্তী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য প্রেরিতগণের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
383

(২) ইব্রীয় ১২/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, ‘আমি নিতানতই ভীত ও কম্পিত হইতেছি’’।
এখানে পৌল মোশি, তাঁর সিনয় পর্বতে গমন
ও তথায় মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ১৯ অধ্যয়ে

187। কিন্ত সেখানে বা পুরাতন নিয়মের কোথাও মোশির এ কথা উল্লেখ করা হয় নি। ‘‘মোশি কহিলেন, ‘আমি নিতানতই ভীত ও কম্পিত হইতেছি’’- এ কথা কোথাও নেই।
(৩) ২ তিমথীয় ৩/৮: ‘‘আর যান্নি ও যামিব্র যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহারা সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে।’’
ফরৌণের মন্ত্রবেত্তাগণ কর্তৃক মোশির প্রতিরোধের ঘটনা বিস্তারিত যাত্রাপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি নামের উল্লেখ সেখানে নেই। যাত্রা পুস্তকের অন্য কোনো অধ্যায়ে বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকের কোথাও এই নাম দুটির অস্তিত্ব নেই।
(৪) ১ করিন্থীয় ১৫/৬ শ্লোকে যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের পরে বিভিন্ন শিষ্যকে সাক্ষাত দানের বিষয়ে বলা হয়েছে: ‘‘তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি

187 যাত্রাপুস্তক ১৯/১৪-২৫।
384

বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে।’’
সুসমাচার চতুষ্ঠয়ে এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণের কোথাও এ পাঁচশতাধিক শিষ্যকে দেখা দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ নেই। এ সকল বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে লূকের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল সবচেয়ে বেশি। অথচ তিনিও এ বিষয়ে কিছুই লিখেন নি।
(৫) নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে স্বর্গ, নরক, পুনরুত্থান, বিচার, কর্মের প্রতিদান ইত্যাদির কথা সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করা হয়েছে

188। কিন্তু মোশির পাঁচটি পুস্তকে (Torah or Pentateuch) এ সকল বিষয়ের কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং সেগুলিতে শুধু জাগতিক লাভক্ষতির বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, পরকাল বা স্বর্গ-নরকের কথা কিছুই নেই। ঈশ্বর সদাপ্রভুর নির্দেশ যারা পালন করবে তাদের পৃথিবীতে কত প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে এবং যারা ঈশ্বরের নির্দেশ না মানবে পার্থিব জীবনে তাদের কি কি শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া হবে সেগুলিই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।
(৬) মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে যীশু খৃস্টের বংশাবলি পত্রে সরুববাবিলের পরে- সরুববাবিল ও যোষেফ-এর মধ্যে- নয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছ; যাদের কারো

188 মথি ৫/২২, ১০/২৮, ২৩/১৫, ২৫/৪৬; মার্ক ৯/৪৩-৪৪; লূক ২৩/৪৩...।

কোনোরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।

189

এরূপ আরো অগণিত উদাহরণ বাইবেলের পুস্তকাদিতে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এমন কোনো তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হলে তা কখনোই পরবর্তী গ্রন্থের ঐশ্বরিকত্বের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে না। তাই যদি হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে, ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলি মিথ্যা, কারণ এতে অনেক কথা আছে যা তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকে নেই। বস্তুত, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে সবকিছুই উল্লেখ থাকা জরুরী নয়।
তৃতীয়ত, কুরআনের মধ্যে বাইবেলের পুস্তকাবলিতে উল্লিখিত তথ্যাদির বিপরীত বা বিরোধী তথ্য উল্লেখ করার কারণে কুরআনের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ খৃস্টানদের নেই; কারণ এ জাতীয় বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বাইবেলের মধ্যেই বিদ্যমান। এরূপ বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বিদ্যমান রয়েছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এক পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের, নতুন নিয়মের এক পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের এবং নতুন নিয়মের সাথে

189 সরুববাবিল ও যোষেফ-এর মধ্যে নয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছ। তারা হলেন: অবীহূদ, ইলীয়াকীম, আসোর, সাদোক, আখীম, ইলীহূদ, ইলিয়াসর, মত্তন ও যাকোব। এদের কারো কোনোরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।

[illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

নি। তাঁরা অতিকথন ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন। যেমন চতুর্থ সুসমাচারের লেখক যোহন বলেছেন: ‘‘যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে, জগতেও তাহা ধরিত না।’’

190

নিঃসন্দেহে কথাটি একান্তই মিথ্যা এবং আপত্তিকর কাব্যিক অতিরঞ্জন। এরূপ কথা জ্ঞানীকে প্রভাবিত না করলেও সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে।
৩. ২. ১. ২. শিয়াগণের বিভ্রান্তি বনাম খৃস্টীয় বিভ্রান্ত সম্প্রদায়
হাদীসের গ্রহণযোগ্যতায় সন্দেহ সৃষ্টির জন্য পাদরিগণ সাহাবীগণের বিষয়ে দ্বাদশ ইমাম পন্থী শিয়াদের আপত্তিকর কথাবার্তা উদ্ধৃত করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন। এর উত্তরে প্রথমত আমরা বলব যে, শিয়াদের ভিত্তিহীন প্রমাণবিহীন কথাবার্তা যদি সাধারণ মুসলিমদের জন্য মান্য করা বাধ্যতামূলক হয়, তবে খৃস্টান ধর্মের বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কথাবার্তাও সাধারণ খৃস্টানদের মান্য করা বাধ্যতামূলক হবে। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মের ভিত্তিই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। প্রথম খৃস্টীয় শতক থেকে খৃস্টানদের মধ্যে অগণিত দল প্রকাশিত হয়েছে যারা এমন সব কথা বলেছেন ও ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেছেন যা মূলধারার খৃস্টানগণ কুফরী ও

190 যোহন ২১/২৫।
389

বিভ্রান্তি বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন কোনো কোনো সম্প্রদায় দুজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত; একজন কল্যাণের স্রষ্টা এবং অন্যজন অকল্যাণের স্রষ্টা। তারা বিশ্বাস ও প্রচার করত যে, তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্য সকল পুস্তক অকল্যাণের স্রষ্টা দ্বিতীয় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। মৃত্যুর পরে যীশুখৃস্ট নরকে গমন করেন। তিনি নরক থেকে (ভাতৃহন্তা আদমপুত্র) কয়িনকে এবং (সমকামী) সদোমবাসীদেরকে মুক্ত করেন এবং (নিহত আদমপুত্র) হেবল, নোহ, আবরাহাম ও অন্য সকল প্রাচীন ভাববাদী ও সৎ মানুষকে নরকের মধ্যে রেখে আসেন। মোশিকে যিনি তোরাহ দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয় ভাববাদীদের সাথে যিনি কথা বলেছেন তিনি ঈশ্বর নন, বরং তিনি শয়তান বা দিয়াবল। ঈসার পূর্বে যত নবী-রাসূল বা ভাববাদী আগমন করেন তাঁরা সবাই চোর ও দস্যু ছিলেন।

191

অনুরূপ অনেক সম্প্রদায়ের অনেক প্রকারের বিশ্বাস ছিল। নিঃসন্দেহে খৃস্টানগণ বলবেন যে, এগুলি সবই বাতিল ও কুফরী বিশ্বাস ও ভিত্তিহীন কথা; মূলধারার খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এ সকল কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। অনুরূপভাবে আমরাও বলব যে, এ সকল

191 যোহনলিখিতি সুসমাচারের ১০/৮ শ্লোকে যীশু বলেন: ‘‘যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু।’’ খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তাঁরা এরূপ বলত।
390

খৃস্টান সম্প্রদায়ের কথা যদি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা না যায় তাহলে মূল ধারার মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়গুলির বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। বিশেষত সাহাবীদের বিরুদ্ধে তাদের এ সকল কথা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলির বিরোধী এবং শিয়াদের পবিত্র ইমামগণের বক্তব্যেরও বিরোধী। কুরআন বারংবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, সাহবীরা কখনোই ঈমান বা ইসলামের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন নি। এখানে আমি এ বিষয়ক কিছু আয়াত উল্লেখ করছি।
৩. ২. ১. ৩. সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআনের সাক্ষ্য
(১) সূরা তাওবায় মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই মহা-সাফল্য।’’

192

এখানে আল্লাহ প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আবূ বাক্র সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান যুন্নুরাইন- রাদিয়াল্লাহু

192 সূরা তাওবা, ১০০ আয়াত।
391

আনহুম সকলেই প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে আলী (রা)-ও প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা চারজনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং তাদের খিলাফতের বৈধতাও প্রমাণিত হলো। কাজেই চতুর্থজনের বিরুদ্ধে নিন্দা বা আপত্তি যেমন বাতিল, তেমনিভাবে প্রথম তিনজনের বিরুদ্ধে নিন্দা বা আপত্তিকর কথা এ আয়াতের ভিত্তিতে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহাবীর বিষয়েও আপত্তি বা নিন্দা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে; কারণ তাঁরা অগ্রগামী মুহাজির-আনসার বা তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী।
(২) সূরা তাওবার মধ্যে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: ‘‘যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি। সেথায় তারা অনন্তকাল চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহর নিকটেই আছে মহা-পুরস্কার।’’

193

এখানে আল্লাহ হিজরতকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুমিনদের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: (১) তাদের মর্যাদা

193 সূরা তাওবা, ২০-২২ আয়াত।
392

□□□□□□□, (□) □□□□□ □□□□□□□, (□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ (□) □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□: ‘□□□□□□□ □□□□-□□□□□□□’, ‘□□□□□□□□□□□’ □ ‘□□□□□□□□□’□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

(□) □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□: ‘‘□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□; □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□□□-□□□□□□□□’’**194**

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□-□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

[194] □□□□□ □□□□□□, □□-□□ □□□□□□

কল্যাণ, সফলতা ও অনন্ত জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে চার খলিফা মুমিন মুজাহিদদের অন্যতম ছিলেন। কাজেই তাঁদের জন্য কল্যাণ, সফলতা ও অনন্ত জান্নাত এবং তাদের খিলাফতের বৈধতাও প্রমাণিত হলো। তাঁদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য মুমিন মুজাহিদ সাহাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি বা নিন্দাচারের কোনো সুযোগ নেই।
(৪) আল্লাহ বলেন: ‘‘তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে ....। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকার্যের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।’’

195

এখানে ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত মুহাজিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করলে তারা চারটি কাজ করবেন: সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকার্যে আদেশ করা এবং অসৎকার্যে নিষেধ করা। আল্লাহ খলীফা চতুষ্টয়কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন এবং তাঁদের সময়ে ইসলাম বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা এই চারটি কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা সত্যপন্থী ও সঠিক ছিলেন।

195 সূরা হাজ্জ, ৪১ আয়াত।
394

(ग) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ''[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

(г) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]: ‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

(б) [illegible] "[illegible]

[illegible]

[illegible][199]

[illegible]

[199] [illegible]

(৮) সূরা হাশরে আল্লাহ বলেন: ‘‘অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যপরায়ণ। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিদরদেকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাগগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।’’

200

এই আয়াতে আল্লাহ মুহাজিরদের প্রশংসায় বলেছেন যে, তাঁদের হিজরত বা দেশত্যাগ জাগতিক কোনো স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনাতেই তাঁরা হিজরত করেন, তাঁরা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁরা কথা-কর্মে সত্যপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। আর আনসারগণের প্রশংসায় আল্লাহ বলেছেন যে, আনসারগণ মুহাজিরদের ভালবাসতেন; মুহাজিরগণ কোনো কিছু লাভ করলে আনসারগণ খুশি হতেন এবং আনসারগণ নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

200 সূরা হাশর, ৮-৯ আয়াত।

নিঃসন্দেহে এ সকল গুণ ঈমানের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। এ সকল দরিদ্র মুহাজির আবূ বাক্র (রা)-কে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা। আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ সকল মুহাজির সত্যবাদী ছিলেন। কাজেই আবূ বাকরের এই উপাধিও সত্য হওয়া জরুরী। আর এমতাবস্থায় আবূ বাক্রের ইমামতে সন্দেহ পোষণের কোনো সুযোগ থাকে না। মুহাজির ও আনসারগণের বিষয়ে এর ব্যতিক্রম বা বিপরীত কোনো আকীদা বা ধারণা পোষণকারী নিঃসন্দেহে কুরআন অমান্যকারী।
(৯) সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ বলেন: ‘‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।’’

201

এখানে আল্লাহ সাহাবীগণের প্রশংসায় বলেছেন যে, তাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, তাঁরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করতেন এবং অসৎকার্যে নিষেধ করতেন এবং তাঁরা মুমিন ছিলেন। নিঃসন্দেহে চার খলিফা এ প্রশংসিত উম্মাতের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের বিষয়ে এর ব্যতিক্রম ধারণা বা বিশ্বাস কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ও বাতিল।
৩. ২. ১. ৪. সাহাবীগণের বিষয়ে শিয়া ইমামগণের বক্তব্য
শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা আলী (রা) ও তাঁর বংশের যে সকল মহান ব্যক্তিকে ইমাম

201 সূরা আল-ইমরান, ১১০ আয়াত।
401

[illegible]

(ა) ‘[illegible]’ [illegible][202]

[illegible] **(ბ)** [illegible]: ‘‘[illegible] ‘[illegible]’[illegible] **(ა)** [illegible], **(ბ)** [illegible], **(გ)** [illegible] **(**[illegible]**)** [illegible], **(დ)** [illegible], **(ე)** [illegible], **(ვ)** [illegible], **(ზ)** [illegible], **(თ)** [illegible], **(ი)** [illegible], **(კ)** [illegible]

[202] [illegible] ‘[illegible] (ბ) [illegible]’-[illegible] [illegible] [illegible] [

বহুমুখি পথের সামনে রেখে, যেখানে বিভ্রান্ত পথ পায় না কিন্তু সুপথপ্রাপ্ত নিশ্চিত হতে পারে।’’
প্রসিদ্ধ শিয়া পণ্ডিত ও ‘নাহজুল বালাগা’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার মাইসাম ইবনু আলী আল-বাহরানী (৬৮১হি/১২৮২খৃ) এবং ‘নাহজুল বালাগা’ গ্রন্থের অন্যান্য অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এখানে ‘অমুক’ বলতে আবূ বাক্র (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, ‘অমুক’ বলতে এখানে ‘উমার’ (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।

203

এখানে আলী (রা) আবূ বাক্র (রা) বা উমারের (রা) ১০টি গুণ উল্লেখ করেছেন। এগুলি অবশ্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আবূ বাক্র (রা) বা উমারের (রা) মৃত্যুর পরেই আলী (রা) এ সকল গুণের কথা বলেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা এরূপই ছিলেন এবং আলীর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে সত্যপরায়ণ ও সঠিক ইমাম ও খলীফা ছিলেন।
‘নাহজুল বালাগা’ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) এক পত্রে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)

203 আবূ বাকর (রা) ও উমারের (রা) বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগের শিয়াদের ঘৃণা এত বেশি ছিল যে, তাঁদের নাম নেওয়াকেও তাঁরা পাপ ও অপবিত্র কাজ বলে মনে করত। এজন্য আলীর (রা) এই বক্তব্য থেকে মূল নামটি তারা মুছে ফেলে সেখানে ‘অমুক’ শব্দ উল্লেখ করেছে। এভাবেই সংকলক বক্তৃতাটি সংকলন করেছেন। এজন্য শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।
403

সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘আল্লাহর শপথ, ইসলামে তাঁদের দুজনের মর্যাদা অত্যন্ত মহান। তাদের সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলা ইসলামের জন্য বড় কঠিন আঘাত। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে তাঁদের মহান কর্মগুলির জন্য পুরস্কার প্রদান করুন।’’
(২) আলী ইবনু ঈসা আল-আরদাবীলী (৬৯২হি/১২৯৩খৃ) একজন প্রসিদ্ধ দ্বাদশইমাম-পন্থী শিয়া ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। দ্বাদশ-ইমামপন্থী শিয়াগণ তাকে একজন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বলে গণ্য করেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ ‘‘কাশফুল গুম্মাহ ফী মা’রিফাতিল আইম্মাহ’’ (ইমামদের পরিচয়ে অন্ধকারের অপসারণ)। এ পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন: ‘‘ইমাম আবূ জা’ফর মুহাম্মাদ আল-বাকির

204

-কে তরবারীতে
কারুকার্য করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তা করা যায়; কারণ আবূ বাকর সিদ্দীক নিজের তরবারী কারুকার্য করাতেন। তখন বর্ণনাকারী বলেন, আপনি এভাবে আবূ বাকরকে ‘সিদ্দীক’ (মহা-সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক) উপাধিতে ভূষিত করছেন?

204 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু আলী যাইনুল আবেদীন (৫৭-১১৪ হি/৬৭৬-৭৩২খৃ)। শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ইমামগণের পঞ্চম ইমাম। পূর্ববর্তী চার জন: (১) আলী (রা), (২) আলীর পুত্র হাসান (রা), (৩) আলীর পুত্র হুসাইন (রা) এবং (৪) হুসাইনের পুত্র (বাকিরের পিতা) আলী যাইনুল আবেদীন (রাহ)।
404

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তখন তিনি বলেন, তাহলে তোমরা কি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: ‘‘মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিদরদেকে ভালবাসে’’

206? তারা বলে, না
আমার তাও নই।
তখন তিনি বলেন, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিলে যে, কুরআনে উল্লিখিত এই দুই দলের সাথে তোমাদের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। আর আমি তোমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কুরআনে উল্লিখিত তৃতীয় দলের সাথেও তোমাদের সম্পর্ক নেই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: ‘‘যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আপনি পরম দয়ার্দ্র ও মহা করুণাময়।’’

207

এখানে ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) সত্যিকার ‘সিদ্দীক’ বা মহা- সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক ছিলেন। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি আবূ বাকর

206 সূরা হাশর, ৯ আয়াত।
207 সূরা হাশর, ১০ আয়াত।
406

[illegible] (**[illegible]**), [illegible] [illegible] (**[illegible]**) [illegible] [illegible] [illegible] (**[illegible]**)-[illegible] [illegible] [illegible] [

মতই অলিখিত মৌখিক বর্ণনার (tradition) উপর নির্ভর করেছেন। উপরন্তু ইয়াহূদীরা লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেলের চেয়েও অধিকতর নির্ভর করেন অলিখিত মৌখিক বর্ণনার উপর। ক্যাথলিক খৃস্টানগণ লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেল ও অলিখিত মৌখিক বর্ণনা উভয়কেই সমান গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বর্ণনাই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উভয়ের উপরেই সমানভাবে নির্ভর করতে হবে।
৩. ২. ২. ১. ইয়াহূদী ধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা
ইয়াহূদীগণ তাদের ধর্মীয় বিধান বা শরীয়ত (Law) দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ লিখিত শরীয়ত (scriptural laws), যাকে তারা তোরাহ বলত এবং দ্বিতীয় ভাগ মৌখিক শরীয়ত (oral laws), যেগুলি ধর্মগুরু ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের (elders) মাধ্যমে যুগ পরম্পরায় তাদের নিকট পৌঁছেছে। তারা দাবি করেন যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর মোশিকে সিনাই পর্বতে এ দু প্রকার বিধানই প্রদান করেন। আমাদের নিকট এক প্রকারের বিধান লিখিতভাবে পৌঁছেছে এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিধান ধর্মগুরুদের মাধ্যমে মৌখিকভাবে পৌঁছেছে। এজন্য তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বিধানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, উভয়ই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এবং উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। বরং তারা দ্বিতীয় প্রকার বিধান বা অলিখিত
408

বিচারে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।
৩. ২. ২. ২. খৃস্টধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা
অলিখিত মৌখিক বর্ণনা বা শ্রুতির উপরে নির্ভর করার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের অবস্থা আমরা জানতে পারলাম। এবার আসুন এ বিষয়ে প্রাচীন খৃস্টানদের অবস্থা পর্যালোচনা করি। খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মযাজক ও ঐতিহাসিক ইউসিবিয়াস প্যাম্ফিলাস (Eusebius Pamphilus) (২৬৩-৩৩৯খৃ)। তাঁর রচিত ‘যাজকীয় ইতিহাস’ (Ecclesisatical History) প্রথম তিন শতকের খৃস্টান ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই পুস্তকটিকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করেছেন। ইউসিবিস তার এ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম তিন শতাব্দীর খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মূলত মৌখিক বর্ণনার উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁরা খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় শিক্ষা ও নসীহতের ক্ষেত্রে লিখিত গ্রন্থ, সুসমাচার, পত্র ইত্যাদির চেয়ে মৌখিক বর্ণনা বা শ্রুতির উপরেই বেশি নির্ভর করতেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করছি।
414

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ধর্মগুর ক্লিমেন্টের (Clement of Alexadria) আলোচনা প্রসঙ্গে ইউসিবিস বলেন, যীশুর প্রেরিত শিষ্য যাকোব (James)-এর বর্ণনায় ক্লিমেন্ট পিতা-পিতামহদের বা পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌখিক বর্ণনা (tradition)-এর নির্ভর করে অনেক তথ্য লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি এ সকল তথ্য যাদের থেকে শিখেছেন তাদের একজন ছিলেন সিরিয়, যিনি গ্রীসে বসবাস করতেন। আরেকজন ছিলেন আসিরিয়। আরেকজন ছিলেন ফিলিস্তিনে বসবাসরত হিব্রু পণ্ডিত। তবে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন তিনি একজন গুরুর উপর যিনি মিসরে আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনিই ছিলেন তার শিক্ষকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে তিনি আর কোনো শিক্ষক সন্ধান করেন নি। পিতর (Peter), যাকোব (James), যোহন (John) এবং পৌল (Paul) থেকে যে সকল শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে, সে সকল বর্ণনা তাঁরা মুখস্থ করেছেন।
দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মগুরু আরিনাউস (Irenaeus) থেকে ইউসিবিস উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি মূলত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন। তিনি তার মৌখিক বর্ণনা পোলিকার্পের (St. Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) ও অন্যান্যদের মুখ থেকে সংগ্রহ করেন।

আরিয়ানুস গৌরব করে বলতেন যে, কোনো কিছু কাগজে লিখে রাখার বদ-অভ্যাস তার ছিল না। প্রথম থেকেই তার অভ্যাস ছিল সব কিছু শুনে হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এন্টিয়কের দ্বিতীয় বিশপ ইগনাটিয়াস (Ignatius)

208 এশিয়া মাইনরের
বিভিন্ন চার্চমন্ডলীকে উজ্জীবিত করেন এবং তাদেরকে মৌখিক বর্ণনাগুলি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে ও সেগুলির উপর নির্ভর করতে উপদেশ দেন।
ইউসিবিস লিখেছেন যে, প্যাপিয়াস (Papias)

209 তার পুস্তকের

210 ভূমিকায়
লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী গুরুগণ (elders) থেকে তার নিকট যা কিছু পৌঁছেছে তা সবকিছু তিনি মুখস্থ ও সংকলন করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, মানুষদের মুখ থেকে শ্রুত বা মৌখিক বর্ণনা থেকে তিনি যে কল্যাণ লাভ করেছেন সেরূপ কল্যাণ লিখিত পুস্তক (সুসমাচারগুলি) থেকে লাভ করতে পারেন নি। ইউসিবিস আরো লিখেছেন যে, হেজিসিপাস (Hegesippus)

211 চার্চের ইতিহাস রচনায়

208 এন্টিয়কের (Antioch) দ্বিতীয় বিশপ। ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত হন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 104, 476.
209 দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও হেরাপোলিসের (Hierapolis) বিশপ।
210 Explanation of the Sayings of the Lord/Interpretation of our Lord's Declarations.
211 দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক, ১৮০ খৃস্টাব্দের দিকে

একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তার রচনাবলি থেকে অনেক তথ্যই পরবর্তীরা গ্রহণ করেছেন। তিনি এগুলি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রেরিতগণের যে সকল নীতিমালা (Apostolic Doctrine) তিনি পেয়েছিলেন, সেগুলিকে সহজ ভাষায় তিনি পাঁচটি পুস্তকে সংকলিত করেছেন।
অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, বিভিন্ন চার্চের বিশপগণ সকলেই নিস্তারপর্ব (Passover) বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌখিক বর্ণনার উপরেই নির্ভর করেছেন। আলেকজেন্ড্রীয় ক্লিমেন্ট (Clement of Alexadria), যিনি ছিলেন প্রেতিগণের শিষ্যদের শিষ্য, তিনি নিস্তারপর্ব (Passover) বিষয়ে যে পুস্তিকা রচনা করেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে অনুরোধ করেন যে, তিনি মৌখিক যে সকল বর্ণনা পাদরি ও বিশপগণ থেকে শ্রবণ করেছেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে, যেন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে। ক্যাথলিক জন মিলনার ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত তার পুস্তকের ১০ম পত্রে- যে পত্রটি তিনি জেমস ব্রাউনের কাছে লিখেছিলেন- সেই পত্রে বলেন যে, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস শুধু ঈশ্বরের লিখিত বাণী (Scripture)-এর মধ্যে

মৃত্যুবরণ করেন।

সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আরো প্রশস্ত। লিখিত ও অলিখিত সকল বাণী, অর্থাৎ বাইবেলের পুস্তকাদি এবং মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীগুলিকে ক্যাথলিক চার্চ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেগুলি ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। আরিনাউস লিখেছেন যে, সত্যের সন্ধানীদের জন্য এর চেয়ে সহজতর কোনো বিষয় আর নেই যে, তারা সকল চার্চে মৌখিক বর্ণনাগুলির অনুসন্ধান করবেন, বিভিন্ন জাতির ভাষা যদিও ভিন্ন, তবে অলিখিত মৌখিক বর্ণনা ও রীতি সকল স্থানেই একইরূপ। কারণ প্রেরিতগণ এগুলি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মানুষেরা এগুলিকে ক্যাথলিক চার্চকে প্রদান করে।
জন মিলনার উক্ত পত্রে আরো বলেন, টার্টুলিয়ান (Tertullian)

212 লিখেছেন যে,
ধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্তি (heresy) সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তদের (heretics) অভ্যাসই যে, তারা পবিত্র পুস্তক বাইবেল আঁকড়ে ধরে এবং বাইবেল থেকে প্রমাণাদি পেশ করে। তারা বলে, পবিত্র পুস্তক বা বাইবেল ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বা তার ভিত্তিতে কিছু বলা যাবে না। এভাবে তারা শক্তিমানদেরকে দুর্বল বানিয়ে

212 খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ আফ্রিকার কার্থেজে ১৫৫ খৃস্টব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন।

ফেলে, দুর্বলদেরকে তাদের জালের মধ্যে আটকে ফেলে এবং মধ্যবর্তীদের অন্তরের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। এজন্য আমরা বলছি যে, এদেরকে বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করতে সুযোগ দিবেন না। কারণ, মগজ ও পেট ব্যাথা করা ছাড়া বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করে কোনো ফায়দা হবে না। এজন্য পবিত্র পুস্তক বা বাইবেলের উপর নির্ভর করার পন্থা ভুল; কারণ বাইবেলের পুস্তকাদি থেকে কিছু বের করা যায় না। যদি কিছু পাওয়া যায়ও তবে তা অসম্পূর্ণ। বস্তুত, খৃস্টধর্মের বিধিবিধান, ধর্মবিশ্বাস, যেগুলির ভিত্তিতে আমরা খৃস্টান হয়েছি এবং খৃস্টান ধর্মের সকল বিবরণ কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়।
মিলনার আরো বলেন, ওরিগেন (Origen)

213

বলেছেন, যারা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেয় এ সকল মানুষকে গ্রহণ করা বা মূল্যায়ন করা আমাদের উচিত নয় এবং ঈশ্বরের চার্চমন্ডলীগুলি যুগ-পরম্পরার বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদেরকে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তার বাইরে কোনো কিছু বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়। আর ব্যাসিলাস লিখেছেন যে, চার্চের মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি আলোচনা-উপদেশে ব্যবহার করা হয়। এগুলির কিছু পবিত্র বাইবেল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর কিছু মৌখিক বর্ণনা থেকে

213 তৃতীয় শতাব্দীর আলেকজেন্দ্রীয়ার খৃস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান।

নেওয়া হয়েছে। ধর্মের মধ্যে উভয় বিষয়ের গুরুত্ব ও শক্তি সমান। বিভ্রান্তদের (heretics) বিরুদ্ধে এপিফান্স যে পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হবে; কারণ বাইবেলের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায় না।
মিলনার বলেন, ক্রীযাস্টম (John Chrysostom) বলেছেন, প্রেরিতগণ সব কিছু লিখিতভাবে প্রচার করেন নি। বরং অনেক বিষয় তারা অলিখিতভাবে বা শুধু মৌখিকভাবে প্রচার করেছেন। লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকারের শিক্ষাই সমান গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চার্চের বর্ণনাই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। কোনো বিষয় যদি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে সে বিষয়ে আমরা আর কিছু দাবি করি না। আর অগাস্টাইন (St. Augustine) লিখেছেন, অনেক ধর্মীয় বিষয়ের লিখিত কোনো প্রমাণ নেই, এ সকল বিষয়ে কেবল মৌখিক বর্ণনার উপরেই নির্ভর করতে হয়। সাধারণ চার্চ অনেক বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সেগুলি প্রেরিতগণের শিক্ষা, যদিও তা লিখিত নয়।
ইয়াহূদী পণ্ডিত রাববী মোশি কোদসী অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, মৌখিক বর্ণনার সহযোগিতা গ্রহণ ছাড়া বাইবেলের বক্তব্য বুঝা সম্ভব নয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরুগণ সর্বদা এ নীতি অনুসরণ করেছেন।

বস্তুত খৃস্টধর্মের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের অধিকাংশ বিষয়ই সুসমাচার থেকে পাওয়া যায় না, বরং একান্তভাবেই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ সকল বিশ্বাস পোষণ করা হয়। যেমন, সারবস্তু ও মূলে (Substance and essence) পুত্র (যীশুখৃস্ট) পিতার (ঈশ্বরের) সমান, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র উভয়ের থেকে নির্গত, খৃস্টের একটি অস্তিত্ব এবং দুটি প্রকৃতি, খৃস্টের দুটি ইচ্ছা ছিল: মানবীয় ও ঐশ্বরিক, খৃস্ট মৃত্যুর পরে নরকে প্রবেশ করেন ইত্যাদি। অনুরূপ অনেক কাল্পনিক ‘ধর্মবিশ্বাস’ তাদের রয়েছে। এ সকল বিশ্বাস এরূপ বাক্যে বা শব্দে স্পষ্টত নতুন নিয়মের কোথাও নেই। মৌখিক বিবরণ বা চার্চীয় প্রচলনই এ সকল বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি।

214

214 এ ছাড়া মৌখিক বর্ণনা অস্বীকার করলে তাদেরকে বাইবেলের অনেক অংশ অস্বীকার করতে হবে। যেমন লূকলিখিত সুসমাচার, মার্কলিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর প্রথম থেকে ১৯টি অধ্যায় বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। মার্ক ও লূক খৃস্টের শিষ্য ছিলেন না এবং এ সকল ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেন নি। অপরদিকে তারা ভাববাদী বা প্রেরিত ছিলেন না, কাজেই ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে তারা লিখেন নি। একান্তই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে তাঁরা এগুলি লিখেছেন। অনুরূপভাবে শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs) পুস্তকের ২৫ অধ্যায় থেকে ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় তাকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)-এর যুগে 421

ড. ব্রেট বলেন, মুক্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু লিখিত হয় নি। বরং প্রেরিতগণ কিছু বিষয় লিখিত প্রচার করেছেন এবং কিছু বিষয় মৌখিক প্রচার করেছেন। যারা উভয় প্রকারের বাণী সংরক্ষণ না করে তারা দুর্ভাগা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনাও লিখিত বাণীর মত প্রামাণ্য। বিশপ মোনেক বলেন: প্রেরিতগণের মৌখিক বক্তব্য তাদের লিখিত বক্তব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্লিন্ক ভিরতে বলেন, কোন্ সুসমাচার গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য সে বিষয়ক বিতর্ক একমাত্র মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হয়। মৌখিক বর্ণনাই সকল বিতর্কে সমাধানের ভিত্তি।
বিশপ মানিসিক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈশ্বর ধর্মের মধ্যে ৬০০ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং চার্চগুলিতে তা পালিত হয়। এগুলির একটি বিষয়েও বাইবেলের কোথাও কোনো বর্ণনা বা শিক্ষা নেই বলে স্বীকার করতে হবে। এগুলির

সমাজে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে এই অধ্যায়গুলি সংকলন করা হয়। শলোমনের মৃত্যুর ২৭০ বৎসর পরে এভাবে মৌখিক বর্ণনার উপরে নির্ভর করে এগুলি সংকলন করা হয়। এ পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াতটি নিম্নরূপ: ‘‘নিম্নলিখিত হিতোপদেশগুলিও শলোমনের; যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা (men of Hezekiah) এইগুলি লিখিয়া লন।’’ এ থেকে জানা গেল যে সুলাইমান (আ) থেকে হিষ্কিয় রাজা পর্যন্ত কয়েক শত বৎসর এগুলি লোকমুখে প্রচলিত ছিল।
422

বিষয়ে কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনার উপরই নির্ভর করা হয়েছে।
উইলিয়াম মূর বলেছেন: প্রাচীন খৃস্টানদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের কোনো লিখিতরূপ ছিল না। মুক্তির জন্য যে বিশ্বাসের প্রয়োজন তার কোনো লিখিতরূপ ছিল না। শিশুদেরকে এবং যারা খৃস্টান ধর্মে দিক্ষিত হতেন তাদেরকে মৌখিকভাবে এগুলি শিক্ষা দেওয়া হতো।
৩. ২. ২. ৩. ইসলামী শরীয়তে হাদীস
উপরের আলোচনায় আমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের হাদীস নির্ভরতা বা মৌখিক বর্ণনার (tradition) উপর নির্ভরতার বিষয়ে জানতে পারলাম। এখন পাঠক চিন্তা করুন! যারা ১৭০০ বৎসর যাবৎ মৌখিকভাবে প্রচারিত বিষয়কে লিখিত তাওরাতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেন এবং যারা তিন-চার শত বৎসর যাবৎ মুখে মুখে প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়াবলিকে লিখিত ইঞ্জিলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেন এবং যারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এরূপ বর্ণনার উপর স্থাপন করেন তাদের পক্ষে কি মুসলিমদের হাদীসের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা চলে?
বিশেষত সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহ হাদীস বর্ণনা, মুখস্থকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে মুসলিমগণ অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ

423

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted][215] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [

□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□[217] □□□ □□□□□□□□: (□) □□□□□□□□□□ (□□□ □□□□□□□□), (□) □□□□□□ (□□□□□□□□) □ (□) □□□□□□□ □□□□□□ (□□□ □□□□□□□)□[218]

[217] □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□: (□) '□□□□□': □□□□□□□ □□□ □□□□ (□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, (□) '□□□□': □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ '□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□' □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□, (□)'□□□□□□□□□': □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, (□) '□□□□□ □□□□□□': □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ (□) '□□□□□□ □□□□□□': □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□) □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ ''□□□□'' □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□: □□□□□, □□-□□□□□□, □□: □□-□□; □□□□□□ □□□□□, □□: □-□; □□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □/□□-□□; □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □/□□-□□; □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□. □□-□□, □. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□. □□-□□□□

পাদরিগণ বলেন: ‘‘হাদীস সংকলকগণ এরূপ বর্ণনার অর্ধেকই অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।’’
তাদের এ কথা ভুল। কারণ হাদীস সংকলক বা মুহাদ্দিসগণ কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বাতিল করেন নি। তবে তারা সূত্র বিহীন

218 প্রকৃত সত্য হলো, মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত ‘হাদীস’ ইহূদী খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলের সাথেই তুলনীয়। বরং ‘হাদীসের’ বিশুদ্ধতা’ বাইবেলের বিশুদ্ধতার চেয়েও অধিক প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। শুধু নতুন নিয়মের সাথে তুলনা করলে যে কোনো খৃস্টান গবেষককেও স্বীকার করতে হবে যে, মাকলিখিত সুসমাচার ও লূকলিখিত সুসমাচারের বিশুদ্ধতা স্বীকার করলে হাদীসের বিশুদ্ধতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই দুই সমাচারের লেখক যীশুর প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তারা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। যীশুর তিরোধানের প্রায় শতবৎসর পরে মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে এগুলি সংকলন করেছেন। হাদীসও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। তবে বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে এই দুই সুসমাচারের সাথে হাদীসের কিছু পার্থক্য রয়েছে:
প্রথমত, মার্ক ও লূক কার নিকট থেকে শুনে তা সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। তারা সব কথা যে যীশুর শিষ্যদের থেকে শুনেছেন তা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকের নিকট থেকেও তারা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, লোকমুখে যা কিছু প্রচলিত হয়েছে, নির্বিচারে বা বিবেকবুদ্ধির বিচারের মাধ্যমে তারা তা গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতা, বিশুদ্ধতা বা বিশ্বস্ততা যাচাই করেন নি। পক্ষান্তরে 429

দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর ‘দুর্বল’ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

219

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে সংরক্ষিত সহীহ হাদীসের বিষয়ে যে আপত্তি

হাদীসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদীস পৃথকভাবে কার নিকট থেকে শ্রবণ করা তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখনো যে কোনো গবেষক যাচাই করতে পারবেন যে, কোন ঘটনা কত জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কতগুলি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে...।
দ্বিতীয়ত, মার্ক ও লূক তাদের গ্রন্থদ্বয় সংকলন করার পরে এগুলির কি অবস্থা ছিল তা মোটেও জানা যায় না। প্রায় ২০০ বৎসর এগুলির হালহকিকত কিছুই জানা যায় না। তাঁদের নিকট থেকে কে বা কারা গ্রন্থদুটি গ্রহণ করেছিল? তারা কি লিখিত পুস্তক নিয়ে গিয়েছিল না পুরো বই লেখকের নিকট পড়ে বুঝে নিয়ে গিয়েছিল? তাদের নিকট থেকে কে বা কারা পুস্তকগুলি গ্রহণ করেছিল? কিছুই জানা যায় না। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।
তৃতীয়ত, খৃস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুলিপিকরণে শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন। এতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছকৃত ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলিকে তারা erratum ও Various readings বলে অভিহিত করেন বলে আমরা দেখেছি। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ কখনোই শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেন নি। সর্বদা লিখিত পাণ্ডুলিপি মূল লেখকের নিকট পড়ে অথবা তার মুখ থেকে শুনে নেওয়া ছাড়া কোনো হাদীসের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না।
ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসের সাথে ইসলাম ধর্মের ‘হাদীসে’-র মৌলিক পার্থক্য 430

পাদরিগণ উত্থাপন করেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন অপপ্রচার মাত্র।
খৃস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থা ব্যাখ্যায় এখানে প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। জন মিলনার ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তার পুস্তকে লিখেছেন: ‘‘বর্তমান সময়ের

রয়েছে। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মের ট্রেডিশন বা মৌখিক বর্ণনা হাজার বছর ধরে মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের হাদীস মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিরোধানের দুই শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়েছে। ইহূদী- খৃস্টানগণের মৌখিক বর্ণনার কোনোরূপ সূত্র, বা তথ্য নির্দেশনা নেই। কে, কবে, কখন, কার নিকট থেকে কথাটি শুনেছেন, কে বলেছেন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। এজন্য ভিত্তিহীন মিথ্যা, কাল্পনিক কাহিনী ও ধর্মীয় নির্দেশনা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কোন্টি বিশুদ্ধ ও কোন্টি বানোয়াট তা বিচার করার কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে প্রতিটি হাদীসের তথ্য সূত্র সংরক্ষিত রয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়ে কজন ব্যক্তি তা বর্ণনা করেছেন, তা মুতাওয়াতির, মাশহূর না একক বর্ণনা তা নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোপরি সবকিছই ডকুমেন্টারী, কোনো কিছুই কোনো ধর্মগুরু বা পন্ডিতের ব্যক্তিগত রুচি বা মতের উপর নির্ভরশীল নয়।। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মে মূল ধর্মগ্রন্থকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, বরং ট্রেডিশন বা হাদীসকেই ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তির মূল মন্ত্রটিও নাকি ধর্মগ্রন্থে নেই। পক্ষান্তরে ইসলামে কুরআনকেই ধর্মবিশ্বাসের মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির ব্যাবহারিক ব্যাখ্যার জন্য হাদীস।

কিছু দিন আগে, জোয়ানা সুয়াতকূট

220 নামক এক
মহিলা দাবি করেন যে, আমিই সেই নারী যার বিষয়ে আদিপুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন: ‘‘সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে (it shall bruise thy head)’’, আমার বিষয়েই প্রকাশিত বাক্যের ১২ অধ্যায়ে বলা

219 খৃস্টান ধর্মগুরুগণও লিখিত সুসমাচার ও পত্র এবং মৌখিক বর্ণনার মধ্যে যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন এবং অনির্ভরযোগ্য বলে অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার পদ্ধতি এবং খৃস্টানদের সুসমাচার ও পত্রাবলির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, খৃস্টান পন্ডিতগণ একান্তই মন-মর্জির উপরে নির্ভর করে কোনোটি সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন এবং কোনোটি বাতিল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। একে তারা ‘অর্থ বিচার’ বা ‘অর্থগত সমালোচনা’ বলে দাবি করেন। অমুক ‘সুসমাচার’, ‘পু্স্তকটি’ বা ‘পত্রটি’র অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ আমার পছন্দ বা মতের সাথে মিলে না, কাজেই তা বাতিল এবং অমুক সুসমাচার, পুস্তক বা পত্রটি অর্থ সঠিক কাজেই তা সঠিক। পক্ষান্তরে মুসলিম মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি ‘হাদীস’ প্রথমে সূত্রগত নিরীক্ষা করেছেন এবং এরপর অর্থগত নিরীক্ষা করেছেন। প্রথমেই তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্ত্তনিষ্ঠভাবে ‘বক্তব্য’টির সূত্র বিচার করেছেন। বক্তব্যটি কে বর্ণনা করেছেন? তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? অন্য কেউ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কিনা? বর্ণনাকারীর সকল বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষায় তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে কিনা? ইত্যাদি বিষয় তারা প্রথমে যাচাই করেছেন। যাচাইয়ে যদি বক্তব্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না হয়, তবে তার অর্থ যত সুন্দর বা পছন্দসই হোক তারা তা গ্রহণ করেন নি। আর যাচাইয়ে

হয়েছে: ‘‘১ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। এক জন স্ত্রীলোক ছিল, সূর্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পদতলে, এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। ২ সে গর্ভবতী, আর ব্যথিত হইয়া চেঁচাইতেছে, সনতান প্রসবের জন্য ব্যথা

যদি তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা তার অর্থ বিচার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ, দুর্বল বা মিথ্যা কোনো বর্ণনাই মুছে ফেলেন নি। সকল বর্ণনাই তারা সনদসহ সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। কেউ কেউ শুধু বিশুদ্ধ হাদীস পৃথকভাবে সংকলন করেছেন, তবে কেউই দুর্বল বা মিথ্যা বর্ণনার ‘অস্তিত্বের অধিকার’ অস্বীকার করেন নি। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ তাদের মন-মর্জি বা মতামতের বাইরে সকল বর্ণনার অস্তিত্বের অধিকার অস্বীকার করেছেন। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের পুড়িয়েছেন, হত্যা করেছেন বা অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছেন। তৃতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। ফলে বর্তমান যুগেও যে কোনো হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মতামত পুনরালোচনার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যও বিনষ্ট করেছেন। ফলে বর্তমানে তাদের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। কিসের ভিত্তিতে তারা নতুন নিয়মের পুস্তক ও পত্রগুলি গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য অগণিত সুসমাচার বা পত্র বাতিল করলেন তার কোনো তথ্য সংরক্ষিত নেই।
220 আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীর মূল ‘‘ইযহারুল হক্ক’’ গ্রন্থে এ মহিলার নাম এভাবেই লেখা হয়েছে। ‘‘মুখতাসারু ইযহারিল হাক্ক’’-এর প্রণেতা প্রফেসর ড. মালকাবী লিখেছেন যে, এ মহিলার নাম জোয়ান ডি আর্ক (Jeanne d’Arc) বা ইংরেজিতে (Joan of Arc), 433

খাইতেছে’’, এবং আমি স্বয়ং যীশুর দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি। অনেক খৃস্টান এই মহিলার অনুগামী হন। উক্ত নারীর যীশুকর্তৃক গর্ভবতী হওয়ার কারণে তাঁর অনুগামী খৃস্টানগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লসিত হন। এ স্বর্গীয় শিশুকে অভ্যর্থনা করতে তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ও উপহারাদি তৈরি করেন।
আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী এ ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, জন মিলনারের বর্ণনা থেকে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারলাম না। উক্ত পবিত্র মহাসৌভাগ্যবান পুত্রও কি পিতার মত ঈশ্বরত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন কি না? যদি তা করে থাকেন, তবে এতে তার অনুসারীদের ধর্ম বিশ্বাস কি ‘ত্রিত্ব’ থেকে ‘চারত্বে’ রূপান্তরিত হয়েছিল কি না? এছাড়া ‘পিতা ঈশ্বর’ (God the Father) এর উপাধি পরিবর্তন করে ‘দাদা ঈশ্বর’ করা হয়েছিল কি না?
তাহলে পাদরি মহোদয়দের সমগোত্রীয় ও স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষদের কুসংস্কারের মাত্রা দেখুন! যাদের জ্ঞান-বুদ্ধির এ অবস্থা তাদের কি অধিকার আছে ইসলাম,

যিনি ওরলিন্স-এর কুমারী (the Maid of Orléans) বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৪১২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জোয়ান ডি আর্ক অতিপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যুদ্ধে ফ্রান্সের জাতীয় বীরে পরিণত হন। ইউরোপের প্রচলিত ইতিহাসে তাঁর বিষয়ে এ ঘটনা পাওয়া যায় না।
434

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [

চতুর্থ অধ্যায় : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু □আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর নুবুওয়াত

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু □আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু □আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী

436

প্রথম পরিচ্ছেদ :

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর নুবুওয়াতের প্রমাণ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার বড় প্রমাণ কুরআন কারীম। এর অলৌকিকত্ব, ভবিষ্যদ্বাণী, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সবই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। এ ছাড়াও তাঁর জীবনই তাঁর নুবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। যে কোনো নিরপেক্ষ গবেষক তাঁর মহান জীবন বিশুদ্ধ সূত্র থেকে পাঠ করলে এ গবেষকের সামনে তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিভাত হবেই। খৃস্টধর্মীয় পাদরি ও প্রচারকদের অপপ্রচারের প্রেক্ষাপটে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এখানে অল্প কিছু বিষয়ের সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো :

৪. ১. ১. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর অলৌকিক চিহ্ন-কার্য

পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও মহান আল্লাহ অনেক মুজিযা বা অলৌকিক

437

নিদর্শন ও চিহ্ন-কার্য প্রদান করেছেন। কুরআন ছাড়া বাকি মুজিযাকে দুভাগে ভাগ করা যায়:
৪. ১. ১. ১. অতীত ও ভবিষ্যতের অজানা সংবাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক অজানা বিষয় বলেছেন। অতীত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম পূর্ববতী নবীগণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগণ বিষয়ক সংবাদাদি। তিনি কারো নিকট থেকে এগুলি শ্রবণ করেন নি। কোনো গ্রন্থ থেকে তিনি এগুলি পাঠ করেন নি। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন: ‘‘এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।’’

221

অতীত নবীগণ ও জাতিগণের বর্ণনায় বাইবেলের বিবরণের সাথে কুরআনের বিবরণের কিছু পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ও বাইবেলের বিকৃতি উদ্ঘাটনের জন্যই এ বিষয়গুলি প্রকাশ করেছেন।

222 এ
বিষয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন: ‘‘ইস্রায়েল-সন্তানগণ যে সকল বিষয়ে মতভেদ

221 সূরা হূদ, ৪৯ আয়াত।
222 কুরআন ও বাইবেলের এ পার্থক্য সুনিশ্চিতরূপে কুরআনের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিকত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করে। আমরা দেখেছি, আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও বাইবেলের বর্ণনা ভুল। ডা. মরিস বুকাইলি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
438

করে এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।’’

223

ভবিষ্যতের বিষয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সংবাদ প্রদান করেছেন, যেগুলি পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে সংঘটিত হয়ে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করেছে। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে:
(১) তিনি সাহাবীগণকে মক্কা, যিরূশালেম, ইয়েমন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি একজন একাকী নারী উত্তর-পূর্ব আরবের হীরা শহর

224

থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমন করতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না। খাইবার বিজয়ের আগের দিন তিনি সংবাদ দেন যে, আগামীকাল আলীর (রা) হাতে খাইবারের পতন ঘটবে। তিনি সাহাবীগণকে জানান যে, তারা পারস্য সম্রাট ও রোমান (বাইজান্টাইন) সম্রাটের ধনভান্ডার বণ্টন করবেন এবং পারসীয়দের মেয়েরা তাঁদের খেদমত করবে। তিনি আরো বলেন, পারস্য সাম্রাজ্য একটি বা দুটি ধাক্কা, এরপর আর পারস্য সাম্রাজ্য থাকবে না। আর রোম অনেক শিঙ বিশিষ্ট, একটি শিঙ ধ্বংস হলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল

223 সূরা (২৭) নামল: ৭৬ আয়াত।
224 বর্তমান ইরাকের কূফা শহরের প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন আরবীয় রাজ্য।
439

□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ (Byzantine Empire & Holy Roman Empire) □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

(□) □□□□ □□□□ □□, □□□□ (□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□) □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□

(□) □□□□ □□□□, □□□□□ (□□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ (□□) □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□- □□□□□□ □□□□□ (□□) □□ □□□□□ □□□□- □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□) □ □□□ (□□) □□□□□- □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□- □□□□ □□□

(□) □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□/□□□□□), □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

যুবাইর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন। আর ধ্বংসকারী খুনি ছিল হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ (মৃত্যু ৯৫হি/৭১৪খৃ)।
(৫) ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম বিজয়ের পরে মহামারী দেখা দেবে। তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই তা ঘটে। উমারের (রা) শাসনামলে ফিলিস্তিন বিজয়ের তিন বৎসর পরে যিরুশালেম থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ইমওয়াস শহরে এ মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। এখানে মুসলিম বাহিনীর সেনা ক্যাম্প ছিল। এ ছিল ইসলামের আগমনের পরে মুসলিম সমাজের প্রথম মহামারী। এতে তিন দিনের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।

225

(৬) তিনি মহিলা সাহাবী উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা)-কে বলেন যে, তিনি একদল মুসলিমের সাথে সমূদ্র পথে যুদ্ধে যাত্রা করবেন। ২৭ হি/৬৪৭ খৃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে যখন মু‘আবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, তখন উম্মু হারাম ও তাঁর স্বামী সিরিয়া থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে সাইপ্রাস অভিযানে বের হন। সমূদ্র পার হয়ে সাইপ্রাসের উপকূলে অবতরণের পরে তাঁর বাহন থেকে পড়ে তিনি তথায় নিহত ও সমাধিস্থ হন।
(৭) তিনি ইন্তেকালের আগে জানান যে, তাঁর বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাতিমাই (রা) তাঁর কাছে গমন করবেন। কার্যত তাই হয়। তাঁর

225 অন্য বর্ণনায় ২৫ হাজার মানুষ এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন, যাদের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় অবস্থানরত অনেক মুসলিম যোদ্ধাও ছিলেন। 441

মৃত্যুর ৬ মাস পরে ১১ হিজরীর রামাদান মাসে ফাতিমা (রা) মৃত্যুবরণ করেন।
(৮) তিনি বলেন যে, আমার এই সন্তান- অর্থাৎ হাসান ইবনু আলী (রা)- একজন মহান নেতা; আল্লাহ তার দ্বারা আমার উম্মতের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে শাস্তি ও সন্ধি স্থাপন করবেন। কার্যত তাই হয়েছিল। ৪০ হিজরীর রামাদান মাসে আলী (রা)-এর শাহাদাতের পরে তিনি খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬ মাস তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মু‘আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার মুসলিমগণ এবং হাসানের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য এলাকার মুসলিমগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘটার উপক্রম হয়। তিনি মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধ অপছন্দ করতেন। এজন্য ৪১ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিনি মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষে খিলাফত ত্যাগ করেন। এতে মুসলিম উম্মাহ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। এ জন্য এ বৎসরকে ‘আমুল জামাআত’ বা ঐক্যের বৎসর বলা হয়।
(৯) তিনি বলেন যে, তাঁর দৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলী (রা) তাফ্ফ নামক স্থানে শহীদ হবেন। ফুরাত নদীর তীরে কুফার নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম তাফ্ফ। পরবর্তীকালে তা কারবালা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে ৬১ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) হুসাইন তথায় শহীদ হন।
(১০) তিনি সুরাকা ইবনু জাশ‘আমকে (রা) বলেন, তিনি কিসরার বালাগুলি পরিধান করবেন। পারস্য বিজয়ের পরে যখন কিসরার

442

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ה) [illegible] [illegible] [illegible]

(মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত , যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। ’’[227]

এ আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। উপরন্তু এই আয়াতটিও তা প্রমাণ করে। কারণ ‘বান্দা ’ বলতে কুরআনে সর্বত্র আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আমরা জানি যে , কাফিরগণ ইসরা ও মি ’রাজ (নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহ) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা

---

[227] সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।

445

অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।
জ্ঞান, বিবেক বা মানবীয় বুদ্ধির দৃষ্টিতে এবং ধর্মগ্রন্থাবলির নির্দেশনার আলোকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়।
জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে তা অসম্ভব নয় এজন্য যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সকল যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য কাজ করতে সক্ষম। অতিদ্রুতগতিতে কোনো প্রাণী বা জড় পদার্থকে স্থানান্তর করা জ্ঞান-বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্থানান্তর করা একটি যৌক্তিক ও সম্ভব বিষয় যা আল্লাহ করতে পারেন।

228 শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বিষয়টি

228 গ্রন্থকারের যুগে আলোর গতি, সময় ও স্থান সম্পর্কে আধুনিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাকে শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে হয়েছে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার মিরাজের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

অসম্ভব নয়, তবে অস্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়মের বাইরে। সকল অলৌকিক কর্মই অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বলেই তো অলৌকিক চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়। ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকেও তা অসম্ভব নয়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জন্য সশরীরে বা জড় দেহ সহ ঊর্ধ্বলোকে বা স্বর্গে গমন সম্ভব।
(ক) আদিপুস্তক ৫/২৪: ‘‘হনোক (Enoch) ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন (And Enoch walked with God: and he was not; for God took him)।’’ এভাবে বাইবেল সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, হনোক ভাববাদী বা ইদরীস আলাইহিস সালাম-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।
(খ) ২ রাজাবলির ২ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘১ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে (Elijah) ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলীশায় (Elisha) গিল্গল হইতে যাত্রা করিলেন।... ১১ পরে এইরূপ ঘটিল; তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন।’’ এখানেও বাইবেল সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, এলিয় জীবিত অবস্থায় স্বর্গে উত্থিত হয়েছেন।
এ দুটি বক্তব্য খৃস্টান পাদরীগণের নিকট ঈশ্বরের বাণী ও অভ্রান্ত সত্য হিসেবে

স্বীকৃত। এছাড়া তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু খৃস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তিনদিন পরে পুনরুত্থিত হন এবং সশরীরে স্বর্গে গমন করেন এবং তার পিতার দক্ষিণে বসেন। কাজেই জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মি'রাজ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ পাদরিগণের নেই।

(২) চন্দ্র খন্ডিত করা

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: ‘‘কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।’’[229]

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইঙ্গিতে চন্দ্র বিদীর্ণ ও খন্ডিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ক হাদীসগুলি ‘মুতাওয়াতির’ বা অতি-প্রসিদ্ধ ভাবে বর্ণিত। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসগুলি সংকলিত।[230]

---

[229] সূরা কামার, ১-২ আয়াত।

[230] বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

448

কুরআনে উল্লিখিত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই অলৌকিক চিহ্ন পাদরিগণ অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিভ্রান্তি হলো, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি সত্যই ঘটতো, তবে পৃথিবীর কারো কাছেই তা অজ্ঞাত থাকত না এবং বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করতেন।
এ বিভ্রান্তির অপনোদনে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাদরিগণের এ মহাযুক্তি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটি ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত দুর্বল এবং জ্ঞান-বিবেক ও যুক্তির আলোকেও অত্যন্ত দুর্বল। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন: (ক) বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নোহের জলপ্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী এবং অত্যন্ত বড় ঘটনা। আদিপুস্তকের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

231 অথচ ভারতী, পারসীয়,
কালদীয় (Chaldeans) ও চীনা ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ ঘটনা কঠিনভাবে অস্বীকার করেন; কারণ তাদের ইতিহাসগ্রন্থে এর কোনোরূপ উল্লেখ নেই। পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই মহাজলপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে উপহাস করেন।

231 বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ইহূদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এ মহাপ্লাবন এখন (২০০৯ সাল) থেকে মাত্র ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়।

খৃস্টান পাদরিগণ কি এসকল দেশের পণ্ডিতদের অস্বীকার বা ইউরোপীয় নাস্তিকদের উপহাসের কারণে নোহের প্লাবনের কথা অস্বীকার করবেন বা একে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে মেনে নিতে রাজি হবেন?
(খ) যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লোকে যিহোশূয় (Joshua) ভাববাদীর যুদ্ধ জয়ের জন্য পূর্ণ একদিন সূর্যকে মধ্যগগণে আটকে রাখার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্ত গমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস অপেক্ষা করিল (So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day)। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ণ ২৪ ঘন্টা সূর্য মধ্যগগণে থেমে থাকে। এ ঘটনাটি খুবই বড় ঘটনা। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের জন্মের ১,৪৫০ বৎসর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। যদি তা সত্যিই ঘটে থাকত, তবে বিশ্বের সকলের জন্যই তা প্রকাশ পেত। এ কথা তো স্পষ্ট যে, গভীর মেঘ থাকলেও এই ঘটনা কারো অজ্ঞাত থাকে না। আবার দূরত্বের কারণেও তা না জানার কোনো সুযোগ নেই। এ সময়ে যে সকল দেশে রাত ছিল সে সকল দেশের মানুষেরাও বিষয়টি নিশ্চিত জানতেন; কারণ কোথাও যদি ২৪ ঘন্টা রাত দীর্ঘায়িত হয় তবে তা তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং তারা সকলেই তা জানবেন। অথচ এত বড় ঘটনাটি ভারতের

[illegible]

[illegible]

(□) [illegible] (veil) [illegible] (many bodies of the saints which slept arose), [illegible] (And came out of the graves after his

resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many) [232]

[redacted]

[232] [redacted]

অবাক বিষয় যে, এ সকল মৃত সাধু কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে কি করলেন তা কিছুই মথি লিখলেন না!

233 এ সকল সাধু বা পবিত্র
মানুষ যিরূশালেমের মানুষদেরকে দেখা দেওয়ার পরে কি করলেন তা মথি লিখেন নি। তারা কি পুনরায় তাদের কবরে ফিরে গিয়েছিলেন? না কি তারা জীবিতই রয়ে গিয়েছিলেন? কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি বলেন, সম্ভবত মথি একাই এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায়! উল্লেখ্য যে, লূকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) চিরে গিয়েছিল যীশুর মৃত্যুর পূর্বে। পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বিবরণ এর বিপরীত। এখন প্রশ্ন হলো, পাদরিগণ এ বিষয়গুলির কি উত্তর দিবেন?

233 খৃস্টানগণের দাবি অনুসারে পারলৌকিক মুক্তির জন্য কোনো কর্ম, সততা বা ধর্মপালন জরুরী নয়, বরং একটিমাত্র বিশ্বাস জরুরী, যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মানুষের পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর যীশুর আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল এই উৎসর্গ। মুলত যীশু কোনো আদর্শ বা কর্ম শিক্ষা দিতে আসেন নি, বরং নিজেকে উৎসর্গ করে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। যদি যীশু একটু কষ্ট করে পুনরুত্থানের পরে এ সকল মৃত সাধুদের সাথে যিরূশালেমের সকলকে, বিশেষত পীলাত ও ইহূদীগণের সাথে সাক্ষাত করতেন তাহলে তার উৎসর্গের বিষয়টি তারা নিশ্চিতরূপে জানতেন এবং কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বের সকলেই তা জানতে পারতেন। মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হতো! কিন্তু তা না করে তাঁরা কাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করলেন? 453

(ঘ) মার্ক ১/১০-১১, মথি ৩/১৬-১৭ ও লূক ৩/২১-২২-এর যোহন বাপ্তাইজকের নিকট যীশুর বাপ্তাইজিত হওয়ার বিবরণে নিম্নের কাহিনীটি রয়েছে: ‘‘আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন। আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।’’ এ মার্কের ভাষা, অন্যদের ভাষাও প্রায় একই।
এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশ দুভাগ হয়ে গেল! কাজেই বিষয়টি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে কপোতের নেমে আসা প্রত্যক্ষ করা এবং ঊধ্বাকাশ থেকে আগত বাণী বা শব্দ শ্রবণ করাও কারো একক বিষয় নয়। অন্তত উপস্থিত সকলেই তা দেখবেন ও শুনবেন। অথচ সুসমাচার লেখকগণ ছাড়া বিশ্বের আর কেউই এ সকল বিষয়ে কিছই লিখেন নি! আর এজন্যই পাশ্চাত্যের নাস্তিকগণ এ ঘটনা সম্পর্কে উপহাস করে বলেন: মথি আমাদেরকে অত্যন্ত বড় সংবাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। যখন আকাশের দরজা খুলে গেল, তখন কি আকাশের বড় দরজাগুলি খুলেছিল? না মাঝারি দরজাগুলি? না ছোট দরজাগুলি? আর এই দরজাগুলি সূর্যের এদিকে ছিল না ওদিকে? মথির এই ভুলের কারণে আমাদের পাদরিগণ দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়াতে থাকেন। মথি আমাদের এই কপোতের সংবাদও দিলেন না!

[illegible]

[illegible]

[illegible] (spring) [illegible]

[illegible][234]

[illegible] (ЗЗ) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ग) [illegible]

[illegible]

[illegible]

(а) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে , মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।’’[235] তিনি যখনই কোনো প্রতিমার মুখের দিকে ইশারা করলেন তখনই প্রতিমাটি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর যখনই তিনি কোনো প্রতিমার পিঠের দিকে ইশারা করলেন, তখনই প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এভাবে সকল প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

(৭) তাঁর পবিত্র হস্ত **,** ফুঁক বা থুথুতে রোগমুক্তি ও সুস্থতা

সা ’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন কাতাদা ইবনু নু ’মান (রা) নামক সাহাবীর চোখে আঘাত লেগে চোখটি বেরিয়ে তার কপোলের উপর এসে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখটিকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। চোখটি তখনি সুস্থ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তার দু চোখের মধ্যে এটিই অধিক সুস্থ ও ভাল ছিল।

উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলে , আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তিনি তাকে একটি দুআ শিখিয়ে দেন। অন্ধ ব্যক্তি এভাবে দুআ করলে আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন এবং সে সুস্থ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ফিরে আসে।

মুলায়িবুল আসিন্নার পুত্র বলেন , তিনি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[235] সূরা বানী ইসরাঈল (ইসরা), ৮১ আয়াত।

469

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৪. ১. ২. ব্যক্তিত্ব, বিধান ও মানবতার প্রয়োজন
৪. ১. ২. ১. তাঁর মহোত্তম চরিত্র ও আচরণ দ্বিতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণ করে তা তাঁর মহান চরিত্র ও অতুলনীয় সদাচারণ। তাঁর মধ্যে সকল মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল। জ্ঞান, কর্ম, বংশমর্যাদা, দেশের মর্যাদা, দৈহিক গুণাবলি ও মানসিক গুণাবলির চরম উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা তিনি লাভ করেন। তাঁর গুণাবলি বিচার করলে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সকল গুণের এরূপ সমন্বয় একজন নবী বা ভাববাদী ভিন্ন কারো মধ্যে হতে পারে না। কারণ, এ সকল গুণাবলির কোনো একটি দিক হয়ত অন্য মানুষদের মধ্যেও পাওয়া যেতে

কার কাছ থেকে শুনেছিলেন, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তাদের লেখা পুস্তক তাদের নিকট থেকে কেউ গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করেছেন কিনা, করলে কতটুকু করেছেন, নাকি অন্য কেউ তাদের নামে লিখে চালিয়েছেন ইত্যাদি কোনো তথ্যই সংরক্ষিত নেই। মথি ও যোহনের লেখা সুসমাচার যদি সত্যিই শিষ্য মথি ও যোহনের লেখা হয় তাহলেও তার কোনো সূত্র নেই। তাদের লেখা বই কে তাদের থেকে শুনেছেন তারও প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে একক বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসগুলির সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত রয়েছে। চারটি সুসমাচারের লেখক সকলেই যে ঘটনাবলি লিখেছেন সেগুলিও একক সূত্রে বর্ণিত। এগুলির মূল্যও ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি কিছুই নয়।
475

পারে, কিন্তু সকল গুণের এরূপ সমন্বয় নবীগণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে সম্ভব নয়। এজন্য এরূপ সকল পূর্ণতার গুণের সমন্বয় তার নবুয়তের অন্যতম প্রমাণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরম বিরোধীরাও তাঁর মধ্যে এ সকল গুণের অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল বলে স্বীকার করেছেন।
৪. ১. ২. ২. তাঁর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
তৃতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমান করে তা তাঁর ধর্মব্যবস্থা বা শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা, জাগতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্মকান্ড, রাষ্ট্র, বিচার ও প্রশাসন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকল দিকে ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা রয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, এগুলি অবশ্যই আল্লাহর প্রদত্ত ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যিনি এগুলি নিয়ে আগমন করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী বা ভাববাদী। পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়ত বা কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিগণের আপত্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। একান্তই বিদ্বেষ, অযৌক্তিক পক্ষপাত এবং বিরোধিতার

476

জন্য বিরোধিতার কারণেই তারা এ সকল কথা বলে।
৪. ১. ২. ৩. তাঁর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা চতুর্থ যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণ করে, তা তাঁর প্রকাশ ও বিজয়ের অবস্থা। তিনি এমন এক সমাজে নবুয়ত দাবি করেন, যে সমাজের মানুষদের কোনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ছিল না। তাদের মধ্যে আবির্ভুত হয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে আলোকময় গ্রন্থ ও মহান প্রজ্ঞা নিয়ে আগমন করেছি। আমি সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাস ও সততার আলোকে আলোকিত করব। তিনি ছিলেন সামাজিক শক্তিতে দুর্বল এবং তাঁর সাহায্যকারীগণ ও অনুসারীগণও ছিলেন নগণ্য ও দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জগতের সকল মানুষের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হন। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি সকলের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। তাদের মতামত ভ্রান্ত, তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও তাদের ধর্ম বাতিল বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি তাদের রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর ধর্ম সকল ধর্মের উপর প্রকাশ ও বিজয় লাভ করে। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে সকল দেশে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
তাঁর শত্রুগণ ছিল সংখ্যায়, অস্ত্রে ও শক্তিতে অনেক বেশি। তাঁর ধর্ম ইসলামের আলো

নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ধর্মের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা, গোঁড়ামি, অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনা ছিল সীমাহীন ও অপ্রতিরোধ্য। তা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেন নি। আল্লাহর সাহায্য ও আসমানী সহযোগিতা ছাড়া কি তা সম্ভব ছিল?
ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। গীতসংহিতা ১/৬ নিম্নরূপ: ‘‘কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিনতু দুষ্টের পথ বিনষ্ট হইবে (For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish)।’’ গীতসংহিতা ৫/৬: ‘‘তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে, সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন (Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man)।’’ গীতসংহিতা ৩৪/১৬: ‘‘সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল; তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করিবেন।’’ গীতসংহিতা ৩৭/১৭ ও ২০: ‘‘(১৭) কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিনতু সদাপ্রভু ধার্মিকদিগকে (the righteous) ধরিয়া রাখেন।... (২০) কিনতু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে, সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণশোভার সমান হইবে; তাহারা অনতর্হিত, ধূমের ন্যায় অনতর্হিত হইবে।’’

প্রেরিত ৫/৩৫-৩৯ শ্লোকে ইয়াহূদীদের ব্যবস্থা-গুরু গমলীয়েলের (Gamaliel) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: ‘‘(৩৫) হে ইস্রায়েল-লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। (৩৬) কেননা ইতিপূর্বে থুদা (Theudas) উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ করিয়া বলিয়াছিল, এবং কমবেশ চারি শত জন তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল; সে হত হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহই রহিল না। (৩৭) সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা (Judas of Galilee) উঠিয়া কতকগুলি লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া লইয়াছিল; সেও বিনষ্ট হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল, সকলে ছড়াইয়া পড়িল।
(৩৮) এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে ক্ষানত হও, তাহাদিগকে থাকিতে দেও; কেননা এই মন্ত্রণা কিমবা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে; (৩৯) কিনতু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ (if this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God)।’’

উপরের বক্তব্যগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ধার্মিক (righteous) না হতেন তবে সদাপ্রভু তার পথ বিনষ্ট করতেন, লাঞ্ছিত করতেন এবং ভূতল হইতে তাঁর স্মরণ উচ্ছেদ করতেন, বাহু ভগ্ন করতেন, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত করতেন, তাঁর অনুসারীরা ছড়িয়ে পড়ত, তার কথা ও কর্ম বিনষ্ট করতেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছুই করেন নি। এতে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার্মিক। এতে সন্দেহ নেই, যে সকল ইয়াহূদী-খৃস্টান মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করেছেন বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সাথেই যুদ্ধ করছেন। তবে সময় নিকটবর্তী এবং অচিরেই তারা জানতে পারবেন। মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।’’

237

তারা কখনোই ইসলামকে মুছে ফেলতে পারবেন না। আল্লাহই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: ‘‘তারা আল্লার আলো (Allah's Light) ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।’’

238

237 সূরা শু‘আরা, ২২৭ আয়াত।
238 সূরা সাফ্ফ, ৮ আয়াত।
480

৪. ১. ২. ৪. মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন
পঞ্চম যে দিকটি প্রমাণিত করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত নবী বা ভাববাদী ছিলেন তা তার আগমনের সময় ও মানবতার প্রয়োজন বিবেচনা করা। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভুত হলেন, যখন বিশ্বের মানব জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি সঠিক পথের নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহবান করবেন। আরবগণ ছিল পৌত্তলিকতা ও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। পারস্যবাসীরা ছিল দুই ঈশ্বর-বাদ ও মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। তুর্কী-মঙ্গোল জাতি ছিল জনপদ ধ্বংস ও মানবসভ্যতার বিনাশে লিপ্ত। ভারতের মানুষ ছিল গরু, গাছপালা ও পাথর-মুর্তির পূজা- অর্চনায় লিপ্ত। ইয়াহূদী জাতি ছিল ধর্মের বিকৃতি, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণারোপ, সত্যের অস্বীকার ও মিথ্যার প্রচারে লিপ্ত। খৃস্টান জাতি ছিল ত্রিত্ববাদ, ক্রুশ-পূজা এবং সাধু ও সাধ্বীদের মুর্তির উপাসনায় লিপ্ত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের অনুসারীগণ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবে ছিল। সত্যকে ভুলে তারা অসত্য ও অসম্ভবকে নিয়ে মেতে ছিল।

মহান মহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কি এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে পরিত্যাগ করবেন? বিশ্ববাসীর প্রতি করুণার প্রতীক কাউকে তিনি পাঠাবেন না? তা তো হতে পারে না!
আর মানবতার এই কঠিন সময়ে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউই আবির্ভুত হন নি। তিনিই এই মহান ধর্ম ও ব্যবস্থা দিয়ে যান এবং এই সুমহান সৌধ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল বিভ্রান্ত আচার-রীতি এবং বাতিল ধর্মবিশ্বাস অপসারিত করেন। একত্ববাদের সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহর পবিত্রতার জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। বহু-ঈশ্বরবাদিতা, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণাবলি আরোপ ইত্যাদি সকল বিভ্রান্তির অন্ধকার অপসারিত হয়। তাঁর উপর আল্লাহর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং তিনি লাভ করুণ পরিপূর্ণ মর্যাদা। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন: ‘‘হে গ্রন্থানুগামি-ইয়াহূদী- খৃস্টানগণ, রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে, যাতে তোমরা বলতে না পার, ‘কোনো সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নি’; এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও

482

সাবধানকারী এসেছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’’

239

239 সূরা মায়িদা, ১৯ আয়াত।

□□□□□□□ □□□□□□□□□:
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□. □. □. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□)-□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□:

□. □. □. □. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□, Nebuchadnezzar), □□□□□ (□□□□□□□: Cyrus), □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ ‘□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ □□□□□□’, ‘□□□ □□□□□□□□

বীজ’, কিন্তু পরে তিনি এমন বৃক্ষ হয়ে উঠলেন যে, ‘আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করল’।

240 তিনি প্রতাপশালী পরাক্রান্ত ক্ষমতাধর অধিপতি ও সম্রাটদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের মূল আবাসস্থল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও যিরূশালেমে তার ধর্ম পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তা প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছে। সকল ধর্মের উপরে তা প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগের পর যুগ তা প্রতিষ্ঠিত থাকল। এ পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তার আলো প্রসারিত হচ্ছে। এ সকল ঘটনা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে অনেক বড় ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইদোম, নীনবী ও অন্যান্য দেশের ঘটনার চেয়ে পরিমাণে ও গুরুত্বে এগুলি কোনো অংশেই কম নয়। এজন্য সুস্থ জ্ঞান একথা স্বীকার করতে পারে না যে, এ সকল ভাববাদী ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন, অথচ সেগুলির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এত বড় বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলবেন না।
৪. ২. ১. ২. ভবিষ্যদ্বাণীর অস্পষ্টতা ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত ইঙ্গিতময় হয়, পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না। পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সাধারণত সেই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা

240 মথি ১৩/৩১-৩২ শ্লোকে যীশুর বাক্য থেকে গৃহীত।
485

আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকেও বাধা দিলে।’’ লূকের সুসমাচারের ১১/৫২ শ্লোকে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
মুসলিম আলিমগণ বলেছেন, সকল আসমানী কিতাবেই কোনো না কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত সংবাদ, পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কিন্তু এগুলি ইঙ্গিতময়। যদি এগুলি সাধারণদের কাছে সুস্পষ্ট হতো তবে তাদের আলিম-পণ্ডিতগণ এগুলি গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন না। এরপর ভাষান্তরের ফলে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পায়। হিব্রু থেকে সিরীয় ভাষায়, সিরীয় থেকে আরবী ভাষায়, এভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের সাথে সাথে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে যায়।
৪. ২. ১. ৩. ভাববাদীর অপেক্ষায় ইস্রায়েলীয় জাতি
বাইবেলই প্রমাণ করে যে, ইস্রায়েলীয় জাতি খৃস্ট ও এলিয় ছাড়াও অন্য একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? ২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার

করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট (the Christ/the Messiah/the annointed) নই। ২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয় (Elias)? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী (that prophet)? তিনি উত্তর করিলেন, না।... ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন?’’
এখানে ‘‘সেই ভাববাদী’’ বলতে সেই প্রতিশ্রুত ও আকাঙ্খিত ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে, যাব বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে মোশি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন

241।
এভাবে আমরা দেখছি যে, ইস্রায়েলীয়গণ মাসীহ বা খৃস্ট ছাড়াও অন্য আরেকজন প্রতিশ্রুত নবীর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁর বিষয়টি তাদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ও সুপরিজ্ঞাত ছিল যে, তাঁর কোনো নাম-পরিচয় বলার প্রয়োজন হতো না, শুধু ‘সেই ভাববাদী’ বললেই সকলেই বুঝতে পারতেন।
যোহন ৭/৪০-৪১ নিম্নরূপ: ‘‘(৪০) সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী। (৪১) আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট।’’
এ কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, খৃস্ট এবং সে ভাববাদী দুজন দু ব্যক্তি হবেন। এজন্যই তারা একজনের বিপরীতে অন্যের কথা বলেছেন।

241 দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৫-২২।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

‘ভাক্ত’ কথাটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, যদি তিনি বলতেন, ‘আমার পরে যত ভাববাদী আগমন করবে সকলের থেকে সাবধান থাকবে’ তবে সে কথা বাহ্যত তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু যীশু এরূপ কোনো কথা বললেও, পাদরিগণ সে কথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হতেন; কারণ যীশুর পরে অনেক ভাববাদীর ভাববাদিত্ব তারা বিশ্বাস করেন বলে নতুন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে প্রমাণিত।

243

যীশুখৃস্টের ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রথম শতাব্দীতে অনেক ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব হয় বলে আমরা নতুন নিয়ম থেকে জানতে পারি।

244

যীশু মূলত এ সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত খৃস্ট থেকে সাবধান করেছেন। তিনি সত্য ভাববাদী থেকে সতর্ক করেন নি। আর এজন্যই তিনি উপর্যুক্ত বক্তব্যে ভাক্ত ভাববাদীগণ থেকে সাবধান করার পরে মথি ৭/১৬, ১৭ ও ২০ শ্লোকে তিনি বলেছেন: ‘‘(১৬) তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে (Ye shall know them by their fruits)। লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিমবা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে? (১৭) সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।... (২০) অতএব

243 বাইবেলের নতুন নিয়মে বারংবার স্বীকার করা হয়েছে যে, যীশুখৃস্টের পরেও অনেক ভাববাদী এসেছেন। প্রেরিত ১১/২৭-২৮; ২১/১০-১১।
244 ২ করিন্থীয় ১১/১২-১৩; ১ যোহন ৪/১; প্রেরিত ৮/৯-১০; ১৩/৬।

তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।’’
নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্য ভাববাদী। তাঁর ফলই তা প্রমাণ করে। বিরোধিগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও বিভ্রান্তি প্রচার করেন, সেগুলি ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন। এছাড়া বিরোধীদের অপবাদ নেই কার বিরুদ্ধে? সকলেই জানেন যে, ইয়াহূদীগণ মরিয়মের পুত্র যীশুকে অবিশ্বাস করেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী ও ভন্ড বলে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের শুরু থেকে তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁর চেয়ে খারাপ আর কোনো মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি। অনুরূপভাবে পাদরিগণের স্বদেশীয় ইউপোরীয় হাজার হাজার পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক যীশুর নিন্দা করেন। তারা প্রথমে খৃস্টান ছিলেন। পরে তারা খৃস্টধর্মকে ঘৃণা করে তা পরিত্যাগ করেন। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেন এবং তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে নিয়ে উপহাস করেন। তাদের মতামতের পক্ষে তারা অনেক বইপুস্তক রচনা করেছেন। এ সকল বইপুস্তক বিশ্বের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইউরোপে প্রতিদিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। যীশুর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের নিন্দা এবং ইউরোপীয় নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা যেমন খৃস্টান পাদরিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি মুহাম্মাদ

491

[illegible][245]

[illegible]

[illegible] (‘[illegible]’) [illegible]:

[illegible] ‘[illegible]’

[illegible] [illegible]:

[illegible]

[245] [illegible]

ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। (১৯) আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।
(২০) কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিমবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে।

246 (২১) আর তুমি
যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।’’ ইয়াহূদীগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদটি যিহোশূয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, কথাটি যীশুর

247 বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয়
দাবিই ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ কথাগুলি

246 গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠ অনুসারে এ অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে ‘‘মরিতে হইবে’’।
247 একই ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই আবার ঈশ্বরের ভাববাদী!
496

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বিষয়ক সুসংবাদ ছাড়া কিছুই নয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তা প্রমাণ করে:
(১) বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক ইয়াহূদীগণ এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত এই ভাববাদী মসীহ বা খৃস্ট নন, বরং অন্য একজন হবেন। কাজেই এখানে যে ভাববাদীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি কখনোই যিহোশূয় হতে পারেন না বা যীশুও হতে পারেন না।

248

(২) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে ‘‘তোমার সদৃশ (like unto thee)’’। যিহোশূয় ও যীশু কেউই মোশির সদৃশ বা মোশির তুল্য হতে পারেন না। কারণ যিহোশূয় ও যীশু উভয়েই ইস্রায়েল সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কেউ মোশির তুল্য বা সদৃশ হতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/১০-এ বলা হয়েছে: ‘‘মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয়

248 যীশুকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিশ্রুত ভাববাদী বলে দাবি করলে খৃস্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি ‘খৃস্ট’ ছিলেন না; কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (খৃস্ট) ও প্রতিশ্রুত ভাববাদী দুই ব্যক্তি হবেন, এক ব্যক্তি নন। আর এখানে যিহোশূয়কে বুঝানো হলে তো আর ইহূদীগণ হাজার হাজার বছর ধরে ‘সেই ভাববাদী’-র আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন না।

নাই (there arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।’’
এছাড়া মোশির সাথে যিহোশূয় ও যীশুর কোনো সাদৃশ্য নেই। কারণ মোশি ছিলেন ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও বিধিনিষেধময় নতুন ব্যবস্থা প্রাপ্ত একজন ভাববাদী। পক্ষান্তরে যিহোশূয় ও যীশু এরূপ কিছুই লাভ করেন নি। বরং তাঁরা মোশির ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন। এছাড়া মোশির ব্যবস্থায় শাস্তি, দন্ড, গোসলের বিধান, পবিত্রতা ও শুচিতার বিধান, শুচি ও অশুচি খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদির বিধান রয়েছে। প্রচলিত নতুন নিয়ম থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর ব্যবস্থায় এ সব কিছুই নেই। মোশি তার জাতির মানুষের কাছে সম্মানিত মর্যাদাময় নেতা ছিলেন, সকলেই যার আনুগত্য করত এবং তার আদেশ ও নিষেধ কার্যকর করা হতো। যীশু এরূপ ছিলেন না। এছাড়া খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তার অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য। মোশি তার অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য ক্রুশে আরোহণ করেন নি।
(৩) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: ‘‘উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে (from among their brethren)’’। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ বংশ সকলেই তখন মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন। যদি এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতো যে, এ প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশে জন্মগ্রহন করবেন, তবে

[illegible] [illegible] ‘‘[illegible] [illegible] [illegible]’’ [illegible], ‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’ [illegible] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

(ა) [illegible] [illegible]: ‘‘ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

(৭) উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর যে কথা বলেন নি, সে কথা যদি কোনো ভাববাদী ঈশ্বরের নামে বলে তবে তাকে নিহত হতে হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্য ভাববাদী না হতেন তবে তিনি অবশ্যই নিহত হতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন: ‘‘সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।’’

249

কিন্তু তিনি নিহত হন নি বা বিনষ্ট হন নি। তাঁকে হত্যার বা গুপ্ত হত্যার জন্য কাফিরদের প্রানান্ত প্রচেষ্টা ছাড়াও তিনি নিজে বহুবার যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেছেন, একাকী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কিন্তু তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। তাঁর বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: ‘‘আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।’’

250 আর আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতি
রক্ষা করেছেন। কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তিনি সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছেন।

251

249 সূরা হাক্কা, ৪৪-৪৬ আয়াত।
250 সূরা মায়িদা, ৬৭ আয়াত।
251 এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহের অন্যতম। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশু তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে চারিদিকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রতিশ্রুত ভাববাদী বুঝতে পেরেও অবিশ্বাসের মধ্যেই থেকেছেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু সূরবা, হুয়াই ইবনু আখতাব, তার ভাই আবূ ইয়াসির ইবনু আখতাব। আর এরূপ অবিশ্বাস তো খুবই স্বাভাবিক। বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক অনেক ইয়াহূদী পণ্ডিত তাঁর নুবুওয়াত ও মুজিযা সঠিক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করেন নি। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যীশুই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন নি। বরং তাঁকে ‘ঈশ্বর-নিন্দা’র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১৮ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।

252

প্রথম আপত্তি: এখানে কেউ বলতে পারেন যে, ‘ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ’ বলতে শুধু ইসমাঈল সন্তানগণকেই বুঝানো হবে এমন তো নয়। বরং ইসমাঈল সন্তানগণ ছাড়াও এষৌ

253

- এর বংশধর
এবং অব্রাহামের অন্য স্ত্রী কটুরার পুত্রদের বংশধরগণও ‘ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ’ বলে গণ্য। (কাজেই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী তো এদের মধ্য থেকেও আসতে পারেন।)

252 যোহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।
253 ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যাকোব বা ইস্রায়েল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
505

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, হ্যাঁ, তারাও ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ’ বলে গণ্য। তবে তাদের মধ্য থেকে এ সকল বৈশিষ্ট্য সহ কোনো ভাববাদী আবির্ভুত হন নি। এছাড়া ইশ্মায়েলের বংশধরদের জন্য আল্লাহ যেভাবে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের বংশধরদেরকে মহা মর্যাদা দানের বিষয়ে হাগার (Hagar)

254 এবং
অবরাহামকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

255

এ ছাড়া ইসহাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেন এবং এরপর এষৌকে যে আশীর্বাদ করেন তা থেকে জানা যায় যে, এষৌ-এর বংশধরদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমন সম্ভব নয়। আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

256

254 বিবি হাজেরা
255 আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে বলেন: ‘‘আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব (I will make him a great nation)।
256 বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরকে প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ! শেষ বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে বলেন, আমাকে প্রান্তর থেকে মৃগ শিকার করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্ত্তত করে খাওয়াও, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে। এষৌ প্রান্তরে গমন করলে ছোট ভাই 506

দ্বিতীয় আপত্তি: দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে মোশি বলেছেন: ‘‘তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎপন্ন করিবেন...।’’ এখানে ‘‘তোমার মধ্য হইতে’’ কথাটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে আবির্ভুত হবেন, ইশ্মায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়।
এ আপত্তির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আরবী ও হিব্রু ব্যাকরণ অনুসারে (তোমার

যাকোব বড় ভাইয়ের পোশাক পরে, নিজেকে এষৌ বলে দাবি করে পিতার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পিতা বারংবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই এষৌ কিনা। বারংবার নিশ্চয়তা প্রদানের পরে পিতা তাকে আশীর্বাদ করেন। তিনি মূলত এষৌকেই আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রকাশ পায় যে, সবই ছিল প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কিন্তু ঈশ্বর এই ধোঁকায় প্রবঞ্চিত হয়ে প্রবঞ্চক যাকোবকেই দুধ, মধু ও সকল কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হন! আর সহজ, সরল, সত্যবাদী ও পিতার নির্দেশ যথাযথ পালনকারী এষৌ-এর ভাগ্যে জোটে সকল অভিশাপ। আর ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হলেন!!! যাইহোক যাকোবের জন্য ইসহাক আশীর্বাদ করেন: ‘‘তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।’’ আর এষৌকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন: ‘‘তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে’’। এথেকে বুঝা যায় যে, এষৌ-এর বংশে কোনো মহান ভাববাদী জন্ম নিতে পারেন না।
507

ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে) কথাটি (তোমার মধ্য হইতে) কথাটির ‘‘বদল’’, অর্থাৎ আংশিক বা সংশোধন মূলক প্রতিকল্প বাক্যাংশ। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় তা ‘বদল ইশতিমাল’ বা ‘আংশিক পরিবর্তন’ অথবা ‘বদল ইদরাব’ বা ‘সংশোধনমূলক পরিবর্তন’ বলে গণ্য। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দ বা বাক্যাংশটি বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভুত বলে গণ্য।

257

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাক্যাংশই মূল উদ্দেশ্য, প্রথম বাক্যাংশ সংশ্লিষ্ট মাত্র। আর সকল অবস্থায় এ বক্তব্য মূলত আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়।

258 কারণ
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

257 আরবী-হিব্রু বা সেমিটিক ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায় এভাবে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বলে তারপর অন্যটি বললে তাকে বদল বা বিকল্প বলা হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য। যেমন আমি তোমাকে- তোমার ভাইকে দেখেছি, আমি বইটি- বইটির অর্ধেক পড়েছি ইত্যাদি।
258

‘‘তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে’’ বক্তব্যটির দুটি অংশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। হয় একটি বাক্যাংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত, অথবা দুটির একটি রূপক। পরবর্তী কালে সংযোজিত হলে প্রথম বাক্যাংশটিই (তোমার মধ্য হইতে) সংযোজিত বলে গণ্য হবে, কারণ পরবর্তী ১৮ আয়াতে ঈশ্বরের নিজের ভাষায় যে বক্তব্য রয়েছে তাতে এ কথাটুকু নেই। আর যদি দুটি বাক্যাংশই সঠিক বলে গণ্য হয় তবে একটি রূপক বা প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও প্রথম বাক্যাংশটিই রূপক বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী আয়াতে এই কথাটুকু নেই এবং ব্যাকারণ ও ভাষার দিক থেকে পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশই মূল বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার তা ব্যাখ্যা করেছেন।
508

[illegible][illegible] [illegible][illegible] [illegible][illegible] [

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রকাশ করিলেন, দশ সহস্র (অযুত অযুত)

262

পবিত্রের সহিত (নিকট হইতে)

263 আসিলেন;
তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল। (The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them)

264

এখানে ‘সীনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনের’ অর্থ মোশিকে তোরাহ প্রদান করা এবং ‘সেয়ীর হইতে উদিত হওয়ার’ অর্থ যীশুকে ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ ‘পারণ পর্বত’ মক্কার একটি পর্বত। আদিপুস্তক ২১/২০-২১ শ্লোকে ইশ্মায়েলের বর্ণনায় বলা হয়েছে: ‘‘(২০) পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রানতরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। (২১) সে পারণ প্রানতরে বসতি করিল (he dwelt in the wilderness of Paran)। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।’’ নিঃসন্দেহে ইশ্মায়েলের অবস্থান মক্কায় ছিল। যদ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর

262 বাংলা বাইবেলে ‘‘অযুত অযুত’’, ইংরেজিতে (ten thousands)।
263 বাংলা বাইবেলে ‘নিকট হইতে’ লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি (with) এর অনুবাদ ‘সহিত’ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
264 দ্বিতীয় বিরণ ৩৩/২।

বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম।[265] উপরন্তু শমরীয় তাওরাতে সুস্পষ্টত পারানকে হিজাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫১ সালে মুদ্রিত শমরীয় তাওরাতে ইশ্মায়েলের বর্ণনায় আদিপুস্তকের ২১/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: ‘‘সে হিজাজে অবস্থিত পারণ প্রানতরে বসতি করিল।’’

এ পারণ প্রান্তরে বা হিজাজে ও মক্কায় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কোনো নবী-ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটে নি। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ‘পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার’ অর্থ মক্কায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ কোনো স্থানে আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে বা ‘ঐশ্বরিক প্রতাপ’ প্রকাশ পেলেই বলা চলে যে, আল্লাহ অমুক স্থান থেকে আগমন করলেন, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা বা বিধান সেখান থেকে আগমন করল।

---

[265] এ বিষয়ে হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের তিন আয়াতে বলা হয়েছে: ‘‘ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। [সেলা] আকাশমন্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised।

513

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ স্বীকার করেন যে, সিনাই-এ তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে সেয়ীর বা ফিলিস্তিনে ইঞ্জিল বা সুসমাচারের আগমন ঘটেছিল। কাজেই পারণ থেকে তেজ প্রকাশের অর্থ মক্কায় কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়া। আর কুরআনের প্রথম অবতরণ শুরু হয়েছিল পারণ পর্বতের সর্বোচ্চ অংশে, হেরা পাহাড়ের গুহায়।
এখানে আরো লক্ষণীয় যে, দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ (with ten thousands of saints) আগমন এবং দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা (from his right hand went a fiery law for them) মোশি বা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অযুত অযুত বা দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তি বলতে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে

266 যারা তাঁর
সহযোগিতায় রত ছিলেন, তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করে দীনকে বিজয়ী করেন।
বস্তুত যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি সাধ্যমত নিরপেক্ষতার সাথে যদি যাচাই করেন যে পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশকারী, অযুত অযুত পবিত্রের সাথে আগমন কারী, দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় বিধান-সহ আগমনকারী নবী কে? তাহলে তিনি সুনিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে,

266 মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথী সহ মক্কায় আগমন করেন।
514

তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কেউ নন।

যেহেতু এ ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রমাণ করে, এজন্য খৃস্টান ধর্মগুরুগণ বাইবেলের কোনো কোনো আধুনিক অনুবাদে ‘‘দশ সহস্র (অযুত অযুত) পবিত্রের সহিত আসিলেন (he came with ten thousands of saints)’’ এবং ‘‘তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল (from his right hand went a fiery law for them)’’- দুটি বাক্য উল্লেখ করছেন না বা পরিবর্তন করছেন।

বাইবেলের এ বাণীটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তিনজন নবীর - মূসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের এবং তাঁদের উপর তিনটি আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ঘোষণা করছে। বাইবেলের এ বক্তব্যটি কুরআনের সূরা তীন-এর ১-৩ আয়াতের বক্তব্যের সাথ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ বলেন : ‘‘(১) শপথ তীন ও যাইতুন-এর (২) শপথ সিনাই পর্বতের (৩) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।’’

এ তিন আয়াতে উপর্যুক্ত তিনজন নবীর প্রেরণের স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে ‘‘তীন ও যায়তূন’’ বলে ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সেখানেই এ দুটি

515

[illegible]

[illegible]

[illegible][267]

[illegible]

[illegible]

[illegible

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□)-□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□

□. □. □. □. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□: ‘‘□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□; □□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□; □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ (And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation)

‘‘□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ (multiply him exceedingly) □□□□□□ □□□□□ □□□□□

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: ‘‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]’’

[illegible] [illegible] [illegible] (Ibn Khaldun) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□ □□) □□□ ‘□□-□’□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□’ (□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□)-□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ ‘□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□: ‘□□□□□’ □□ ‘□□□□ □□□□’ (exceedingly)□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ ‘□□□□□□□□’□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□: □□=□, □□□=□□, □□□□=□, □□□=□, □□□□□□□ □□□=□□, □□□□=□, □□□=□, □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□: □□□=□□, □□=□, □□□=□□, □□□=□□

□□□□□□□□□□: ‘□□ □□□□’ (great nation)□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□: ‘‘□□□□□ □□□□□’’□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□=□□ □ □□□□=□, □□□□=□,

[illegible]

[illegible]

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগে ইসমাঈলের বংশধর ইতিহাসে বা মানব সভ্যতায় কোনো বিশেষ বৃদ্ধি বা ‘‘বড় জাতি’’ হিসেবে প্রকাশ লাভ করেন নি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসমাঈলের আলাইহিস সালাম বংশ ও বংশের অনুসারী ‘‘অতিশয় বৃদ্ধি’’ পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় ‘‘বড় জাতি’’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন তাহলে তাকে বলতে হবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কখন ও কিভাবে ইসমাঈলকে আলাইহিস সালাম বড় জাতিতে পরিণত করার এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পুরণ করেছেন?

৪. ২. ২. ৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে ইস্রায়েল-সন্তানদের অবিশ্বাস, মুর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে: ‘‘উহারা অনীশ্বর দ্বারা (with that which is not God) আমার অনতর্জ্বালা জন্মাইল, স্ব স্ব অসার বস্তু (অসার উপাস্য: idols)[269] দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল; আমিও

---

[269] ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন বা অথরাইজড ভার্সনে (with their vanities) এবং রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে (with their idols) লেখা হয়েছে। আরবী বাইবেলে (তাদের অসার উপাস্যগণ দ্বারা) লেখা হয়েছে।

521

নজাতি দ্বারা (with those which are not a people) উহাদের অনতজ^র্ালা জন্মাইব, মূঢ় জাতি (a foolish nation) দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।’’
এ ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম আরো সুস্পষ্ট হয় যিশাইয় ৬৫/১-৬ শ্লোক দ্বারা: ‘‘(১) যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার অনুসন্ধান করিতে দিয়াছি; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিয়াছি; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই, তাহাকে আমি কহিলাম, ‘দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।’। (২) আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে।
(৩) সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা কবর-স্থানে বসে, গুপ্তস্থানে রাত্রি যাপন করে (Which remain among the graves, and lodge in the monuments); {মুর্তি- প্রতিমার মন্দিরে রাত্রিযাপন করে}

270

তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে, ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত

270 ১৮৪৪ সালের আরবী বাইবেল থেকে।

অগ্নি। ৬ দেখ, আমার সম্মুখে ইহা লিখিত আছে; আমি নীরব থাকিব না, প্রতিফল দিব; ইহাদের কোলেই প্রতিফল দিব।’’
এখানে মূঢ় (আরবী বাইবেলে: জাহিল) জাতি বলতে আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা ছিল মূঢ়তা, মুর্খতা, ও বিভ্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাদের নিকট কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাদের ছিল না। তারা মুর্তি বা জড়-পূজা ছাড়া কিছুই জানত না। ‘যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই’ এবং ‘ যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই’ বলতেও আরবদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর সত্ত্বা, গুণাবলি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না এবং অনুসন্ধানও করত না। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: ‘‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করে, সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব (গ্রন্থ) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।’’

271

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: ‘‘তিনিই প্রেরণ করেছেন অজ্ঞ-নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা

271 সূরা আল-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।
523

দান করেন, যদি তারা এর আগে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।’’

272

দাসী হাগারের (হাজেরার) পুত্র ইশ্মাইলের বংশধর হওয়ার কারণে এবং ধর্মবিষয়ক অজ্ঞতার কারণে ইয়াহূদীগণ তাদেরকে ঘৃণা করত। ইয়াহূদীরা ইবরাহীমের স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান, আল্লাহর আশীর্বাদ-প্রাপ্ত, নবীগণের বংশধর, আসমানী কিতাব ও ব্যবস্থার অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে উন্নত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতি বলে মনে করত।
কিন্তু তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। অনিশ্বর বা মুতি-প্রতিমার পূজা, বিভিন্ন অনাচার ও পাপ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। উপরের বক্তব্যদ্বয়ে তাদের এ সকল অনাচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ সকল কারণে মহান প্রতিপালক এ বিদ্রোহী জাতিকে পরিত্যাগ করে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেছে নিয়েছেন।
তাহলে এ আয়াতের অর্থ, ইস্রায়েলীয়গণ তাদের স্ব স্ব অসার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে। এজন্য তাদেরই নিকট ঘৃণিত একটি মুর্খ ও মূঢ় জাতির দ্বারা আমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করব।

273 তিনি তাঁর

272 সূরা জুমুআ: ২ আয়াত।
273 এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইহূদীগণ একত্ববাদ বিনষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। এর বিপরীতে একটি মুঢ় জাতিকে প্রকৃত ও সত্য একত্ববাদ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেন। আর এজন্যই মুসলিমদের প্রতি ইহূদীদের অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টি চিরন্তন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ‘‘[illegible] (which are not a people)’’, ‘‘[illegible] [illegible] (a foolish nation)’’ [illegible] [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (that asked not for me)’, ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (that sought me not)’, ‘[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (a nation that was not called by my name)’ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপসংহার:
আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে এ সংক্ষেপিত গ্রন্থটি সমাপ্ত করার তাওফীক প্রদান করেছেন। আমার অনেক ভাই ‘‘ইযহারুল হক্ক’’ গ্রন্থের সংক্ষেপ প্রকাশের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে

স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মুক্ত নিষ্কোষিত তরবারীর সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তাইমা/তিহামার উম্মু মা’বাদের নিকট থেকে পানি, দুগ্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদারের বা আরবের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।
যিশাইয়র পুস্তকের ৬০ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘১ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত। সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল।.... ৬ তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ, মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ; শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে; তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে। ৭ কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্যা করিবে; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব। (All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine

[illegible]

---

altar, and I will glorify the house of my glory)

[illegible] (the house of my glory)

[illegible]:

‘‘[illegible] (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’

সম্মানিত পাঠক, এ গ্রন্থ থেকে আপনি ‘‘পবিত্র বাইবেল’’ বা ‘‘কিতাবুল মুকাদ্দাস’’- এর পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোনো একটি

গীতসংহিতার ৭২ গীতে বলা হয়েছে: ‘‘৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যনত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রানত পর্যনত কর্তৃত্ব করিবেন। ৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। ১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন। ১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে। ১২ কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। ১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। ১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে; ১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিবে; ও তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করা যাইবে, লোকে তাঁহার নিমিত্ত নিরনতর প্রার্থনা করিবে, সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে (prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised)।’’
এ কথাগুলিও স্পষ্টত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি ও তাঁর উম্মাতই সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ও পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সামনেই মরুনিবাসীরা নত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনিই দরিদ্র ও অসহায়দের রক্ষার জন্য সর্বজনীন আইন প্রদান করেন ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 532

পুস্তকেরও কোনো অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা-সূত্র নেই। আসমানী কিতাব বা ওহীলব্ধ গ্রন্থ হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থগুলির মধ্যে নেই। উপরন্তু গ্রন্থগুলির বৈপরীত্য, পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক

করেন। কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেই নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি একমাত্র তিনিই সবত্র ‘প্রশংসিত’ (মুহাম্মাদ)।
যিশাইয়র পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে রয়েছে: ‘‘তিনি দূরস্থ জাতিগণের প্রতি পতাকা তুলিবেন, পৃথিবীর প্রানতবাসীদের জন্য শিস দিবেন; আর দেখ, তাহারা দ্রুতগমনে সত্বর আসিবে।’’ বাহ্যত এখানে হজ্জের বিষয়ে বলা হয়েছে।
যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, এক জন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যাহা যাহা দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। ৭ এবং সে দেখিল দুই জন করিয়া অশ্বারোহীসহ একটি রথ, গর্দভের একটি রথ এবং উষ্ট্রের একটি রথ, এবং সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিল: And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed (বাংলা বাইবেলে: ‘‘যখন সে দল দেখে, দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহীদিগকে, গর্দভের দল, উষ্ট্রের দল দেখে তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিবে।’’) ... ৯ আর দেখ, এক দল লোক আসিল; অশ্বারোহীরা দুই দুই জন করিয়া আসিল। আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, ‘পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তাহার দেবগণের সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। (Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground)। এখানেও বাহ্যত
533

বক্তব্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ।
এছাড়া এ গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে, ত্রিত্ববাদ এবং যীশুখৃস্টের ঈশ্বরত্বের মতবাদ বাতিল ও ভিত্তিহীন। এ গ্রন্থ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে,

গর্দভের রথ বলতে যীশুকে এবং উটের রথ বলতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের পরে তাঁরই সাহাবীদের হাতে বাবিলের পতন ঘটে এবং তথাকার প্রতিমাগুলি ভূমিসাৎ হয়।
হগয় ভাববাদীর পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে: ৭ আর আমি সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে (And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come)।
রেভারেন্ড প্রফেসর ডেভিড বেঞ্জামিন আরমেনীয়ার একজন বিশপ ছিলেন। তিনি খৃস্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তকের একটি (Muhammad in the Bibble)। এই পুস্তকে তিনি হিব্রু, আরামাইক ও অন্যান্য ভাষার পান্ডলিপি থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এখানে (desire) বা মনোরঞ্জন শব্দের স্থলে মূলত ‘হামদা’ বা ‘আহমদ’ শব্দ রয়েছে। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছেন। গীতসংহিতার ৯৬ গীতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে: ‘‘কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি কীর্তনীয় (For the LORD is great, and greatly to be praised)।’’ এই আয়াতের

যীশুখৃস্ট আল্লাহর সৃষ্ট একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর দাস (বান্দা) ও প্রেরিত (রাসূল) ছিলেন।
খৃস্টান মিশনারি, প্রচারক ও প্রাচ্যবিদগণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে যে সকল অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি

প্রাচীন আরবী অনুবাদে ‘মুহাম্মাদ’ শব্দটি স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে বলে হিজরী অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইবনু তাইমিয়া (৭২৮হি/১৩২৮খৃ) উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সময়ে ১৪শ খৃস্টীয় শতকে সিরিয়ান ও কালদীয় খৃস্টানদের মধ্যে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তিনি এবং তৎকালীন মুসলিম আলিমগণ সেগুলির উপরেই নির্ভর করতেন। তাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে বাইবেলের পুস্তকগুলিকে অধ্যায় ও পংক্তিতে ভাগ করার নিয়ম প্রচলিত হয় নি। এজন্য তিনি শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় ও পংক্তির নম্বর উল্লেখ করেন নি। এছাড়া তিনি বাইবেল থেকে আরো কয়েকটি উদ্ধতি প্রদান করেছেন, যেগুলিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কিন্তু উদ্ধৃতিগুলি বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের একটি আয়াতে বলা হয়েছে: ‘‘হে ঈশ্বরের পবিত্র, মুহাম্মাদ, তোমার নাম চিরস্থায়ী।’’ এই পুস্তকের অন্য আয়াতে রয়েছে: ‘‘হে ঈশ্বরের পবিত্রতম, মুহাম্মাদ, আমি তোমার বিষয় জানিয়েছি।’’ অন্য আয়াতে রয়েছে: ‘‘আমার প্রিয় ও আমার পুত্র আহমদ।’’ অন্য আয়াতে রয়েছে: ‘‘আমরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মুহাম্মাদের রব শুনিলাম।’’ তিনি যহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কেদারের সন্তানগণকে একটি পুস্তক দান করবেন এবং তাদেরকে ইহূদীদের উপর 535

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন: ‘‘নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন।’’
হে আল্লাহ, আমাদেরকে বিভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর নিমিত্ত।

537